ओ३म्
এসো
বৈদিক
সিদ্ধান্ত
জানি
বাংলাদেশ অগ্নিবীর

এসো বৈদিক সিদ্ধান্ত জানি

অনুবাদক

ও

ব্যাখ্যা সমন্বয়ক

শ্রী অন্তু বিশ্বাস

শ্রী আবীর কুণ্ডু

শ্রী সৃজন চক্রবর্তী

শ্রী আদিত্য সেন

শ্রীমতি গোপি রাণী দত্ত

শ্রী রিপন তালুকদার

শ্রী নিলয় বসু

শ্রীমতি প্রিয়া দত্ত

শ্রী সাম্য ব্রহ্মচারী

সহ-সম্পাদক

শ্রী অন্তু বিশ্বাস

শ্রী আবীর কুন্ডু

শ্রী আদিত্য সেন

শ্রী সৃজন চক্রবর্তী

শ্রীমতি গোপি রাণী দত্ত

বিশেষ ধন্যবাদ

শ্রী সজীব দাশ

কার্যনির্বাহী সমন্বয়ক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা,

বাংলাদেশ অগ্নিবীর।

সম্পাদক

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ

ব্যাকরণ-স্মৃতি-বেদান্ত-পৌরহিত্যতীর্থ

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

উৎসর্গ

প্রয়াত শ্রী ড. তুলসীরাম শর্মা,

চতুর্বেদ ভাষ্যকার (ইংরেজি)

(১৯২৩-২০২৫ খ্রি.)

ভূমিকা

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে- জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নেই (গীতা ৪.৩৮)।
তবে সেই জ্ঞানের সার্থকতা নিহিত কর্মের মধ্যে। জ্ঞানহীন কর্ম এবং কর্মহীন জ্ঞান- দুটোই নিষ্ফল। সৃষ্টির শুরুতে পরমাত্মা চারজন ঋষির হৃদয়ে চার বেদের জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার ভাণ্ডার বেদের জ্ঞানোপদেশকে নিজের জীবনে ধারণ করে তার অনুকুল কর্ম করার মাধ্যমেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ সনাতনীই আজ বেদবিমুখ, আর এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী মতবাদীরা। **বেদ** ছেড়ে **ভেদ** - এর পথে সবেগে অগ্রসরমান এই মতবাদগুলোর প্রচারের পরিণতি হিসেবে আমরা আজকাল অহরহ ধর্মান্তরের ঘটনা শুনতে পাই। একজন ধর্মপ্রাণ সনাতনীর জন্য এসব কতটা বেদনাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। খুব কষ্ট লাগে আমাদের সত্যানুসন্ধানী, আধ্যাত্মিক, তেজস্বী পূর্বজদের বর্তমান উত্তরসূরীদের করুণ দশা দেখে। অবশ্য শাস্ত্রাধ্যয়নহীন জাতির এমন দুর্দশা অনিবার্য। প্রচলিত বেদবিরুদ্ধ মতবাদের অন্ধকারে যখন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো ভারতবর্ষ, তখনই সত্যের মশাল হাতে আবির্ভাব হয় ঋষি দেব দয়ানন্দের। সনাতনীদের মাঝে ঐক্য ফেরাতে এবং আমাদের পূর্বজ ঋষি-মুনিদের গৌরবগাথা সবার সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি সবার প্রতি 'Back to Vedas' এর আহবান জানান, প্রতিষ্ঠা করেন এক মহান আন্দোলনের, যার নাম **আর্যসমাজ**। তারই ধারাবাহিকতায় **বাংলাদেশ অগ্নিবীর** বৈদিক সংস্কৃতির লালন এবং আর্ষ গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারে সর্বাত্মক প্রয়াসী। **উল্লেখ্য, সাধারণ মনুষ্য দ্বারা রচিত গ্রন্থ কখনোই আর্ষগ্রন্থের বিকল্প হতে পারে না**। কিন্তু **এসো বৈদিক সিদ্ধান্ত জানি** গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো এই গ্রন্থে সনাতন ধর্ম, বৈদিক দর্শন এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের খুব সহজে এবং সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অসংখ্য আর্যবিদ্বানদের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহের সহায়তা গ্রহণ করেছি। গ্রন্থসমূহের নামের তালিকা নিচে প্রদান করা হলো-

১) আহ্বান- স্বাধ্যায় প্রকাশনী
২) বৈদিক নিত্যকর্মবিধি- স্বাধ্যায় প্রকাশনী
৩) বৈদিক ধর্মধারা- পণ্ডিত সিদ্ধগোপাল 'কবিরত্ন'
৪) ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা- মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
৫) সত্যার্থ প্রকাশ - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
৬) বেদসার- পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
৭) পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতি- স্বামী শান্তানন্দ সরস্বতী
৮) বৈদিকধর্ম আর্যসমাজ প্রশ্নোত্তরী- শ্রী পণ্ডিত ধর্মদেবজী সিদ্ধান্তলঙ্কার বিদ্যাবাচস্পতি
৯) পরা বিদ্যা - আচার্য জ্ঞানেশ্বরার্য
১০) বেদ কেন এবং কি? - অধ্যাপক রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু
১১) বেদ পরিচয় - শ্রী দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
১২) বৈদিক প্রশ্নোত্তর - সঞ্জীব নেওয়ার
১৩) ব্যবহার ভানু- মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

স্বাধ্যায়শীল পাঠকবৃন্দের যদি এই গ্রন্থটি এক বিন্দুও উপকারে আসে, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

নিবেদনান্তে
সম্পাদকমণ্ডলী

সূচিপত্র

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশে সনাতন

জগৎ তথা পৃথিবী সৃষ্টির বহুবছর পর ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত মানব জাতির সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বিশাল এক প্রাণীজগত। দৈহিক দিক দিয়ে অন্য প্রাণীকুল বা জাতির সাথে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও, মানুষ হিসেবে বিশেষায়িত করার সেই পার্থক্য টা তখনো আসেনি মানবজাতির মধ্যে; তা হলো **জ্ঞান**।

জ্ঞানকে ২ ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়- **স্বাভাবিক জ্ঞান** ও **বিশেষ জ্ঞান**।

(১) স্বাভাবিক জ্ঞান হল আমাদের প্রবৃত্তি যা নিজ থেকেই প্রাপ্ত হয় যেমন ব্যথা পেলে কান্না করা ইত্যাদি এসব সকল প্রাণীতেই রয়েছে।

(২) বিশেষ যে জ্ঞান যা আমাদের মনুষ্যত্ব শেখায়, মানবজীবনে নৈতিকতা, কর্ম, বিজ্ঞান শেখায় যা কোনো সত্ত্বার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হতে পারে, সেটি হলো বিশেষ জ্ঞান। যাকে আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান বেদ বলে থাকি। সৃষ্টির সেই আদিতে ৪ জন ঋষি এই জ্ঞান এ পূণ্য ভূমিতে প্রাপ্ত করেন ও পরম্পরাগত ভাবে তা ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

বৈদিক জ্ঞানের চর্চা ও সে ভিত্তিতে গবেষণা করেই আমাদের ঋষিগণ আমাদের এই বৈদিক সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পেরেছিলেন। আমাদের ঋষিগণ একাধারে যেমন আধ্যাত্মিকতার পথেও ছিলেন একই সাথে তারা **বিজ্ঞানী**, **গবেষক**, **শিক্ষকও** ছিলেন। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সাধনের ফলেই ভারতবর্ষকে জ্ঞানের মূল স্রোত হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

পাশ্চাত্য বিদ্বান **মেটারলিনক (Maeterlinck)** তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **'The Great Secret'** এ লিখেছেন -

"It is now hardly to be contested that the source (of knowledge) is to be found in India. Thence in all probability the sacred teaching spread in to Egypt, found its way to ancient Persia and Chaldia, permitted the Hebrew race and crept in Greece and the south of Europe, finally reaching China and even America."

[The Great Secret -Pg. 5]

অর্থাৎ, বর্তমানে এবিষয়ে বিবাদের অবকাশ নেই বললেই চলে যে (জ্ঞানের) মূল উৎস ভারতবর্ষ থেকেই প্রাপ্ত। সম্ভবতঃ সেখান থেকেই পরবর্তীতে এই পবিত্র শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে মিশরে, মিশর থেকে তা প্রাচীন ইরান তথা ব্যাবিলনের দিকে পথ বেছে নেয়, ইহুদি জাতিকে প্রভাবিত করে, অতঃপর গ্রীস ও ইউরোপের দক্ষিণভাগে প্রবিষ্ট হয়ে অবশেষে চীন ও আমেরিকায় পৌছায়।

ফ্রান্সের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও বিচারপতি **জন বিটি ক্রোজিয়ার (John Beattie Crozier)** দৃঢ়তার সহিত লিখছেন- "Is there is a country which can rightly claim the honour of being the cradle of human race or at least the scene of primitive civilisation, the successive developments of which carried in all parts of the ancient world, and even beyond, the blessings of knowledge which is the second life of man, that country assuredly is India." **-J. beatie**

অর্থাৎ, যদি কোনো দেশ প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির প্রতিপালক হিসেবে অথবা সেই আদিসভ্যতা যা বিকশিত হয়ে জগতের প্রতিটি প্রান্তে জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছিল, তার মূলস্রোত হওয়ার দাবী করতে পারে, নিশ্চয়ই সেই দেশটি হলো ভারত।

মেজর ডী. গ্রাহামপোল (D. Graham pole) লিখেছেন-

"ভারত সেই সময় সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌছে ছিল, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের ছাল পড়ে যাযাবরের মতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতো। "

[মর্ডান রিভ্যু, জুন ১৯৩৪]

মি. ডেলমার লিখেছেন-

"পশ্চিমারা যেসকল বিষয়ের উপর গর্ব করে, সেসব মূলত ভারতবর্ষ থেকেই সেখানে পৌছেছে। আর যে হরেক রকমের ফল, ফুল, গাছপালা যা এখন ইউরোপে উৎপন্ন হয় তা হিন্দুস্তান থেকেই সেখানে নিয়ে লাগানো হয়েছিল। মখমল, রেশম, টিন, লোহা ও সীসার প্রচারও ইউরোপে ভারত থেকেই হয়েছে। শুধু এই নয় জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, চিত্রকর্ম ও আইনকানুনও ভারতবাসীরাই ইউরোপীয়দের শিখিয়েছে।"

[Quoted from- **সুক্তিসাগর, রমাশঙ্কর গুপ্ত, পৃ-৩৫৭]**

ম্যাক্সমুলার বলছেন- “We all come from the East - all that we value most has come to us from East.”

অর্থাৎ- “যাকে আমরা সর্বাধিক মূল্যবান মনে করি তা **আমরা পূর্বদেশ (ভারত) থেকেই লাভ করেছি**।”

[**F. Max Muller - INDIA, What can it teach us?, Lecture 1, P- 31-32**]

এভাবেই ভারত থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের ধারায় সারাবিশ্ব উপকৃত হয়ে জ্ঞানাগ্নির স্পর্শ লাভ করে এবং উন্নতির পথে যাত্রা শুরু করে।

যার অন্যতম প্রমাণ হলো **মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি** রচিত অন্যতম **বই জিজ আস সিন্ধিন্দ** যা মূলত **ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেরই অনুবাদ**। তিনি মূলত ভারতীয় গণিতবিদ বিশেষত ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র অনুবাদ করতেন ও অধ্যয়ন করতেন। ৭ম শশতাব্দীতে আল মনসুর নামক শাসক ভারতের এমন বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শাস্ত্র আরবে আনিয়ে তার অনুবাদ করাতো। এভাবেই শুরু হয় আরবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন যুগ যাকে তারা তাদের স্বর্ণযুগ বলে গৌরব করে থাকে। এর দেখাদেখিই পরে ইউরোপিয়ানরাও ১৩,১৪ শতাব্দীর দিকে সেসব গ্রন্থ নিজেদের ভাষায় অনুবাদ শুরু করে এবং এরপরই ইউরোপের উন্নতির যাত্রা শুরু হতে দেখা যায় যাকে তারা Renaissance period বলে থাকে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ তথা কৃতঘ্ন এই জাতি যাদের দ্বারাই উন্নতির পথে পৌছালো, তাদেরকেই আক্রমণ করতে শুরু করে। তাই প্রথমে ইসলামিক এবং এরপর ইউরোপীয়ানদের আক্রমণ আমরা দেখতে পাই।

আমাদের এই ঈর্ষনীয় উন্নতির পেছন মূখ্য ভূমিকা আমাদের **গুরুকুলেরই** ছিল। যেখানে **গণিত, চিকিৎসা, স্থাপত্যকলা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, দর্শন, অর্থশাস্ত্র** সবই পড়ানো হতো। যার ফলস্বরূপ আমরা যেমন পেয়েছি **শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্মের মতো অপরাজেয় যোদ্ধা** একই সাথে পেয়েছিলাম **ঋষি কণাদ, সুশ্রুত, অগস্ত্য, পতঞ্জলি, ব্রহ্মগুপ্তদের মতো ঋষি বা রিসার্চারদের**।

বৈদিক ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আমরা উন্নতির কতটা শিখর স্পর্শ করেছিলাম তা আমরা কিছু ঘটনা দিয়ে অনুমান করতে পারি। রামায়ণের **পুষ্পক বিমান** সম্পর্কে তো আমরা সকলেই অবগত। সেসময়ের বিমান থাকাটা একটি সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু কালের গর্ভে হারিয়ে যায় সেই বিমান প্রস্তুত প্রণালী। পরে **১৯ শতাব্দীতে যখন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ ও ভরদ্বাজ মুনির বিমান শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং একটি ক্ষুদ্র বিমান তৈরি প্রণালী পুনরুদ্ধার করেন,** তখন তিনি সকলকে এমন বিমানের কথা জানান। তখন সাধারণ মানুষেরা তাকে পাগল বলে হাসাহাসি করতে থাকে, যে এমনও অবাস্তব কিছু সম্ভব কিনা!

এরই কয়েকদশক পর মানুষ আবার বিমানে উড়াল দিয়ে বিশ্বকে চমকে দেয়। যেখানে এতোদিন এমনকিছু কল্পনারও বাইরে ছিল, অথচ সেই বিমানের নিখুঁত প্রস্তুত প্রণালী কয়েক হাজার বছর আগেই আমাদের কাছে ছিল।

চিকিৎসা বিদ্যা ও শল্যোপচারেও আমরা ছিলাম প্রবর্তক। আমাদের থেকেই আরব, ইউরোপে এ বিদ্যার প্রচার হয়।

ম্যাকডোনাল (A. Macdonell) স্বীকার করেছেন যে কৃত্রিম নাক তৈরির বিদ্যা ভারত থেকেই সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়েছে-

"In modern days European surgery has borrowed the operation of artificial noses from India where English-men became acquainted with the art in the last century."

[A History of Sanskrit-literature, P. 427]

- "বর্তমান সময়ের ইউরোপিয়ান সার্জারী ভারতীয়দের শল্যচিকিৎসা তথা কৃত্রিম নাক তৈরির বিদ্যা থেকে প্রাপ্ত, যা ইংরেজরা বিগত শতাব্দীতে তাদের থেকে শিখেছিল।"

ভারতীয় শল্যশাস্ত্র ও উপকরণের প্রশংসায় **ডা. মেনিং (Dr. Menning)** লিখেছেন-

"(The surgical instruments of the Hindus) were sufficiently sharp, indeed as to be capable of dividing a hair longitudinally."

[Ancient and Mediaeval India, Vol.1, P. 346]

অর্থাৎ, "হিন্দুদের অস্ত্রোপচারের যন্ত্র এতোটাই তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত হতো যে তা চুলকেও লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলতে পারতো।"

ভারতের শল্যচিকিৎসা নিয়ে **Rev. Peter percival** লিখেছেন-

"তাদের (ভারতীয় আর্যদের) বইয়ে ১২৭ প্রকারের অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের বর্ণনা রয়েছে।"

[The Land of the Veda, P. 139]

এল্ফিনস্টন **(Hon Mounstu Elphinstone)** তার **History of India** বইয়ে লিখেছেন-

"ভারতীয়দের শল্যশাস্ত্র ততোটাই আশ্চর্যজনক, যেমনটা তাদের ঔষধি।"

[The History of India, vol-1, book 3, chapter 4, pg- 160]

<u>গণিত</u>

বিজ্ঞানের অন্য সকল শাখার ন্যায় গণিতেও আমাদের অবদান ছিল অদ্বিতীয়। শুরুতেই যেমন খারেজমী ও ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে জানলাম, তেমনি এ ভূমি থেকে গণিতচর্চা উন্নত রূপ ধারণ করে।

"In the whole history of Mathematics, there has been no more revolutionary step than the one which the Hindus made when they invented the sign '0' for the empty column of the counting frame."

"গণিতবিদ্যার ইতিহাসে হিন্দুদের সেই কৃতিত্বের তুলনায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ আর কিছু হতে পারে না। আর সেটি হলো খালি ঘরে 'শূন্য' এর আবিষ্কার"

(source: Mathematics for the Million - By Lancelot Thomas Hogben p. 47).

বর্তমান সময়ে অনেকে অনলাইনে এলজেব্রা বা বীজগণিতের জনক হিসেবে আল খোয়ারিজমি''কে দাবি করে থাকে। কিন্তু মূলত-

"ড. মর্গান বলেছেন, 'ভারতীয় গণিতই হলো সেই গণিত, যা আমরা আজ ব্যবহার করি।' হিন্দুরাই সংখ্যার সৃষ্টি করেছিলেন, যেগুলোকে ভুলবশত 'আরবি সংখ্যা' বলা হয়, কারণ ইউরোপীয়রা সেগুলো শিখেছিল আরব (সারাসিন) শিক্ষকদের কাছ থেকে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিরও উৎপত্তি ভারতে, যা ৫ম শতাব্দীতেই আর্যভট্ট জানতেন। বীজগণিত (Algebra)-ও একটি হিন্দু বিজ্ঞান, যদিও এর নাম আরবি।

ইতিহাসবিদ ক্যাজোরি (Cajori) বলেন, "ভারতীয়রাই বীজগণিতের প্রকৃত আবিষ্কারক।"

[Is India Civilized - Essays on Indian Culture - By Sir John Woodroffe Ganesh & Co. Publishers 1922 p. 182].

মনির উইলিয়ামস বলছেন-

"Whatever conclusions we may arrive at as to the original source of the first astronomical ideas current in the world, it is probable that **to the Hindus is due the invention of algebra and its application to astronomy and geometry.**"

"আমরা বিশ্বের প্রচলিত প্রথম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর মূল উৎস সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই না কেন, এটি সম্ভবত বলা যায় যে **বীজগণিতের আবিষ্কার এবং তা জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতিতে প্রয়োগ করার কৃতিত্ব হিন্দুদেরই প্রাপ্য।**"

(source: Indian Wisdom - By Monier Williams p. 185).

আমাদের বর্তমান অবস্থা, আমাদের এই গৌরবময় অবস্থান এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? আর তার কারণই বা কি?

মূলত মহাভারত কাল থেকেই মানুষের ধর্মপালন হ্রাস পেতে থাকে যা মহাভারতের পর অধিক দেখা দেয়। বৈদিক ধর্মের রীতিনীতি থেকে মানুষ দূরে সরতে থাকে আর সেখানে জায়গা নিতে থাকে সব অবৈদিক, অমানবিক কর্মকাণ্ড।

বেদ থেকে যতোই আমরা দূরে সরে যেতে থাকি ততোই আমাদের পতন হতে থাকে। সর্বপাঠ্য, ধর্মের মূল সেই বেদকেই সর্বসাধারণের পাঠ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। কথিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ব্যতিত কেউ বেদ পাঠ করতে পারবে না এমন নিয়ম চালু করা হয় ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা। ফলে তাদের মন মতো তৈরি হতে থাকে সকল নিয়ম। **বৈদিক যাজ্ঞিক কর্ম, বর্ণব্যবস্থা** সবই লোপ পেতে থাকে। সমাজে শুরু হয় **বেদবিরোধী নিরীহ পশুহত্যা, নারীবিরোধী-নারীবিদ্বেষী মনোভাব, কুসংস্কার, ঝারফুক, জাদুটোনা, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা**। এভাবেই এসবের বিরোধে তৈরী হয় নাস্তিক্য মত গুলো যেমন চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন।

সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম যজ্ঞের নামে নিরীহ পশুদের তুলে নিয়ে অবাধে হত্যা করা দেখেই সিদ্ধার্থ বিরোধ করে এবং ততকালীন কথিত ব্রাহ্মণ (মূলত ব্রাহ্মণ নয়, তারা ধর্মব্যবসায়ী) এটিকেই বেদের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে এবং বিরোধিতাকে অধর্ম বলে জানায়। ফলে সত্য বেদ না পড়তে পারায় বেদকেই ঘৃণা করতে শুরু করেন তিনি। আর পরে তা বুদ্ধের শিষ্যরা আলাদা ধর্ম বানিয়ে প্রচার করে যা বর্তমানে সনাতনীদের অন্যতম বিদ্বেষী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের অন্যতম ক্ষতির কারণ তারাই বর্তমানে।

একইভাবে যজ্ঞের নামে অবৈদিক অশ্লীল কর্মের প্রচলন থাকায় তাতে এক রাজা তার স্ত্রীকে হারায়। পরে স্ত্রীর বিরহে রাজ্য ছেড়ে সবাইকে এর বিরোধী করতে থাকে। যদিও শুরুতে তিনি ধর্মের নামে চলা সেইসব পাখন্ড, কুপ্রথার খন্ডন করছিলেন কিন্তু তিনি নিজে বেদ পড়তে না পারায় শেষমেশ বেদের নিন্দাই করতে থাকেন। ঈশ্বর, কর্মফল ব্যবস্থা, বর্ণব্যবস্থা এসবের নিন্দা করতে থাকেন; আর তার থেকেই শুরু হয় ভারতে **অন্যতম নাস্তিক্যমত চার্বাকের।** অর্থাৎ মূলত আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রুকে তৈরি করেছি। হিন্দু যেন একাই যথেষ্ট নিজেকে ধ্বংস করতে!

এভাবেই বৌদ্ধদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে সাথে আমরাও আমাদের অবৈদিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে থাকি সাথে বৌদ্ধদের থেকে জাতপাত, জড়-উপাসনা এসব গ্রহণ করতে থাকি। জাতপাতের মূল উৎপত্তি বৌদ্ধদের ধরা হলেও, আমরা তা গ্রহণ করে সেইক্ষেত্রতে নিজেদের যেন legacy তৈরি করে ফেলি। এতোটাই জাতপাত বেড়ে যায় যে কথিত সেসব ব্রাহ্মণরা তাদের ঘোষণাকৃত নিচু জাত-বর্ণ (শূদ্র, হরিজন) দের ছোয়া খায় না, তাদের চলার পথে শূদ্ররা হাটতে পারবে না, তাদের কুয়া থেকে ওরা জল নিতে পারবে না, তারা কখনো বেদপাঠ করতে পারবে না, করে ফেল্লেই অমানবিক নির্যাতন চলতো। বহিরাগতদের হামলা ও নির্যাতন তো বটেই তবে এই জাতপাত অস্পৃশ্যতার জন্যেও বহু সনাতনী ভাই একটু সম্মানের আশাতে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, যার উদাহরণ ইতিহাসে অহরহ।

(১) বীর সাভারকারের লিখিত বই **মোপলা** পড়লেই দেখতে পাবেন সেখানে সবার দ্বারা নির্যাতিত অস্পৃশ্য নিচু জাতের ছেলে কম্বু, যে কথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল; তাকে সবসময় অপমান সহ্য করতে হতো। কিন্তু তাও এক মৌলবী যখন সেই সুযোগে দাওয়াত দিতে আসে, সে মৌলবীর সাথে তর্ক করে এবং নিজ ধর্মের নামে বিন্দুমাত্র অপমান সহ্য করেনি। তার ছেলের অসুস্থতায় ডাক্তার চিকিৎসা পর্যন্ত দেয়নি। একপর্যায়ে শেষে সবাই ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়।

(২) কালাপাহাড়- সন ১৫৩৪ এ এখনের বাংলাদেশের নওগাঁতে কালাচাঁদ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান ছিলেন। তিনি শাস্ত্রপাঠে অনুরাগী থাকলেও তৎকালীন বাদশাহ সুলায়মান করবানীর সেনা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সেই বাদশাহর কন্যা দুলারি বিবি তার প্রেমে পড়ে এবং তার ধর্মপ্রেম দেখে (বাদশাহ অমানবিক চালায় নির্যাতন চালায় ইসলাম গ্রহণের জন্য, কিন্তু কালাচাঁদ শতকষ্টেও স্বধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন) ইসলামে ধর্মান্তরিত না করিয়ে সনাতন রীতিতেই বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু যখন কথিত ব্রাহ্মণরা জানতে পারে তখন তারা দুলারি বিবিকে তো গ্রহণ করেইনি বরং কালাচাঁদকেও জাতি থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তাকে প্রায়শ্চিত্তের নামে অস্বাভাবিক কষ্ট দেয়, অপমান করতে থাকে। এসবে শেষে রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে কালাচাঁদ সব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিকাহ করে নেয়। এরপর শুরু হয় তার ধ্বংসযজ্ঞ, হিন্দু গণহত্যা। তার সামনে আসা সকল মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস করতে থাকে। পুরীর জগন্নাথ, গোপীনাথ মন্দির, কোনার্ক মন্দির, ময়ুরভঞ্জ,কটক মন্দিরে ধ্বংসলীলা চালায় ও ব্রাহ্মণদের হত্যা ও ধর্মান্তরিত করতে থাকে। এভাবেই কথিত ব্রাহ্মণদের গোড়ামীর জন্য সেই শাস্ত্রানুরাগী কালাচাঁদ হয়ে উঠে কুখ্যাত কালাপাহাড়।

[কালাপাহাড়, লাজপাত রায় অগ্রওয়াল]

এভাবেই অবৈদিক প্রতিটা কর্মই যে আমাদের পতনের কারণ ছিল তা কিছু উদাহরণ দেখলে বুঝতে পারবো।

আমরা অনেকসময় ঈশ্বরের ভক্তি আর কর্মফল ব্যবস্থার বাইরে অন্ধবিশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি, যে অন্ধবিশ্বাস আমাদের পতনের কারণ ছিল।

ঘটনাটি ৮ম শতাব্দীর রাজা দাহিরের,

৮ম শতাব্দিতে মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধের দেবল নগরীতে আক্রমণ করে। সেখানের হিন্দু রাজা দাহির রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করতে থাকে। তিনি আদ্যশক্তির উপাসক ছিলেন এবং তার দূর্গে দেবীমাতার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তার মাঝে এধরণের এক বিশ্বাস ছিল যে যতক্ষন পর্যন্ত সেই মন্দিরের চূড়ায় পতাকা উত্তলিত থাকবে, তিনি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হবেন না। রাজা দাহির অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং প্রায় বিজয়ের সন্নিকটে ছিলেন। পরাজয়মূখী কাশেম তখন রাজা দাহিরের সেই কুসংস্কার সম্পর্কে জানতে পারেন। কাশেম মন্দিরের পুরোহিতকে অর্থের লোভে মন্দিরের পতাকা নামিয়ে ফেলতে প্ররোচিত করে। পরবর্তী দিন সকালে রাজা যখন যুদ্ধক্ষেত্রের পৌছায়, পুরোহিত মন্দিরের পতাকা নামিয়ে দেয়। পতাকা উড়তে না দেখে রাজা ও তার সেনারা চিন্তিত হয়ে পরে এবং

মনে করে যে দেবীমাতা তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন। এতে করে তারা মনোবল হারায় এবং অবশেষে নিশ্চিত জয়াবহ সেই যুদ্ধও হেরে যায়। মোহাম্মদ বিন কাশেম রাজাকে হত্যা করে ও দূর্গ দখল করে নেয়। সেই পুরোহিতকেও হত্যা করে এই বলে, "যে নিজের রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সে বাহিরের কারো সাথে কেন করবে না?"। অতপর কাশেমের সেনা সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলল ও মন্দিরটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলো। হাজারো নারীদের ধর্ষণ করা হলো ও হাজারো হিন্দুদের ক্রীতদাস বানিয়ে কাবুলের বাজারে বিক্রি করে দেয়া হলো। রাজা দাহিরে রূপবতী দুই কন্যাকেও উঠিয়ে নিয়ে গেল পারস্যদেশকে উপহার হিসেবে দিতে।

(The history of India told as told by its own historian, Chachnama)

বিন্ কাশিম দূর্গ অধিকার করে ৬০০০ হিন্দুকে হত্যা করে। অতঃপর রাজা দাহিরের ছিন্ন মুন্ড ইরাকের শাসক হজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। সঙ্গে একখানি পত্র। পত্রে বিন্ কাশিম জানান: "রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেনাপতি ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের ইতিপূর্বেই যমালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তর অথবা বধ করা হয়েছে (Either Islam or Death)। মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। সকাল সন্ধ্যায় আল্লার উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয় নামাজ। জেহাদের অনুপ্রেরণায় বিন্ কাশিম অধিকৃত দেবল নগরীর সকল ব্রাহ্মণদের সুন্নত করতে আদেশ দেন। তাঁরা অসম্মত হলে, তিনি ১৭ বৎসরের উর্দ্ধে সকল পুরুষকে হত্যা করেন। শিশু মহিলা সহ অন্যসকলের ভাগ্যে জুটল দাসত্বের শৃঙ্খল।

[Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P-55, 57] & [The history of India told as told by its own historian, vol 1, pg 163-164]

এরপর থেকেই ভারতবর্ষ স্থায়ীভাবে ম্লেচ্ছ দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করে এবং যার ধারাবাহিকতাতেই আমাদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও মুসলিম শাসনাধীন উত্তরভারত মন্দির শূন্য হয়ে পড়ে। রাজা দাহিরের যদি মূর্তির প্রতি এমন অন্ধবিশ্বাস না থাকত তবে আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিন্ন হতো!

সোমনাথ মন্দির ধ্বংস

এরকমই অন্ধবিশ্বাসের কারণে সোমনাথ মন্দিরও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়-

মুহাম্মদ গজনবী যখন আক্রমণ করে তখন সোমনাথের মন্দির ভগ্ন এবং পূজারী ও ভক্তদের এমন দুর্দশা হলো যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখে পলায়ন করলো।

তখন পোপ-পূজারীগণ, পূজা, পুরশ্চরণ, স্তুতি এবং প্রার্থনা করতে লাগল, “হে মহাদেব! তুমি এই ম্লেচ্ছদের বিনাশ করো, আমাদের রক্ষা করো”। তারা তাদের শিষ্য-সেবকদের এবং রাজাদের বুঝাতে লাগল, “আপনারা নিশ্চিত থাকুন মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভদ্রকে পাঠিয়ে দিবেন। তারা ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করবেন, অথবা তাদেরকে অন্ধ করবেন। এখনই আমাদের দেবতার আবির্ভাব ঘটবে। হনুমান, দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়েছেন যে, তারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে দিবেন”। সেই নিরীহ সরলপ্রকৃতির রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ পোপদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রইলেন।

কিছু জ্যোতিষী পোপ বলল, "এখনও তোমাদের আক্রমণের মূহূর্ত উপস্থিত হয় নাই। একজন বলল যে, অষ্টম স্থানে চন্দ্রমা আছে। অপর একজন সম্মুখে যোগিনী দেখালো। এরা এ সকল ছল চাতুরীতে ভুলে থাকলেন। কত পোপ-পূজারীগণ এবং তাদের শিষ্যগণ ধৃত হলো। পূজারীগণ করজোড়ে এটাও বলল, "তিন কোটি টাকা গ্রহণ করুন, মন্দির এবং মূর্ত্তি ভঙ্গ করবেন না।"

মুসলমানগণ বলল, – "আমরা ‘বুৎপরস্ত' অর্থাৎ মূর্তিপূজক নহি কিন্তু ‘বুৎশিকন' অর্থাৎ মূর্ত্তিভঞ্জক"। তারা তৎক্ষণাৎ মন্দির ভঙ্গ করল।

উপরের ছাদ ভগ্ন হল, চুম্বক-প্রস্তর পৃথক হয়ে যাওয়াতে মূর্তিটি পড়ে গেল। যখন সোমনাথের মূর্তি ভগ্ন হয়েছিল; শুনা যায় যে, তা হতে ১৮ কোটি মূল্যের রত্ন বের হয়।

তখন পূজারী এবং পোপাদিগের উপর কশাঘাত হতে লাগল; তারা রোদন করতে লাগল।

বলল – "ধন-ভাণ্ডার দেখাও"। তাহারা মারের চোটে তৎক্ষণাৎ বলে দিল। তখন শত্রুগণ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন কর তাদেরকে বেদম প্রহার করল।...

(তথ্যসূত্র- সত্যার্থ প্রকাশ দ্বাদশ সমুল্লাস)

এবং তারিখ-এ-জৈম-উল-মাসীর, দি স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার)

"... শিব লিঙ্গকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিল... শিবলিঙ্গের টুকরো গুলো গজনবী নিয়ে গেল যা মসজিদের সিড়ির জন্য প্রয়োগ করল।"

(তথ্যসূত্র- তারিখ-এ-জৈম-উল-মাসীর, দি স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার, পৃষ্ঠা ২০-২১)

"সোমনাথ মন্দির ধ্বংস মামুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।... ক্রমশ এগিয়ে আসছে ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা মত্ত কলরবে। শোনা যাচ্ছে তাদের রণধ্বনি-আল্লা হো আকবর। ভীত অসহায় নরনারীর আকুল আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয় দিক হতে দিগন্তরে। পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মামুদের সৈন্যদল। বয়ে গেল রক্তের প্লাবন। লুণ্ঠিত হয় সোমনাথের অতুল ঐশ্বর্য। ধূলিসাৎ হয় তাঁর মন্দির। নিহত হয় ৫০,০০০ হিন্দু। (মামুদের ভয়ে যাঁরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল)।"

[Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P-58]

এভাবেই নিজদের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও বেদবিরোধী কর্মের দ্বারা এখান থেকেই শুরু ভারতে মুসলিম শাসনের সেই শ্বাসরুদ্ধকর অধ্যায়। এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক **Will Durant** বলেছেন- "মুসলমানের ভারত বিজয় হলো ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায়।" **(The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in History).**

Ref- Will Durant - The Story of Civilization, P- 459.

৭১২ এ মুহাম্মদ বিন কাশেম থেকে ১৭৫৭ আহম্মদ শাহ আবদালি পর্যন্ত মুসলিম আক্রমণ বা জিহাদ চলে। প্রতিটা রাজত্বে এতো এতো নির্মমতা এতো মন্দির ধ্বংস, ধর্ষণ ও গণহত্যা সংখ্যা কল্পনাতীত। তবে কিছুটা কিছুটা অবশ্যই আলোকপাত করা হবে যাতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া যায়।

মুহাম্মদ বিন কাশিম- আমরা দাহিরের পরাজয় দেখলাম। তখন দাহিরের স্ত্রী বীরাঙ্গনা রাণী বাঈ অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে রাজ্য রক্ষায় শেষ যুদ্ধ করেন। কিন্তু বিশাল সৈন্যের সাথে বেশিদিন টিকতে না পারায় তিনি বুঝতে পারেন পরিণতি এবং তিনি মুসলমানদের চরিত্র সম্বন্ধে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি বলেন- "ভগবান না করুক, আমরা যেন স্বাধীনতার জন্য গো-মাংস ভক্ষণকারী এই ম্লেচ্ছ যবনদের নিকট বাধিত না থাকি। এতে নারীত্বের মর্যাদা হবে লুণ্ঠিত। সময়-সংক্ষেপ, চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ। এস, আমরা সকলে মিলে কাঠ, তৈল ও বস্ত্র সংগ্রহ করি।

[History of Mediaeval India, pg 58]

একেই বলে জোহর। এরপর থেকে বহুবার জোহর করেছেন বিভিন্ন রাণী ও রাজ্যের নারীরা। কেননা এরা এতোটাই নিকৃষ্ট যে বেঁচে থাকলে তো দাসী বানিয়ে 'হেরেমে' নারীর সতীত্ব নষ্ট করবেই আবার অন্যভাবে আত্মহত্যা করলেও মৃতদেহের সাথেও কুকর্ম করতে দুবার ভাববে না। কলকাতায় মৌমিতার ধর্ষণ ঘটনার মতো বিভিন্ন সময় খবরে আসা মৃত দেহের সাথে নির্মমতার সূত্র কোথায় আশা করি তা সকলের নিকট স্পষ্ট।

আর এই জোহর থেকেই পরে সতিদাহ প্রথা শুরু হয়। সতীত্ব রক্ষার সাহসী এ পদক্ষেপকে কুসংস্কারবাদী ও ধর্মব্যবসায়ীরা কর্তব্য বানিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন গ্রন্থও লিখে তাকে শাস্ত্রবাণী হিসেবে সমাজে প্রচলিত করে।

শুধু লুট করা কখনোই তাদের উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের মূল অগ্রাধিকার হয় হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস। তাইতো-

মুলতানে একটি বিখ্যাত মন্দির ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বৎসর অসংখ্য ভক্তের সমাগম হতো। প্রণামী বাবদ আয় হত লক্ষ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অর্থের লোভে বিন্ কাশিম মন্দিরটি ধ্বংস করেননি, কিন্তু অপবিত্র করেছেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের নিদর্শনস্বরূপ তিনি মন্দিরের দেবতার কণ্ঠে বেঁধে দিয়েছিলেন এক টুকরো গো-মাংস।

[Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P-58]

সুলতান মাহমুদ-

মাহমুদের ঐতিহাসিক **Al' Utbi** লিখেছেন- "তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নগরের পর নগর তিনি অধিকার করেছেন; মুসলমানদের অভিলাষ পূর্ণ করতে নীচ কাফেরদের হত্যা করেছেন; ভেঙেছেন তাঁদের দেবতার বিগ্রহ। তারপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে সগর্বে প্রচার করেছেন ইসলামের বিজয় কাহিনি.......। খোদার নামে শপথ নিয়েছেন প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করবেন।"

[Quoted by Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P-56]

শুধু লুণ্ঠন ও ধ্বংসতেই এদের আত্মতৃপ্তি হয় না, এদের হিন্দু ভগবানের বিগ্রহ ধ্বংস ও তা পূর্ণ অসম্মান করতে হবে এটাই তাদের ধর্মীয় শিক্ষা।

"সুলতান মাহমুদ জানতে পারেন যে হিন্দুস্থানে থানেশ্বর নামে একটি রাজ্য আছে। সেখানে আছে জাগরসম দেবের বিশাল মন্দির। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের (জেহাদ) আহ্বান জানিয়ে তিনি এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। অতঃপর হিন্দুস্থান অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়পালের পুত্র গুপ্তচরের মুখে এ সংবাদ শুনে মামুদের নিকট প্রস্তাব করেন যে সুলতান যদি এ অভিযানে বিরত হন তবে তাঁকে ৫০টি হাতি "নজরানা" বাবদ দেওয়া হবে। মামুদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। থানেশ্বর পৌঁছে তিনি দেখেন শহর জনশূন্য। সৈন্যরা রাজধানী বিধ্বস্ত করে লুণ্ঠনে মত্ত হয়। ভেঙে দেয় অসংখ্য দেবমূর্তি। জাগরসম দেবের মূর্তি নিয়ে যায় গজনী। সুলতানের আদেশে বিগ্রহকে মসজিদের সামনে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়-যাতে নামাজিগণ ঐ মূর্তিতে পা দিয়ে মাড়িয়ে নামাজের সময় প্রবেশ করতে পারে।**"**

[তথ্যসূত্র: তবকাত-ই-আকবরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭]

পূর্বোল্লিখত সোমনাথের বিগ্রহ ৪ টুকরো করা হয়। চার টুকরো চার জায়গায় দাফন করা হয়-

১) গজনীর মসজিদের সিড়িতে

২) রাজপ্রাসাদের ফটকে

৩) মক্কায়

৪) মদিনায়

[Indian Islam,Dr. Titus, pg 22-23]

এরপর একে একে মুহাম্মদ ঘোরী, কুতুবউদ্দিন আইবক আসে আর লাখের উপর হত্যা ও কয়েকশ মন্দির ধ্বংস করে।

"কুতুবউদ্দিন আইবক একা তিন লক্ষ হিন্দু হত্যা করেন।"

[The Story of Civilization, pg 461]

ঐতিহাসিক Dr. Titus-এর বিবরণ থেকে জানা যায়- 'কুতুবুদ্দিন আইবক প্রায় ১০০০ মন্দির ধ্বংস করেন সেখানেই তৈরি করেন মসজিদ। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত জামা মসজিদ নির্মাণ করেন। হাতির সাহায্যে যে সকল মন্দির ধ্বংস করেছেন সেই সকল মন্দিরের বহু মূল্যবান পাথর ও রত্নরাজি নিয়ে সুসজ্জিত করেন জামা মসজিদ; কোরানের দিব্য বাণী খোদিত করেন মসজিদের দেয়ালে। এ কাহিনি খোদিত আছে জামা মসজিদের পূর্ব দিকের দরওয়াজায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে ২৭টি মন্দির ধ্বংস করে তার সামগ্রী দিয়ে নির্মিত হয় জামা মসজিদ।"

[Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P-59]

মুহাম্মদ বিন তুঘলক-

ঐতিহাসিক Will Durant-এর ভাষায়, হত্যা ও বর্বরতায় তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কীর্তিকেও ম্লান করেছেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায়- "তিনি এত হিন্দুহত্যা করেছেন যে তাঁর রাজপ্রাসাদ ও দরবারের সম্মুখে সর্বদাই রাশি রাশি মৃতদেহ স্তূপীকৃত থাকত। সর্বক্ষণ হত্যা ও মৃতদেহ সরানোর কাজে নিযুক্ত জল্লাদ ও সাফাইওয়ালার দল ক্লান্ত হয়ে পড়তো।"

[The Story of Civilization, pg 461]

তৈমুরলঙ - আরেক নির্মম জেহাদির নাম তৈমুরলঙ।

"সারসুতি (Sarsuti-হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত সিরসা) নগরের অধিবাসীরা ইসলামের নাম পর্যন্ত শোনেনি-একথা শুনে তৈমুর সারসুতি অভিমুখে অগ্রসর হন। হিন্দুরা নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তৈমুর তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠান; তুমুল যুদ্ধ হল-নিহত হল সকল হিন্দু। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানগণ হল বন্দী; সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল। সৈন্যবাহিনী ফিরে এল। সঙ্গে কয়েক হাজার বন্দী হিন্দু রমণী। তারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।"

[The Calcutta Koran Petition, pg 61]

আত্মজীবনীতে তৈমুরের ব্যাখ্যা,

"হিন্দুস্থান আক্রমণে আমার উদ্দেশ্য হল: কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করে মহম্মদের (তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর আল্লার কৃপা বর্ষিত হোক) নির্দেশ অনুসারে তাদের সত্যধর্ম ইসলামে, ধর্মান্তরিত করা, অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার পাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা ও মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস করা। এর দ্বারা আমরা হব 'গাজী' ও 'মুজাহিদ'।"

[Timur-Malfuzat-I-Timuri, pg-427]

বাবর - বাবর নিজের জীবিনীতে লিখেছেন-

"**১১** জানুয়ারী: বাজাউর দূর্গ নিয়ে মন এখন শান্ত-উদ্বেগহীন। আমরা বাজাউর উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছি। হিন্দুদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে উঁচু জায়গায় টাওয়ার (Tower- চতুর্ভুজ বা গোলাকার বুরুজ) তৈরি করতে আদেশ দিলাম।"

[Babur Nama,pg 371]

"ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন - নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে দূর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তারপর বাবরের সৈন্যরা ৩০০০/৪০০০ (নিরস্ত্র) কাফেরদেরকে হত্যা করে। অন্তত ১০০০ স্ত্রীলোক ও শিশু জহরব্রত করে আত্মহত্যা করে। মেদিনী রাও সহ বহু রাজপুত তাঁর ঘরে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে।"

[Babur Nama, pg 595-596]

মুঘল শাসক (মরুদস্যু) বাবরের নিজ আদেশে লিখিত বই **'বাবরনামা'** এর ইংরেজি অনুবাদ যা **'Memoirs of Babur'** নামে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক বইয়ের টিকায় পৃষ্ঠা ৬৫৬ তে এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে-

“ ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের আদেশানুসারে মুঘল সেনাপতি রাম জন্মভূমির স্মৃতিতে অযোধ্যায় নির্মিত মন্দির বিধ্বংস করে এবং সে স্থানে মসজিদের স্থাপন করে...”

[The Babur-nama in English (Memoirs of Babur) Babur, Emperor of Hindustan, 1483-1530; Beveridge, Annette Susannah, 1842-1929, pg-656]

হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর গাজী (ধর্মযুদ্ধে জয়ী) উপাধী পেয়েছেন। কৃতজ্ঞতায় তিনি আল্লাহর উদ্দেশে রচনা করেন চতুষ্পদী কবিতা-

" ইসলামের জয় লাগি

ঘুরেছি আমি দেশ হতে দেশান্তরে,

পৌত্তলিক ও হিন্দুর সাথে

যুদ্ধ অভিলাষে।

শহীদের মৃত্যু লভিব আমি

এ ছিল মোর শপথ

খোদার কাছে কৃতজ্ঞ আমি

হয়েছি আজ গাজী।"

[Babur Nama,pg 575]

এমন শাসকদের আগমণ ও তাদের এই নির্মমতার তো শেষ নেই। কুখ্যাত আওরঙ্গজেবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলেই মোটামুটি অবগত, তবুও একটু একটি উদাহরণ দেখবো-

আওরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বং'স ও দেবমূর্তি বিদ্বেষ!

“জানুয়ারী **১৬৭০**-ধর্মাত্মা পাদিশা মথুরার 'কেশোরায়ের ডেব্রা' নামক মন্দির ধ্বংস করতে আজ্ঞা দিলেন। তার কর্মচারীগণ অতি অল্পসময়েই এই আজ্ঞা পালন করলো।... সেই মন্দিরের ছোট ও বড় এবং নানা-মণিখচিত সব দেবমূর্ত্তিগুলো আগ্রায় আনা হলো এবং আগ্রার বেগম সাহেব মসজিদের সিঁড়ির নীচে তা পুঁতে রাখা হলো, যেন সর্ব্বদাই তা পদদলিত হতে থাকে।**”**

[তথ্যসূত্র: মসির-ই-আলমগিরি পৃ-৬০ (ইংরেজি), পৃ-৯২ (মূল ফার্সি)]

বিঃদ্রঃ মসির-ই-আলমগিরি হলো আওরঙ্গজেবের সবচাইতে প্রামাণিক জীবনী যা রাজসরকারের কাগজপত্র দেখে এবং আরঙ্গজেবের দরবারে দীর্ঘকাল কর্মরত থাকার সময়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাজ্ঞান অবলম্বন করে মুস্তাদ খাঁ মাসির-ই-আলমগিরি নামে এই ফার্সী ইতিহাস লিখেছিলেন।

দীর্ঘ এতোবছরের অমানবিক নির্যাতনের কিছুটা অবসান মনে হলেও এরপর শুরু হয় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন। শুরু হয় ভারতবর্ষের লুট ও খ্রিস্টান মিশনারীদের অভিযান-ধর্মান্তরণের। শাসন ও ধর্মান্তরণ সচল রাখতে করা হয় শাস্ত্র দখলদারি, গুরুকুল ব্যবস্থা করা হয় ধ্বংস। কারণ তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এতো নির্যাতনের ও বহিরাগত শাসনের পরও এই দেশ এখনো টিকে থাকার পেছনে মূল কারণ হলো তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি। কেননা মুসলিম দস্যুরা ইরান, ইরাক এসব দেশেও আক্রমণ চালিয়েছে এবং তাদের মূল সংস্কৃতি একদম ধ্বংস করে দিয়েছে, যেখানে ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। তাই তারা টার্গেট করলো আমাদের শাস্ত্রের উপর। ম্যাক্সমুলার-গ্রিফিতদের দ্বারা বেদের বিকৃত অর্থ করা, কথিত ব্রাহ্মণদের টাকার লোভ দেখিয়ে প্রক্ষিপ্ততার অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি।

আর্য সমাজের অবদান

এসবের সাথে সমগ্র দেশে যেখানে দাসত্বে ছায়া, নির্যাতন চলমান তখন জন্ম হয় **ভারতভাগ্যবিধাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর**। যার হাত ধরে ভারত স্বাধীনতার মুখ দেখে, বৈদিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার শুরু হয়। উনার প্রেরণাদায়ক জীবনর একটি ঘটনা জানবো যা ছিল **গুরু বিরজানন্দ দণ্ডির** আশ্রমে শিক্ষার তার শেষদিন যখন তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। এখন গৃহত্যাগী দয়ানন্দের দেয়ার মতো কিছুই ছিল না তাই কোনো ভাবে এক মুঠ লবঙ্গ নিয়ে আসে গুরুর পছন্দ বিধায়। এসে গুরুর হাতে দিলে গুরু একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলে "**তোর মতো শিষ্যকে পড়াতে আমার সর্বোচ্চ পরিশ্রম হয়েছে যা অন্য কোনো ছাত্রের পেছনেও হয়নি। আর তার দক্ষিণা হিসেবে এইটুকু লবঙ্গ দিলি?**" এমন কথা শুনে দয়ানন্দ একটু চিন্তায় পড়লো, যে গুরুদেব এতো উচ্চ কোটির জ্ঞানী তার মধ্যে ১ম লোভ দেখছে। তখনই দন্ডিজী বললেন, "**চোখ বন্ধ কর শোন চারিদিকে কত মায়ের আর্তনাদ, ভারতমাতার কান্না। এগুলো শোন, আর যা তা দূর কর। আমি তোর থেকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তোর সম্পূর্ণ জীবন চাচ্ছি, আয়ুর পূর্ণ সময় তুই এই পরাধীন দেশের কষ্ট দূর কর, স্বাধীনতার অর্জন করা, সারা দেশে পুনরায় বেদের মহিমা প্রচার কর সেই বৈদিক সুবর্ণ যুগ প্রতিষ্ঠা কর**।" সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হয় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর।

তখন থেকেই সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বেদের প্রচার, বৈদিক জ্ঞান প্রচার ও দেশমাতৃকার চেতনা জাগরণের কাজ শুরু করেন তিনি, আর সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠা করেন **'আর্য সমাজ'**।

এখন নাম আর্য সমাজ কেন হল?

কেননা আর্য **অর্থ হল শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন**। বেদেও আর্য বা শ্রেষ্ঠ হতে বলা হয়েছে **(কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্)**। মূলত আমাদের পরিচয়ও হওয়া উচিত আর্য হিসেবেই। ভগবান **শ্রীরাম** ও **শ্রীকৃষ্ণ** ইনাদেরকেও আর্য বলেই সম্বোধিত করা হতো-

"শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বাম্ আর্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্।

অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ।।

[যুদ্ধকাণ্ড, ৮৩।14]

অর্থঃ হে আর্য! আপনি ধর্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়; কিন্তু ধর্ম আপনাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে পারছে না, অতএব ধর্ম পালন করা নিরর্থক।

আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ।।১৬

[বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড, ১।১৬]

অর্থঃ তিনি শ্রেষ্ঠ/সদগুণসম্পন্ন(আর্য), সর্বদাই সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন।

গীতা ২।২ তে ও কৃষ্ণ আর্যের বিপরীত অনার্যদের ভর্ৎসনা করছেন।

তাই আমাদের মূল পরিচয় হওয়া উচিত - **ধর্মে আমরা সনাতনী, গুণে আমরা আর্য**।

আর সেখান থেকেই নাম এসেছে আর্য সমাজ।

সনাতন ধর্ম রক্ষার্থে আর্য সমাজের ভূমিকা গুনিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে কিছুটা বললে **শিক্ষা, নারীঅধিকার, শুদ্ধি, অবৈদিক মত খন্ডন** ও **বৈদিক মন্ডন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও সামাজিকীকরণ, জাতপাত দূরীকরণ** এবং **মূল স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বোচ্চ ভূমিকা (৮০% এরও অধিক)** রাখা।

কিন্তু এ যাত্রা মোটেও কোনো দিক থেকে সহজ ছিল না। মুসলিম শাসনে তো শত্রু একদিকে ছিল, বা আমরা আমাদের বর্তমান দশাও দেখলে আমাদের সমস্যা প্রায় একদিকেই। কিন্তু তখন তাদের সমস্যা ও বাধা ছিল বহুমুখী। তারা ব্রিটিশ

শাসক, তাদের ফান্ডেড খ্রিস্টান মিশনারী, তাদের সাপোর্টে চলা মুসলিম গোষ্ঠী, নিজেদের কিছু বুদ্ধিজীবী বর্গ, নিজেদেরই ভাই যারা গোড়ামি আর ধর্মব্যবসায় লিপ্ত এসব বাধা অতিক্রম করেই কাজ করেছেন। আর আমরা তাদের সন্তান হয়েও মাত্র একদিকে বাধা পেয়েই বলি দেশ ছেড়ে ভারত চলে যাব!?

দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন তথা আগ্রাসনের পর হিন্দুজাতি এক দূর্বল চিত্তে পরিণত হয়েছিল। তার সাথে ছিল তাদের সকল মত-পথকে সত্য মনে করার কাপুরুষত্বের লক্ষণ। তাই তো সরজান সিলী নামক লেখক তার প্রসিদ্ধ পুস্তক **"Expansion of England"** এ ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য স্থাপনের কারণ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে-

"Facile comprehensiveness of Hinduism," whin, in his opinion, "has enfeebled it as a uiting principle and rendered it incapable of generating true national feeling."

অর্থাৎ "হিন্দু ধর্মের উপরন্তু সব গ্রাহ্যতা অর্থাৎ উদারতার পরিণামস্বরুপ তারা এতোটাই নমনীয় হয়ে গেছে যে তাদের অনুসারীদের মধ্যে না আছে একতার শক্তি আর না বাকি আছে বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রীয় ভাবনা উৎপন্নের সামর্থ্য।"

এমন অবস্থায় আর্য সমাজ হিন্দুদের মাঝে চেতনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে সেই ফুলকির মতো কাজ করে। যেখানে মুসলিম আগ্রাসনের নির্মমতা থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রিটিশ শাসনকে স্বর্গীয় সুখ বলে মনে করতে শুরু করেছিল দেশের বুদ্ধিজীবী বর্গ, সেখানে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন দূরদর্শিতা সম্পন্ন। তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার মন ভোলানো কথাতে অন্যদের মতো গলে না গিয়ে সরাসরি নির্ভীকের ন্যায় 'আর্য্যাভিবিনয়' বই রচনা করেন যেখানে তিনি লিখেন- **"**অন্য দেশবাসী রাজা যেন কখনো আমাদের দেশে শাসন না করে। আমরা যেন কখনো পরাধীন না হই**"**। তিনি আরো বলেন-

"বিদেশি রাজ্য যতোই মাতা-পিতার মতো কল্যানকর হোক না কেন কিন্তু তা স্বদেশী রাজ্যের সমান হতে পারবে না।"

এই রুদ্রাগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ লেখন সম্পর্কে **১৯৪৪ সালে** এক সম্মেলনে স্বতন্ত্রতা সংগ্রামী **ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন-**

"বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এর চেয়ে অধিক নির্ভীক ঘোষণা আর কি হতে পারে ? এ যেন এক মেধাবী ও সাহসী যোদ্ধার বাণী ছিল।"

এমনই দুঃসাহসিক ও প্রেরণাময় বাণী দ্বারা সারা দেশে স্বতন্ত্রতার ভাবনা আবার পূনরায় জাগৃত হতে থাকে। তার অমরগ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ' ও সকল নির্ভীক প্রবচনে প্রতিটা যুবক-শ্রোতার হৃদয়ে দেশমাতৃকার ব্যথা অনুভব হতে থাকে। এভাবেই মহর্ষি ও তার আর্য সমাজ দ্বারা প্রতিটি ঘরে ঘরে হাজারো সংগ্রামী তৈরি করতে থাকে। ভগৎ সিংহ থেকে সুভাষ চন্দ্র বসু, বীর সাভারকার থেকে রাম প্রসাদ বিস্মিল সকলেই আর্যসমাজের অনুসারী বা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

বাংলার বীরসন্তান নেতাজী সুভাস চন্দ্র বোসের আর্যসমাজের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। একজন আর্য সমাজীর সাথে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় কিন্তু তা দেখে এক পান্ডা হিংসাবৃত্ত হয়ে তাকে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলে। **[An Indian Pilgrim, পৃ-৭০]**।

তবে আর্য সমাজের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা আমরা তার বাক্যেই জানতে পাই-

"আর্য সমাজ তো আমার মা, যে আমায় জন্ম দিয়েছে...

ভারত আজাদীর যুদ্ধে যেই অংশগ্রহণ করছে, তাদের কোনো না কোনো ভাবে আর্য সমাজের সাথে সম্বন্ধ অবশ্যই আছে, তা সে যেই মত পথের সাথেই সম্বন্ধ রাখুক, কিন্তু দয়ানন্দজীর স্বদেশীর আহ্বানের তার উপর প্রভাব রয়েছেই। কেননা স্বামীজীই (**এখানে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী**) সবার প্রথমে বলেছিলেন যে, স্বদেশী রাজ্যই সর্বোপরি উত্তম হয়ে থাকে।**"**

[জীবন সংঘর্ষ, প্রকাশক রাজপাল এন্ড সন্স, লাহোর।]

নেতাজীর ঝাঁসি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বীরাঙ্গনা ও ভারতবর্ষে **১**ম নারী গোয়েন্দা নীরা আর্যাও আর্যসমাজের সদস্য ছিলেন এবং দেশের জন্য তার অসহ্য ও নির্মম অত্যাচার সহ্যের কাহিনী যে কারো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে, যে অত্যাচার কোনো স্বাভাবিক পুরুষও সহ্য করতে অক্ষম, তা তিনি সহ্য করেছিলে দেশমাতৃকার জন্য।

আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী রামপ্রসাদ বিস্মিল তার জীবনীতে লিখেছেন- **"মুনশি জী আর্যসমাজ সম্বন্ধিত কিছু উপদেশ দিলেন, অতঃপর আমি সত্যার্থ প্রকাশ পড়লাম এতে এক বিরাট পরিবর্তন এলো। সত্যার্থ প্রকাশের অধ্যায়নের ফলে আমার জীবন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। আমি কিছু দিনের মধ্যেই কট্টর আর্য সমাজী হয়ে গেলাম..."।**

[বিস্মিল কি আত্মকথা. পৃ-১৫]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডে যখন তাকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়, ফাঁসির আগে তার শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়া হলে তিনি দৃঢ় স্বরে বলেন, "আমি এদেশে ব্রিটিশ শাসনের পতন চাই"।

"আমি যথানিয়মে গ্রীষ্ম হোক আর বর্ষা, ভোর ৩ টায় উঠে প্রাতঃকালের সন্ধ্যাপোসনা করে নিত্য যজ্ঞও সম্পন্ন করতাম। পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত প্রত্যেক সিপাহী দেবতার ন্যায় আমার সম্মান করতো, যদি কারো সন্তানের কষ্ট হতো তো তারা হবনের ভস্ম নিয়ে যেত।"

[বিস্মিল কী আত্মকথা, পৃ-১১২]

এখানে মূলত বিস্মিল তার সর্বশেষ কারাবাসের শেষ সময়ে তাঁর জীবনচর্চার বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি তার বন্দি জীবনেও সন্ধ্যা-যজ্ঞ ত্যাগ করেনি, এমনই ধর্মপ্রাণ আর্যসমাজী ছিলেন বিস্মিল।

"পরমাত্মার নিকট আমার প্রার্থনা যেন তিনি আমায় এদেশেই জন্ম দেন। আমি যেন তার পবিত্র বাণী মনুষ্যমাত্রের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম হতে পারি।"

[বিস্মিল কী আত্মকথা, পৃ-১৩২]

এ বাক্য দ্বারা এই আর্যবীর দেশপ্রেমিক আর্যসমাজের সিদ্ধান্তকেই তার শেষ ইচ্ছারূপে দর্শিয়েছেন। জন্মান্তরবাদে আস্থাশীল হয়ে পরবর্তী জন্মকে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর কর্ম তথা বেদপ্রচারেই সমর্পণ করতে চেয়েছেন।

বর্তমানে যে হিন্দুত্ববাদের স্রোত দেখা যাচ্ছে তার প্রবর্তক মানা হয় 'বিনায়ক দামোদর বীর সাভারকার' কে। তার প্রেরণাস্থলও ছিল এই 'সত্যার্থ প্রকাশ'। তিনি তার কারাবাসের সময় সাথে সত্যার্থ প্রকাশ রাখতেন এবং অন্যদেরও তা বিশেষ ভাবে পড়াতেন। এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে-

“আন্ডামানে হিন্দি পুস্তকে পূর্ণ করতে থাকি..... 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামক পুস্তকের উপর আমার বিশেষ ধ্যান ছিল, রাজবন্দিরাও সেটা বারবার পড়তে থাকে...**”**

[আজন্ম কারাবাস, খন্ড-৩, পৃ-২৯৯]

তিনি আরও বলেছিলেন-

“আর্যসমাজ ও মহর্ষি দয়ানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারো থেকে লুকায়িত নেই, মহর্ষির সত্যার্থ প্রকাশ পড়ে আমি সন্তুষ্ট হই, আমি যে স্বাধীনতার কথা ভাবি তার পেছনে মহর্ষি দয়ানন্দের সত্যার্থ প্রকাশ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এজন্য আমি মহর্ষি দয়ানন্দের একজন বড় ভক্ত। বর্তমান সময়ে এদেশে আর্যসমাজই একমাত্র সংগঠন যা সকল প্রকারে রাজনৈতিক স্বার্থের বহির্ভূত, এ সংগঠন দ্বারাই দেশের কল্যান সম্ভব।**”**

[নবভারত টাইমস, দিল্লি দৈনিক, দিল্লি ১৬-৮-৫৭ অঙ্ক]

আরেক মহান ক্রান্তিকারী ভগৎ সিংহ পারিবারিক ভাবেই একজন আর্য সমাজী ছিলেন। তার পিতামহ সর্দার অর্জুন সিংহ মহর্ষির প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। তিনি শিখ পরিবারের হলেও মহর্ষির তপবলে তার সামনে সত্যের পথ উন্মোচিত হয়। তিনিও একজন স্বতন্ত্রতা সংগ্রামী ছিলেন।

[যুগদ্রষ্টা ভগৎ সিং ঔর উনিকে মৃত্যুজয়ী পুরখে- লেখক: বীরেন্দ্র সিন্ধু, পৃ-৩-৬]

ভগৎ সিং সেই দেশভক্তি তার দাদু থেকেই পান। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের থেকে পালিয়ে তিনি আশ্রয় নেন তার বিশ্বস্ত স্থান আর্য সমাজ মন্দিরে (কোলকাতা)।

ভারতীয় স্বতন্ত্রতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে যারাই অল্প হলেও জানেন তাদের কাছে এই নামগুলো অত্যন্ত পরিচিত, কেননা ইনাদের ছাড়া স্বাধীন ভারত কল্পনাও করা যায় না। আরো মূখ্য নাম- স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত লেখরাম, লালা লাজপত রায়, পরমানন্দ, গোবিন্দ রাণাডি, প্রেমচাঁদ, মদনলাল ইত্যাদি ইত্যাদি ; এই লিস্ট শেষ হওয়ার নয়। স্বাধীনতার আগে মাত্র কয়েক বছরের তৈরী একটি সংগঠনের এমন সিংহভাগ ভূমিকা যেকোনো ইতিহাসেই দূর্লভ। একমাত্র আর্যসমাজ বলেই এটি সম্ভব।

তাই তো ইন্ডিয়ান আনরেস্ট" এর পৃষ্ঠা নং ১৬১ তে লেখক অনেক আগেই এটি অনুভব করেছিলেন। তার মতে-

"The whole drift of Dayanand's teachings is far less to reform Hinduism than to range it into active resistance to the alien influences with threatened, in his opinion, to denationalise it."

অর্থাৎ- "দয়ানন্দের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যতোটা না হিন্দু ধর্মের সংস্কার করা ছিল, তার চেয়ে অধিক ছিল আর্য সমাজ দ্বারা বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ গড়ে তোলা"

শুদ্ধি আন্দোলন

স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াও আর যে অবদানের জন্য সনাতনী সমাজ চির কৃতজ্ঞ থাকবে তা হলো শুদ্ধি আন্দোলন বা যাকে ঘর ওয়াপ্সি বলা হয়। অর্থাৎ ধর্মান্তরিত অথবা সনাতনে আসতে ইচ্ছুক ভাইবোনদের ফিরিয়ে আনার যে কর্মযজ্ঞ। হিন্দুদের কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম জঘন্য একটি ছিল যে কেউ সনাতন ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এমন নিয়ম বানানো। অর্থাৎ কেউ ভুলে ধর্মান্তরিত হলে সে ভুল শুধরিয়ে ফিরতে পারবে না আর অন্য রিলিজিয়নে জন্মানো কেউ তো নয়ই কারণ তারা বৈদিক কর্মগুণে বর্ণাশ্রম বাদ দিয়ে জন্মগত বর্ণ মানতো ফলে ভিন্ন মতাদর্শে জন্ম নেয়া কারো বর্ণ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না তাদের অনুযায়ী। আর এরই সুযোগ নিয়ে আমাদের ভাইদের ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে। মুসলিম খ্রিস্টান উভয় পাশ থেকেই প্রবল বেগে কনভারশন চলতে থাকে। তার উপর জাতপাত অস্পৃশ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে খ্রিস্টান মুসলিমদের ওখানে কিছুটা সন্মানের আশাতে তো কতো ভাই চলে যেত তার হিসাব নেই!

এই দুর্দশা দেখতে পেরেই আর্য সমাজ ১ম শুদ্ধিকার্য শুরু করে যা শুদ্ধি আন্দোলন নামে বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করে। এজন্য শুদ্ধিকার্যের প্রবর্তক বলা হয় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকে এবং সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী।

সেই ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের পর ১ম শুদ্ধিকার্য করেন মহর্ষি জী যেখানে মুন্সি মুহাম্মদ উমর নামের এক ব্যক্তি সনাতনে ফিরে আসেন শ্রী অলখধারী হয়ে। তিনি উত্তরপ্রদেশের সহানপুরের নিবাসী ছিলেন এবং একদিন দেহরাদুনে মহর্ষি জীর প্রবচনে এতোটাই মুগ্ধ হন যে তিনি সনাতনে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি সনাতনের প্রচার কার্যে লেগে পড়েন, তার সকল সম্পত্তি খরচ করে দেহেরাদুনে আর্যসমাজ মন্দির তৈরি করান।

এরপর থেকে মহর্ষির দেখানো পথে আর্যসমাজের অনুসারীরা এই মহৎ কার্যে লেগে পড়েন। কিন্তু কাজ যতটা মহান ততোটাই বাধাসম্পন্ন ছিল। বিধর্মীদের থেকে তো বিরোধ স্বাভাবিক ছিল কিন্তু নিজেদের মানুষই যখন বিরোধী হয়ে উঠে! এই দুঃখজনক ইতিহাসের কিছু ঝলক দেখাটাও জরুরি-

"লায়লপুরে শুদ্ধি সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ও শুদ্ধি শেষে সেই কথিত নিচু জাতির হাতে প্রসাদ গ্রহণ করায় তাদেরকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়"

[দ্য আর্যপত্রিকা, ৪ আগস্ট, ১৯০০]

"সনাতন ধর্ম সভা সিয়ালকোটে মেঘ জাতির শুদ্ধিকার্যের বিরোধ করা হয়। দোকানে কাজ করা এক শুদ্ধি হওয়া মেঘকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়।"

[Shuddhi Movement in India, pg- 72]

" ১৯১১ তে সিন্ধু প্রদেশে বশিষ্ঠ নামক কথিত নিচু জাতির কয়েক হাজার সদস্যদের শুদ্ধি করানো হয়। এরও বিরোধ হয়। শুদ্ধিকারী আর্যদের সাথে সেই সনাতনে আগত ব্যক্তিদেরও উপনয়ন সংস্কার করানোর অপরাধে তাদের গায়ে গরম লোহার শিক দিয়ে যজ্ঞোপবীতের স্থান ঝলসে দেয়া হয়। এই অত্যাচারের ব্যাপক সমালোচনা হয়।"

[Arya Directory, pg- 191]

এমন হাজারো উদাহরণ রয়েছে আর্যসমাজের ইতিহাসে যে শুদ্ধি করার অপরাধে সমাজচ্যুত, একঘরে করে দেয়া, গ্রাম ছাড়া করা, মারধোর করা। একইসাথে কংগ্রেস সরকার তথা গান্ধীর থেকেও এই শুদ্ধি আন্দোলনের নিন্দায় আরো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

শুধু কি তাই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম **টাইমস অফ ইন্ডিয়া** আর্যসমাজের এই শুদ্ধি আন্দোলনের বিরোধী সংবাদ ছাপায় এবং সরকার থেকে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে-

"... আর একই সাথে এটাও তদন্ত করা উচিত যে শুদ্ধি আন্দোলন সংগঠনের দেশে কি প্রভাব পড়ছে। ...তবে তা অবশ্যই বলব যে যদি তদন্তের পর গভর্মেন্ট এটা জানতে পারে যে আর্যসমাজই এসকল ঝগড়ার মূল তো নির্দ্বিধায় গভর্মেন্টের উচিত আর্যসমাজ নিষিদ্ধ করে বন্ধ করে দেয়া"

[Quoted from- **সার্বদেশিক পত্রিকা, মে ১৯২৭, পৃ: ১১-১৬]**

কাশীতে ধর্মান্তরিত দলিতদের বুঝিয়ে আবার শুদ্ধি করে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী, কিন্তু শেষ সময়ে মঠের কিছু কথিত গুরু এসে বাধা দেয় এবং তাদের শুদ্ধি আর করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এতো অত্যাচার-বাঁধার পরও তারা থেমে থাকেন নি। ধর্মান্তরিত ভাইবোনদের সনাতনে ফিরিয়ে আনতে তারা লড়েই গেছেন যার সফলতা আমরা এখন দেখছি-

"মুলতান, লায়লপুর, মোন্টগোমরী, ঝঙ্গ, মোজাফফরনগর ইত্যাদি স্থানে ২৩০০০ ওড়ো জাতির শুদ্ধি করা হয়।"

[Senses of India, 1931, Punjab Report, pg 350]

"১৪ই মার্চ, ১৯০৩ এ জম্মু, সিয়ালকোট ইত্যাদি প্রদেশগুলোতে বসবাসরত মেঘ জাতির শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়। ৬ বছরের মধ্যে ৩৬,০০০ মেঘদের শুদ্ধি করানো হয়।" তাদের শুদ্ধির পর তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে তাদের লেখাপড়া কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

[The Upliftment Movement of Sialkot Punjab, pg-12]

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মোপলা, মালাবার গণহত্যা ও হায়দ্রাবাদে নিজাম শাসনে যে জোর পূর্বক ধর্মান্তরণ চলেছে সেখানে আর্যসমাজ প্রাণের ঝুকি নিয়ে তাদের শুদ্ধি করিয়ে সনাতনে ফিরিয়ে আনে। শুধু হায়দ্রাবাদের অবস্থা দেখেই বুঝা যাবে কতটা শোচনীয় ছিল অবস্থা ছিল সেসময়।

"নারায়ণপুরে সে (রাজাকার সেনা আসদুল্লাহ) এক রাতেই ১২০০ হিন্দুকে চারদিক থেকে ঘেরাউ করে এবং জোরপূর্বক মুসলিম হতে বাধ্য করে"

[রাজাকার, কিসোর ব্যাস, পৃ ৬০]

সেখানে এক আর্যসমাজীকে আটক করলে

"মরাঠবাড়ার গুজোটি গ্রামে আর্যসমাজের কর্মকর্তা বেদপ্রকাশকে মুসলমানরা ধরে হত্যা করার আগে ইসলাম কবুল করার শর্ত রাখে, তো তিনি নির্ভীক হয়ে বলেন- " ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে ভালো আমি বীরগতি প্রাপ্ত হবো।""

[রাজাকার, কিসোর ব্যাস, পৃ ৫৪]

এতোকিছুর পরও আর্যসমাজ থেমে থাকেনি। তারা শুদ্ধি চলমান রাখে-

"৩০ হাজার দলিত হিন্দুদের মুসলমান বানানো হয়।... পরে তাদের অনেক বুঝিয়ে সেই ৩০,০০০ দলিত ভাইকে পুনরায় হিন্দু বানানো হয়"

[শুদ্ধি আন্দোলন ঔর মুসলিম বিদ্বানো কি ঘরওয়াপ্সি, পৃ ৫২-৫৩]

আর্যসমাজের এই অভূতপূর্ব কার্য দেখে তৎকালীন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বিচারপতি নরেন্দ্র চপলগাংবকর বলেন-

"৩০ হাজার দলিত মুসলিমদের পুনরায় শুদ্ধি করিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার এই কার্য দ্বারা আর্য সমাজ বড়োই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।"

[হায়দ্রাবাদ মুক্তি সংগ্রাম কা ইতিহাস, পৃ ১১০]

সেই সময় এতো ত্যাগের পরও তারা শুদ্ধি আন্দোলন চালিয়ে গেছেন বলেই আজ অন্তত সনাতনীদের সংখ্যাটা কিছুটা বজায় আছে, নয়তো এই জনসংখ্যার ৩০% ও থাকতো কিনা তা বিবেচনার বিষয়। কেননা কয়েকপুরুষ পার হলেই মানুষ সেই মতে কট্টরপন্থি হয়ে পরে যা আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও দেখতে পাই। পরে তারাই আমাদের উপর অত্যাচার করতো।

শুধুমাত্র এই শুদ্ধিকার্যের জন্যই বহু আর্যবীরদের জীবন বলিদান দিতে হয়েছে। শুরুতেই সেই শুদ্ধি আন্দোলনের মহানায়ক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী যাকে অসুস্থ অবস্থায় হত্যা করে আব্দুল রশীদ । সেই দিন মসজিদে মসজিদে জৌলুস পালন করা হয়। তাছাড়া এই লিস্ট বিশাল- ধর্মবীর লেখরাম, শ্রী লালা বদ্রীশাহ, বাবু বাহাদুর সিংহ, বাবু ভৈরো, লালা নানকচন্দ্র, লালা নন্দলাল, শ্রী জয়রাম, পুরুষোত্তম দাস সহ অগণিত বীর যারা শুদ্ধি কার্যের জন্য জীবন বলিদান দেন। সনাতনী সমাজ তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

তবে একটা বিষয় এই যে বিদেশী হতাশাগ্রস্ত নাগরিকদের ভজন-কীর্তন দ্বারা মানসিক শান্তির পথ দেখিয়ে অনুসারী বানানো আর কোনো রিলিজিয়নের সর্বোচ্চ পদের ধর্মগুরুদের সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আর্যসমাজের শুদ্ধিকার্যের এমন উদাহরণ অহরহ যে মসজিদের মুফতি, ইমাম প্রবচন বা শাস্ত্রার্থের শেষে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এরপর তার প্রচার ও সেই পূর্বমতের অকাট্য খন্ডনও করছেন।

সংক্ষিপ্ত তালিকা:-

১) মহেন্দ্র পাল আর্য পূর্বনাম মুহাম্মদ মেহেবুব আলী

২) মহাশয় ধর্মপাল পূর্বনাম মৌলবী আব্দুল গফূর

৩) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পূর্বনাম মৌলবী দীব মুহাম্মদ

৪) সত্যদেব আর্য পূর্বনাম মৌলানা গুলাম হেদার

৬) ঠাকুর উত্তমসিংহ পূর্বনাম মিয়া আকবর আলী

৭) শ্রী জ্ঞানেন্দ্র দেব পূর্বনাম মৌলানা হাজী আব্দুল রহমান

৮) পণ্ডিত দেবপ্রকাশ পূর্বনাম আব্দুল লতিফ

এমন বহু বহু নামের উল্লেখ করা যায়, যারা হয়তো খন্ডনে জন্য সত্যার্থ প্রকাশ পড়ে সনাতনে ফিরেছেন নয়তো শাস্ত্রার্থ বা প্রবচনের পর। এরাই পরে পূর্বমতের খন্ডন তো তাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রার্থ করে তাদের হারিয়েছেন। একাজ একমাত্র আর্যসমাজই করতে পারে। ভারতে এমন অনেক আর্য গুরুকুলও আছে যা আগে কোনো মৌলভী পরিচালিত মাদ্রাসা ছিল, তিনি শুদ্ধির দ্বারা সনাতনে ফিরে সেটাতেই গুরুকুল পরিচালনা শুরু করেন; চার্জের পাদ্রি সেখানেই গুরুকুল শুরু করেন। উদাহরণ স্বরূপ পিপরোল গ্রামের একটি চার্চ যা বর্তমানে একটি আর্যসমাজ মন্দির।

মহাপুরুষ ও ভগবানদের সম্মান রক্ষার্থে আর্যসমাজ-

১৯২৩ এ একদিন প্রতিটা মুসলমানের হাতে কিছু বই দেখা যাচ্ছিল যা বিনামূল্যে মসজিদে বিলি করা হচ্ছিল। বইগুলোর নাম হলো 'কৃষ্ণ তেরি গীতা জালানি পাড়েগি' ও 'উন্নিসবি সাদি কা লাম্পাট মহর্ষি' এর আগেও 'সীতা কা ছিনালা' নামক বই ছাপিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে গালিগালাজ পূর্ণ বইগুলো সবার হাতে হাতে ছিল। কত কৃষ্ণ ভক্ত এসব দেখেও না দেখার ভান করে ছিল কারণ কিছু বলতে গেলেও প্রাণের ভয়। কিন্তু কোনো আর্যসমাজী কি করে চুপ থাকতো তার ভগবানের উপর অপমান দেখে। তাই কলমের জবাব কলম দিয়ে নেয়ার কথা ভাবেন ইসলামের বিশেষজ্ঞ আর্য মহান পণ্ডিত চমুপতি জী। তারা আমাদের মহাপুরুষ নিয়ে গালিগালাজ করেছে সেখানে তিনি তার মন্ডনে 'যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ' নামক বই লিখে কৃষ্ণের মূল পবিত্র চরিত্র তুলে ধরেন; এরপর কাউন্টারে তাদের মহাপুরুষ নিয়ে কোনো গালিগালাজ ছাড়া তাদের বইয়ের সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বই লিখেন 'রঙ্গিলা রসুল' নামের। এই বই কেউ ছাপাতেও চায়নি, পরে আরেক আর্যসমাজের অনুসারী মহাশয় রাজপাল জী এটা ছাপাতে রাজি এটা জেনেও যে এতে তার মৃত্যু নিশ্চিত। বই উন্মোচিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজে হাহাকার শুরু হয়ে যায়। কোনো জবাব দেয়ার সামর্থ্য না থাকায় রাজপাল জী কে হত্যার হুমকি ও চেষ্টা করা হতে থাকে। আদালতে অভিযোগ করলেও, বইটিতে কোন ভুল প্রমাণ করতে না পেরে একদিন ইল্মদীন নামক এক উগ্রবাদী মুসলমান মসজিদের উস্কানিমূলক ভাষণ শুনে আসে এবং ঘুমন্ত রাজপালকে চাপাতি দিয়ে হত্যা করে। সেই ইল্মদীনকে এখনো মুসলিম সমাজ বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে অথচ আমরা আমাদের বলিদানী রাজপাল জীকে ভুলে গিয়েছি।

মন্দির রক্ষার্থে আর্য সমাজ

১৯৩০ এ হায়দ্রাবাদের নিজাম উসমান আলী তার রাজনৈতিক শক্তির অপপ্রয়োগ করে ৮৫% সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপরই নির্যাতন চালাতে থাকে ও হিন্দুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করাতে থাকে যা আমরা পূর্বেও দেখলাম। এখন সনাতন বিদ্বেষী নিজাম দ্বারা হায়দ্রাবাদের সকল মন্দির বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নিজ স্বার্থের লোভে কিছু পৌরাণিক পুরোহিতও নিজামের চাটুকারিতায় লিপ্ত হয় আর বাকিরা ভয়ে লুকায়িত থাকে। এ অবস্থা আর্য সমাজ জানতে পেরে সারা দেশ থেকে আর্যবীরেরা হায়দ্রাবাদে একজোট হয়ে নিজামের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে থাকে এবং বহু প্রাণের বলিদানের পর নিজামকে মন্দির খুলতে বাধ্য করা হয়। আর এই সত্যাগ্রহই পরে নিজামেত পতনের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

(তথ্যসূত্র- হায়দ্রাবাদ মুক্তি সাংগ্রাম কা ইতিহাস)

"১৯৪৬ সালের নোয়াখালী ও কোলকাতার দাঙ্গা চলাকালীন সকলে প্রাণ বাঁচাতে যেখানে পালিয়ে যায়, নিজের আরাধ্যের মন্দির ছেড়েও পলায়ন করে। আর্য সমাজের বীরেরা তখন জাকারিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত শিব মন্দির ম্লেচ্ছরা হামলা করতে আসলে তাদের হাত থেকে রক্ষা করে।"

(তথ্যসূত্র- আর্যসমাজ কোলকাতা কা ইতিহাস- উপাকান্ত উপাধ্যায়)

বৈজ্ঞানিক বেদভাষ্য

আর্যসমাজের কথা শুনলেই যে কারো মাথায় চলে আসবে বেদের কথা। আর্যসমাজের রক্তে বেদ মন্ত্র বাহিত হয়। সেই বেদেরই যখন বিকৃত অর্থ করা হচ্ছিল, বেদের শুদ্ধ অর্থ যখন বিলুপ্ত হয়েছিল তখন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের বৈজ্ঞানিক ও মূল অর্থ পুনরুদ্ধার করেন। একইসাথে অন্যান্য আর্য বিদ্বানেরাও এতে ভূমিকা রাখেন।

মহাত্মা শ্রী অরবিন্দ, স্বামী দয়ানন্দের বেদভাষ্য সম্বন্ধে লিখেছেন-

"বেদভাষ্য সম্বন্ধে আমার পূর্ণ বিশ্বাস- অন্তে যে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হউক না কেন, স্বামী দয়ানন্দ সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন। কারণ তিনিই ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অন্ধকার ও বহু শতাব্দীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল। তাঁহার দৃষ্টিই ইহা ভেদ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল। সহস্র বৎসরের বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি তিনিই পাইয়াছিলেন এবং বন্ধ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া স্রোতের প্রবাহ খুলিয়াছিলেন।"

(বঙ্কিম তিলক দয়ানন্দ, দয়ানন্দ ও বেদ)

গোরক্ষা

সনাতন ধর্মে তথা মানব জাতির জন্য গো বা গরু কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সবাই জানি। কিন্তু এটিকেই বিদ্বেষের হাতিয়ার বানানো হতে থাকে বারম্বার। মুসলিম শাসনেও বারম্বার প্রহার হয় গরুর উপর শুধু হিন্দুদের ধর্মহানীর জন্য। ব্রিটিশ আমলেও একই অবস্থা থাকে।

তাই এসব সমস্যা দেখে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতে ১ম গোশালা তৈরি করে। তিনিই গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক যা একসময় বিশাল রূপ ধারণ করে। গোরক্ষায় ১ম বইও ছিল **গোকরুণানিধি যা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর রচিত**।

অনাথ ও শিক্ষা

ভারতে সনাতনীদের অনাথাশ্রমও ১ম আর্য সমাজ দ্বারাই চালু হয়। খ্রিস্টান মিশনারীরা অনাথ বাচ্চাদের আশ্রয় ও খাবার দেয়ার নাম করে কনভার্ট করার কাজ করে যাচ্ছিল। তখন অনাথাশ্রম খোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় DAV স্কুলও চালু হয় যেখানে অনাথ বাচ্চারাও পড়তে পারে। এই স্কুলে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি বৈদিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার স্বপন ছিল গুরুদত্ত বিদ্যার্থী জীর। ভারতের এই স্কুল এখনো স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান।

ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ

ব্যাকরণের পরিভাষায় **"ধৃঞ্-ধারণে"** ধাতুর দ্বারা **'মন্'** প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ সিদ্ধ হয়। **"ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ" "প্রিয়তে অনেন লোকঃ"** আদি ব্যুৎপত্তি অনুসারে, 'যা আত্মোন্নতি এবং উত্তম সুখের জন্য ধারণ করা হয়' অথবা যার দ্বারা লোকসকল ধারণ করে অর্থাৎ ব্যবস্থা বা মর্যাদায় স্থিত করা হয়, তাকেই ধর্ম বলে। এই প্রকারে আত্মার উন্নতি করে এমন, মোক্ষ বা উত্তম ব্যবহারিক সুখ প্রদানকারী সদাচরণ, কর্তব্য অথবা শ্রেষ্ঠ নিয়ম-কানুন বিধানই ধর্ম। আবার ধর্ম বলতে বৈশিষ্ট্যও বোঝায়। যেমন অগ্নির ধর্ম উত্তাপ প্রদান করা, জলের ধর্ম শীতলতা প্রদান করা, নদীর ধর্ম প্রবাহিত হওয়া।

ধর্ম, বিশ্বাস বা মতবাদ, রিলিজিয়ন এর মধ্যে পার্থক্য কী কী?

ধর্ম বৈশ্বিকভাবে সবার জন্য সমান। সর্বজনীন। সত্য কথা বলা, অন্যায়ভাবে অন্যকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি সব মানুষের জন্য সমান হওয়াই তা ধর্ম। ধর্মের প্রথম শিক্ষক পরমেশ্বর, যা তিনি সভ্যতার শুরুতেই প্রথম মানব প্রজন্মকে বেদের মাধ্যমে দিয়েছেন। ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং ঈশ্বর। অপরদিকে **মত** প্রতিটি মানুষের জন্য সমান নয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা নির্ধারিত বিশ্বাস, যার সবকয়টি Universal নয়, অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে গৃহীত নয় তাই মতের অধীনে আসে। নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পরা, প্রতীক ব্যবহার করা, মানুষের কাছে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো উপাসনা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মতের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু ভালো জিনিস আছে আবার অনেক অযৌক্তিক জিনিসও আছে। ধর্ম একটিই এবং মতামত অনেক। মতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো সম্প্রদায়।

Religion বা রিলিজিয়ন: পৃথিবীতে আমরা যে সব প্রচলিত Religion দেখি সেগুলো ধর্ম নয়। সেগুলো নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুনের সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ। Religion শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধর্ম নয়। Religion শব্দের সংস্কৃত অর্থ মার্গ। ধর্ম শব্দটা Religion এর বাংলা হিসেবে আমরা প্রচলিত ভুল অর্থে বা Misnomer হিসেবে ব্যবহার করি।

কোনো ইউরোপীয় ভাষায় এমন কোনো শব্দই নেই যা সংস্কৃত শব্দ ধর্মের সমার্থক। ধর্ম "কর্মের আদর্শ" বোঝায় এবং "আইন এবং প্রথা, নৈতিকতা, কর্তব্য এবং পুণ্য" ধারণাগুলিকে প্রকাশ করে। তাই কোনো ক্ষেত্রেই একইভাবে ধর্ম শব্দটির অনুবাদ করা অসম্ভব।

[A History Of Indian Literature,vol.1, pg 352]

মনুস্মৃতিতে/মানবধর্মশাস্ত্রে ধর্মকে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থূলভাবে তা দুই অর্থে গ্রহণ করা যায়।

মুখ্য অর্থ [আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধক]

গৌণ অর্থ [লৌকিক ব্যবহার সাধক]

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মার উপকারক নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কৃত আচরণকেই ধর্ম বলে। এটিই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি সর্বভৌমিক, সর্বকালিক ও সর্বজনীন, যা কখনোই ত্যাজ্য নয়। এর প্রতিপাদন করাই ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহর্ষি মনুর ধর্মের বর্ণন:

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং ইন্দ্রিয়াণাং চ সংয়মঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।

[মনুস্মৃতি ১২।৮৩]

অর্থ: বেদাধ্যয়ন [১২।৯৪-১০৩], তপ ব্রত সাধনা [১২।১০৪), জ্ঞান- সত্যবিদ্যার প্রাপ্তি [১২।১০৪], ইন্দ্রিয় সংযম [১২।৯২], অহিংসা সব জীবে হিংসা ত্যাগ ও ভূতযজ্ঞ করা এবং গুরুসেবা পরমগুরু ঈশ্বরের উপাসনা [যোগদর্শন ১।২৬] তারপর পিতা-মাতা-আচার্যোত্তম কর্ম।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যং অক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥
[মনুস্মৃতি ৬।৯২]

অনুবাদঃ

১। [**ধৃতিঃ**] কষ্ট বা বিপদে ধৈর্য রাখা এবং দুঃখী ও বিচলিত না হওয়া তথা ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কষ্ট আসা সত্ত্বেও ধৈর্য রেখে পালন করতে থাকা,

২। [**ক্ষমা**] ধর্ম পালনের জন্য নিন্দা, মান, অপমান প্রভৃতি সহ্য করা

৩। [**দমঃ**] ঈর্ষা, লোভ, মোহ, বৈরিতা প্রভৃতি অধর্মগুলো থেকে সংকল্প ও বিচারের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা

৪। [**অস্তেয়ম্**] চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা, ছল-কপটতা, অসদাচরণ, অন্যায়, অধর্মাচরণ হয় এরকম কোনো বস্তু, ধন ইত্যাদি না নেওয়া

৫। [**শৌচম**] শরীর আর মন পবিত্র রাখা

৬। [**ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ**] ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের নিজের বিষয়ের অধর্ম এবং আসক্তি থেকে মুক্ত রাখা

৭। [**ধীঃ**] বুদ্ধির উন্নতি করা, মননশীল হয়ে বুদ্ধিবর্ধক উপায় বের করা এবং বুদ্ধির নাশ না করা

৮। [**বিদ্যা**] সত্যবিদ্যার প্রাপ্তির জন্য অধিক যত্নবান হয়ে বিদ্যা এবং জ্ঞানের উন্নতি করা

৯। [**সত্যম**] মনে, বাণীতে ও কর্মে সত্যকে মেনে চলা, সত্যভাষণ, সত্যাচরণ করা, আত্মার বিরুদ্ধ আচরণ অর্থাৎ মিথ্যাচার না করা

১০। [**অক্রোধঃ**] ক্রোধপূর্ণ ব্যবহার এবং প্রতিশোধের ভাবনা ত্যাগ করে শান্তি আদি গুণ ধারণ করা- [দশকং ধর্মলক্ষণম্। এই দশটি হলো ধর্মের লক্ষণ। এই গুণগুলো হলো ধর্মপালনের পরিচয় এবং যে মানুষ ধার্মিক, তিনি এই লক্ষণগুলো সিদ্ধ করেন। এটিই হলো ধর্মের সর্বপ্রামাণ্য দশ লক্ষণ।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ঘটায়, মানবতা এবং দেবত্বের বিকাশ ঘটায়, উত্তম সুখপ্রদ শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক কর্তব্য, মর্যাদা এবং বিধানই [নিয়ম-কানুন] ধর্ম। ব্যবহারিক ক্ষেত্র হওয়ার কারণে কর্ম, দেশ-কাল পরিস্থিতিবশত কিছু পরিবর্তনও এসে যায়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত প্রমাণ দ্রষ্টব্য –

সত্য তথা প্রিয়ভাষণ সত্যং ব্রুয়াৎপ্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎসত্যং অপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥
[মনুস্মৃতি ৪।১৩৮]

অর্থ: মনুষ্য সদা সত্য বলবে ও তা প্রিয় অর্থাৎ মধুর, শিষ্ট এবং হিতকর রূপে বলবে সত্যকথনও অপ্রিয় ও অহিতকর ভাবে যেন না বলে [যেমন অন্ধকে অন্ধ, পঙ্গুকে পঙ্গু না বলা] এবং প্রিয় বা হিতকর মিথ্যাও যদি হয় তবে তা বলবে না অর্থাৎ অপরের চাটুকারিতা ও প্রসন্নতার জন্য মিথ্যা বলবে না, এটিই সনাতন ধর্ম।

এই যে ধর্ম সবসময় সনাতন হয়, এই জ্ঞান ঈশ্বর আমাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন যে আদি গ্রন্থের মাধ্যমে তার নাম হলো বেদ। বেদ জ্ঞান হলো অনাদি এবং দেশ, কালের বন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সবার জন্য এবং সব যুগের জন্য। আর তাই বেদে যে ধর্মের বিবৃতি করা হয়েছে, তাকেই **সনাতন ধর্ম** বলে। পবিত্র অর্থববেদের
মন্ত্রে এই কথাটিই বলা হয়েছে-

ভোগ্যো ভবদথো অন্নমদদ্বহু।

য়ো দেবমুত্তরাবন্তমুপাসাতৈ সনাতনম্ ॥

[অথর্ববেদ ১০।৮।২২]

অনুবাদঃ যে অতি উত্তম গুণযুক্ত সনাতন [নিত্য স্থায়ী] দেব [স্তুতিযোগ্য পরমেশ্বর] আছেন, তাঁকে যে মানব উপাসনা করবে; সে [সুখ দ্বারা অনুভবযোগ্য হবে এবং আরো বিবিধ অন্ন [জীবনসাধন] ভোগ করবে।

অর্থাৎ সেই সনাতন পরমেশ্বরকে স্মরণকারী ব্যক্তি উত্তম ভোক্তা হন ও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জীবনসাধন প্রাপ্ত হয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে।

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎপুনর্ণবঃ।

অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ।

[অথর্ববেদ ১০।৮।২৩]

অনুবাদঃ এই [সর্বব্যাপক] সনাতন [নিত্য স্থায়ী পরমাত্মা] এবং তিনি আজ [প্রতিদিন] নিত্য নবীন হয়ে থাকেন। দিন ও রাত্রি উভয়ে একে অপরের দ্বিবিধ রূপ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাত-দিনের এই চক্র সেই সৃষ্টির আদি হতেই চলছে। তারপরেও প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত আমাদের কাছে নতুনের মতো লাগে। ঠিক তেমনি অনাদি অনন্ত সনাতন হয়েও ঈশ্বর সবসময় নবীন।

সনাতন ধর্ম কাকে বলে?

সনাতন শব্দে শাশ্বত, চিরন্তন অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল বুঝায়। সনাতন কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়, বরং প্রাণিমাত্রের ধর্মই হচ্ছে সনাতন। সনাতনকে বুঝতে গেলে প্রথমে তিনটি বিষয়ে জানা দরকার,

[১] নতুন

[২] পুরাতন ও

[৩] সনাতন।

যেমনঃ

[১] নতুন যা পূর্বে ছিল না কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত, তাই নতুন।

[২] পুরাতন নতুনের বিপরীত শব্দ পুরাতন অর্থাৎ যা বর্তমানে নতুন কিন্তু কিছুদিন পর জীর্ণ হয়, তাই পুরাতন।

[৩] সনাতন যা নতুন বা পুরাতন নয়, বরং শাশ্বত ও চিরন্তন, তাই সনাতন। যেমনঃ মূল প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা। যেমনঃ চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ করা, তা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তাই আছে, আর প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাই থাকবে, এমন নয় যে পূর্বে আকর্ষণ করতো আর এখন করে না। সূর্য আলো প্রদান করে, বর্তমানেও তাই, আর প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত একই থাকবে, এমন নয় যে পূর্বে আলো প্রদান করতো আর এখন করে না ইত্যাদি।

যে ধর্মের কখনো বিনাশ বা পরিবর্তন হয় না, তাই সনাতন ধর্ম। সনাতন মানবতার ধর্ম, তাই পবিত্র বেদ বলছে, **"কৃণ্বন্তো বিশ্বমর্যম্"** (ঋগ্বেদ ৯।৬৩।৫) অর্থাৎ; বিশ্বের সকলকে আর্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করো। **"মনুর্ভব জনয়া দৈবম্ জনম্"** [ঋগ্বেদ ১০।৫৩।৬] অর্থাৎ, প্রকৃত মানুষ মননশীল হও, অন্যকেও মানুষ হিসেবে গড়ে তোলো।

এখন ধর্মের বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

সপ্তমর্যাদা

সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ।

আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥

[ঋগ্বেদ ১০।৫।৬]

সপ্ত হলো সেই মর্যাদাসমূহ যা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। যে এই নিষেধগুলোর একটিও লঙ্ঘন করে তবে সে পাপী হয়। পরমাত্মা এই মহাবিশ্বের ভিত্তি এবং মানবতার ধারক। যে সমগ্র জীবন এই নিষেধগুলো মেনে চলে সে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হয়।

কী সেই সপ্ত মহাপরাধ সমূহ?

মহর্ষি যাস্ক তাঁর [নিরুক্ত ৬।২৭] এ ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলো হলোঃ-

১। **চুরি**

২। **ব্যভিচার**

৩। **ব্রহ্মবিদ মানবের হত্যা**

৪। **ভ্রূণ হত্যা**

৫। **পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি**

৬। **মদ্যপান**

৭। **পাপকর্ম লুকোনো** বা **অসততা**।

"য়ঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্কতে য়ো অশ্ব্যেন পশুনা য়াতুধানঃ" [ঋগ্বেদ ১০।৮৭।১৬]

অর্থাৎ, যে যাতনা দানকারী দুষ্ট প্রাণী রয়েছে, যারা মানুষের অভ্যন্তরের মাংস দ্বারা নিজেকে পুষ্ট করে; যে কিনা পশুসমূহের মধ্যে নিরপরাধ পশু দ্বারা নিজেকে উত্তমভাবে পরিপুষ্ট করে; যে হত্যার অযোগ্য গোরুর দুগ্ধকে হরণ করে-নষ্ট করে-দূষিত করে, হত্যার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধকে হরণ করে নষ্ট করে, দূষিত করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই রাক্ষস (নরখাদক) ও সকলের শত্রু।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র বলছে [১।৭।২১।৭-৮] -

অথ পতনীয়ানি । স্তেয়মাভিশস্ত্যং পুরুষবধো ব্রহ্মোজ্ঝং গর্ভশাতনম্মাতুঃ পিতুরিতি যোনিসংবন্ধে সহাপত্যে স্ত্রীগমনং সুরাপানমসংযোগসংযোগঃ

চুরি করলে, হত্যা করলে, ভ্রূণ হত্যা করলে, অবৈধ যৌন সংসর্গ করলে, ভ্রূণ হত্যা করলে এবং সুরাপান করলে ব্যক্তির জাতচ্যুতি হয়।

চুরি :-

মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ [যজু০ ৪০।১] = হে মানব ! অপরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করো না।

তৃষ্টামি তৃষ্টিকা বিনা বিষাতক্যসি [অথর্ববেদ ৭।১১৩।২] = বিষয়ভোগের তৃষ্ণা লোভময়ী, বিষরূপী এবং বিষাক্ত।

অশ্লীলতা ও ব্যভিচার :-

শ্বশুরায় বয় উষো।।শ্নথিতা বৈতসেন [ঋগ্বেদ ১০।৯৫।০৪] =ব্যভিচার দণ্ডনীয় ;

জহতীন্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে [ঋগ্বেদ ১০।৯৫।০৮] = শাসক ব্যভিচারী ও নির্যাতনকারীদের থেকে নারীদের রক্ষা করবেন।

সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ [সামবেদ ৮০] = পরমাত্মা আমাদের ব্যভিচারের নিমিত্তে আগত অবৈধ কামকে নষ্ট করুন।

প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য [ঋগ্বেদ ১।৯২।১১] = ব্যভিচারী নারী পুরুষ নিজেদের আয়ু নাশ করে।

অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাং পাদকৌ হর । মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ৎস্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ ॥ [ঋগ্বেদ ৮।৩৩।১৯] = হে পুরুষ ও নারী তোমাদের দৃষ্টি সবসময় হোক ভদ্র ও অবনত। তোমাদের চলন হোক সংযত, দেহ হোক পোশাকে আবৃত, নারীগণ হোক যজ্ঞকর্ত্রী।

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়াঃ । নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ [বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১১৪।২৭] = গৃহদ্বারা নয়,পোশাক নয়,কোনোপ্রকার আবদ্ধ দেয়ালে লোকচক্ষু থেকে আবৃত থাকা নয়, নয় কোন রাজ আভিজাত্য, চরিত্রই একজন নারীর প্রকৃত আবরণ।

হিংসা বা হত্যা :-

'অঘ্ন্যাঃ' [যজু০ ১।১] = গো আদি পশু কখনো হত্যার যোগ্য নয় ; '

দ্বিপাদব চতুষ্পাৎ পাহি' [যজু০১৪।৮] দ্বিপদী [মনুষ্য ও পক্ষী আদি] ও চতুষ্পদী [অশ্ব, গো,মহিষাদি] উভয়ের রক্ষা করো । অনেকেই বলতে পারেন পশু অর্থ বা পশু শব্দে কী কী বোঝায় -

'তবেমে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ' [অথর্ব০ **১১**।২।৯] - পঞ্চ প্রকার পশু গোসমূহ, অশ্ব, মনুষ্য , ছাগ ও ভেড়া।

'স এতান্পঞ্চ পশূনপশ্যৎ । পুরুষমশ্বং গামবিমজং যদপশ্যত্তস্মাদেতে পশবঃ'

[শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।২।১।২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীব বা পশুর মধ্যে মনুষ্যও রয়েছে । আবার মন্ত্রে গাবো উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ কিনা মহিষাদি সকল গোরূপ প্রাণী ।

'ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ' [যজু ১৩।৪৯] আমরা যেন অদিতি তথা খণ্ডন অযোগ্য ঘৃত প্রদানকারী গবাদি পশুকে হিংসা না করি।

'ক্ষুধে যো গাং বিকৃন্তন্তং ভিক্ষমাণৼউপ তিষ্ঠতি দুষ্কৃতায়' [যজু০ ৩০।১৮] খাদ্যের জন্য যারা গো হত্যা করে, তাদের দূর করো ।

ভ্রূণ নিধন :-

কন্যাভ্রূণ হত্যা অনগ্রসর উপমহাদেশীয় সমাজে এখনো এক বড় সমস্যা। বিশ্বের সবচেয়ে অধিক ভ্রূণহত্যায় পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত প্রথম,ভারত দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশ পঞ্চম অবস্থায় আছে। পবিত্র বেদ যেখানে কন্যা সন্তান প্রাপ্তিকে বিরাট সৌভাগ্য বলে ঘোষণা করে সেখানে বেদজ্ঞান এর অভাবে ভারত-নেপালের মত জায়গায় প্রচুর কন্যাভ্রূণ হত্যা হয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ঋগ্বেদ ৮।৩১।৮ বলা হয়েছে - **পুত্রিনা তা কুমারিনা বিশ্বমায়ুর্বৈশ্নুতঃ। উভা হিরণ্যপেশস।**। অর্থাৎ কন্যা সন্তান প্রাপ্তি জগতে সুখের সাথে বেঁচে থাকার ও কল্যাণ লাভ করার এক হিরণ্য (সোনালী) উপায়।

ঋগ্বেদ ১০।১৫৯।৩ বলছে- **"মম পুত্র শত্রুহনোহমে দুহিতা বিরাট।।"**। অর্থাৎ পুত্র সন্তান যদি শত্রুঘাতক হয় ,তবে কন্যা সন্তান বিরাট সৌভাগ্যদায়ক। কন্যা সন্তান প্রাপ্তিতে এই মন্ত্রে বিজয়ী হিসেবে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বলা হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছে- **"দুহিতামে পণ্ডিতা জায়তে, সর্বম আয়ুঃ ইতি"** [বৃহদারণ্যক উপনিষদ - ৬।৪।১৭] - আমার বিদুষী কন্যা জন্ম লাভ করুক এবং সে পূর্ণায়ু হোক। সুতরাং আমরা সর্বদা নারীদের সন্মান করব এবং কখনো কন্যা ভ্রূণ হত্যা করব না, অন্যকেও কখনোই উৎসাহিত করব না এই ঘৃণ্য পাপে।

নেশা বা মদ্যপানর:-

হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে।। [ঋগ্বেদ ৮।২।১২]
বঙ্গানুবাদঃ মদ্যপায়ী হৃদয় খুলে মদ্য পান করে পরস্পর কলহ বিবাদ করে এবং সারারাত্রি প্রলাপ উক্তি করতে থাকে। তারা নিশ্চয়ই দুষ্ট বুদ্ধি।

দ্যূতক্রীড়া বা জুয়া খেলা :-

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ক স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোহন্যেষামস্তমুপ নক্তমোতি।।
[ঋগ্বেদ ১০।৩৪।১০]
জুয়ারির স্ত্রী হীনাবস্থায় পড়ে কষ্ট ভোগ করে, ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল জুয়ারির মাতা দুঃখ পায়। সে সদা ঋণগ্রস্ত হয়ে ভয়ে কাল কাটায়। ধনের আকাঙ্ক্ষায় সে রাত্রে অন্যের গৃহে উপস্থিত হয়।
অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্য মানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ।।
[ঋগ্বেদ ১০।৩৪।১৩]
হে জুয়াবাজ! জুয়া খেলো না! ভাল ভাবে কৃষিকার্য করো। নিজের যে ধন আছে, তাই প্রচুর মনে করে উপভোগ করো। তোমার স্ত্রী-পরিবার, তোমার গবাদিপশু তাদের দিকে দেখো, শ্রেষ্ঠ সবিতা পরমাত্মা আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়েছেন।

অস্পৃশ্যতা

গত কয়েকশত বছরে বেদজ্ঞানের অভাবকে কাজে লাগিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী, ধর্মব্যবসায়ী ও তথাকথিত জন্মগত ব্রাহ্মণ পরিচয়ধারী, যারা কিনা দস্যু থেকেও অধম, তারা তৈরি করেছিল অস্পৃশ্যতা নামক জঘন্য প্রথা। অপর বর্ণের রান্না করা খাবার খেতো না। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো দূরের কথা, অনেকেই একে অপরকে নিজেদের বানানো ছোট জাত বিবেচনা করে স্পর্শ ও করত না। অথচ পবিত্র বেদ বলেছে-
"সমানী প্রপা সহ বোহন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।" [অথর্ববেদ ৩।৩০।৬]
সরলার্থঃ তোমাদের পান একসঙ্গে হোক, ভোজনও একসঙ্গে হোক। তোমাদের এক সঙ্গে একই প্রেমবন্ধনে যুক্ত করেছি।
(১) প্রাচীনকালে **রাজসূয়াদি যজ্ঞে** চার বর্ণ একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসেই আহার করত। মহর্ষি আপস্তম্ব বলেছেন- **"আর্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ"** [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।২।৩।৪] বিদ্বানদের অধ্যক্ষতায় শূদ্রেরাই রন্ধন করবে।" তখন শূদ্র অর্থে নিরেট মূর্খ বুঝাত।
(২) মহর্ষি মনু নিজেও বিধান দিয়েছেন যে, শূদ্রগণ পরিচারক কর্মদ্বারা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হলে সুপকার কর্ম অর্থাৎ পাচকগিরি করে পরিবার প্রতিপালন করবে [১০।৯৯]।
(৩) মহর্ষি আপস্তম্ব নিজ ধর্মসূত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বর্ণনায় প্রশ্নোত্তর রূপে লিখেছেন- "কার অন্ন গ্রহণ করা যাবে?" কম্ব ঋষি উত্তর করলেন-"যে খাওয়াতে চায়।" কৌৎস ঋষি উত্তর করলেন- "যিনি পবিত্র শুদ্ধাচারী, তাঁর অন্ন খেতে হবে।" বার্যায়ণি ঋষি উত্তর করলেন- "যে কেউ দিলেই তার অন্ন খেতে হবে।" তখন আপস্তম্ব ঋষি বললেন- **"স্বধর্মে স্থির সর্ববর্ণের অন্নই গ্রহণ করা যায়।"** [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ৪।১।৬-১৯]

রাশি, হস্তরেখা ও ভাগ্যগণনা

আমাদের সমাজে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য রাশিফল, হস্তরেখা দেখা ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। রাশি বা হস্তরেখার সাথে সাথে ভাগ্যের কোনো সম্পর্কই নেই বা তাবিজকবচ, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, পাথর ও আংটির মাধ্যমে ভাগ্য পাল্টানো সম্ভব নয়।

[অথর্ববেদ ৭।৫০।৮] এ বলা আছে, **"আমার ডানহাতে কর্ম আর বামহাতে বিজয়**। এছাড়া
[ঋগ্বেদ ১০।৬০।১২] বলা হয়েছে- **"দুটো হাত দিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলো।"**
যোগেশ্বর **শ্রীকৃষ্ণ ও গীতায়** কর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন। অর্থাৎ, কর্ম আমাদের ফল নির্ধারণ করে, রাশি বা হস্তরেখা নয়। রাশি বর্তমান তারিখের মতো সময় নির্ধারণের একটি মাধ্যম। আর হস্তরেখা আঙ্গিক গঠন বা বৈশিষ্ট্য মাত্র। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, হাতের রেখা দিয়ে ভাগ্য বিচারের অপবিজ্ঞান না। ঈশ্বর কখনো রাশি বা হস্তরেখা অনুযায়ী একেকজনের ভাগ্য একেকরকম করে পক্ষপাতিত্ব করেন না। ফল তো আমাদের কর্মের ওপরেই নির্ভরশীল। আজও সমাজে কিছু লোক আছে যারা সহজসরল মানুষদের ঠকিয়ে ছলচাতুরি করে অর্থ আদায় করছে। এ বিষয়ে মনুস্মৃতি কী বলছে দেখে নেই-
উৎকোচ [ঘুষ গ্রহণ করে কাজ সম্পাদন করে দেবে বলে যারা আশ্বাস দেয়), **উপধিক** [ভয়ভীতি দেখিয়ে যারা প্রতারণা করে], **মঙ্গলাদেশবৃত্তি** [জ্যোতিষী যারা মঙ্গল বা অমঙ্গল ভবিষ্যৎবাণী করে জীবিকা নির্বাহ করে], **বঞ্চক** (যারা পরের সম্পদ/ধন প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করে, **ভণ্ড** [যারা ভেতরের পাপ গোপন করে বাইরে অন্যরূপ আচরণ করে], **ঈক্ষণিক** [যারা মানুষের হাতের রেখা দেখে শুভ অশুভ ফল নির্ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে] এই প্রকারের লোককে প্রকাশ্য প্রতারক বলে জানবে। [মনুস্মৃতি ১।২৫৮] আসুন সত্যকে জানি। কুসংস্কার মুক্ত হই।

নমস্কার

'নম' শব্দের অর্থ হল নত হওয়া বা শ্রদ্ধা/সম্মান প্রদর্শন করা যার সাথে **'তে'** ধাতুযুক্তহয় যার অর্থ তোমাকে অর্থাত **নমস্তে অর্থ হল তোমার প্রতি রইল শ্রদ্ধা**।
নমস্তে স্থায়তে নমো অস্ত্র পরায়তে।
নমস্তে রুদ্র তিষ্ঠতে আসীনাযোততে নমঃ।।
[অথর্ববেদ ১১.২.১৫]
অনুবাদ- হে রুদ্রদেব! আপনাকে আসতে, যেতে, উঠতে, বসতে সব স্থিতিতে আপনার প্রতি আমাদের নমস্কার।
নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ
নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধ্যায় চ।।
[যজুর্বেদ, অধ্যায় ১৬, মন্ত্র-৩২]
অর্থাৎ নমস্কার জ্যেষ্ঠদেরকে, নমস্কার কনিষ্ঠদেরকে, নমস্কার পূর্বজ ও অনুজদের। নমস্কার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ধনী-গরীব, জ্ঞানী, স্বল্পজ্ঞানী সকলকে।
বিভীষণও রামকে নমস্তে বলেছে।
নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতা মনোরম।
নমস্তে চণ্ড কোদণ্ড নমস্তে ভক্ত বৎসল।।
[অধ্যা০ রা. যু.কা. ৩|১৭]
গীতার **১১ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে** অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করে বলছেন-
'নমো নমস্তেইস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমহস্তে'।।
তোমাকে বার বার, হাজার বার নমস্কার করছি। পুনরায় তোমাকে নমস্কার করছি।

ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি

(ঈশ ঐশ্বর্যে) এই ধাতু থেকে ঈশ্বর শব্দ সিদ্ধ হয়। **য় ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যবান্ বর্ততে স ঈশ্বরঃ**। অর্থাৎ যাঁর সত্য, বিচারশীল, জ্ঞান এবং অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, সেই পরমাত্মার নাম **"ঈশ্বর"**।

ন দ্বিতীয় ন তৃতীয় শ্চতুর্থ নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তোমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টোমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেক বৃতং বেদ।।
[অথর্ববেদ ১৩/৪/২]

অর্থঃ পরমাত্মা এক, তিনি ছাড়া কেউ দ্বিতীয়, তৃতীয়। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলে অভিহিত হয় না।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় । বেদে সর্বত্র এই পরম সত্যটি পুনঃপুনঃ কথিত হয়েছে ।

" একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" [ঋ০ ১০।১১৪।৫]
= এক ঈশ্বরকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়

"য এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃপতির্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ" [ঋ০ ৬।৪৫।১৬]
= তোমাদের ঈশ্বরের স্তুতি ও প্রার্থনা করা উচিত, যিনি একাই সর্বজ্ঞ এবং সুষ্ঠুভাবে জানেন সকল জীবের কার্যক্রম। তিনিই এই মহাবিশ্বের কর্তা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই আমাদের নানা ধরনের ধনসম্পদ দান করেন।

সামবেদীয় **ছান্দোগ্য উপনিষদে** [৬।২।১-২] দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর একজনই এবং দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** = [ঈশ্বর] কেবল এক এবং অদ্বিতীয়।

ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে [ঋ০ ৭।৩২।২৩]
অর্থাৎ, হে ঈশ্বর! দিব্য শক্তিসম্পন্ন তোমার মতো আর কোনো সত্তা বা পদার্থ নেই। এমন কোনো সত্তা বা পদার্থ এই পৃথিবীতে কখনো জন্মগ্রহণ করে নি, আর কখনো জন্মগ্রহণ করবেও না।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব [ঋ০ ১০।১২১।১০]
অর্থাৎ সকল প্রজার বা মানবজাতির অধিপতি ঈশ্বর! তুমি ছাড়া আর কেউ না অর্থাৎ,একমাত্র তুমিই পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছ এই সমগ্র উৎপন্ন মহাবিশ্বকে।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্ব [যজু০ ৩২।১০]
অর্থাৎ, তিনি একাই অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর আমাদের নিকটতম মিত্র একমাত্র তিনিই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, ধারণকর্তা। মহাবিশ্বের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই তিনি অবগত আছেন।

মা চিদন্যদ্বি শংসত [সাম০ ২৪০]
ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু বা কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ, উপাসনা করে বিপর্যস্ত হয়ো না।

পবিত্র বেদে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ - অস্তিত্বমান,বুদ্ধিমান ও আনন্দময়।

সৎ (অস্তিত্বমান) [ঋ০ ১.১৬৪.৪৬, ১.৬৯.১,১০.৮৫.১ ; যজু০ ৩২.৯, অথর্ব ম০ ১০.৮.৬]

চিৎ (বুদ্ধিমান) [ঋ০ ৪.৩১.১, ৬.৪.৩,১.৭২.১ ; যজু০ ৩৬.৫, অথর্ব ম০ ১৮.৪.১৪]
আনন্দ (আনন্দময়) [ঋ০ ১০.১২১.১-১০, ৮.৪৩.১৪ , যজু০ ২২.১০, অথর্ব ম০ ২.১.৫, ৪.২.৪]
ঈশ্বর নিরাকার [ঋ০ ৪.১.১১, ৮.৬৯.১১ ৮.৭২.৩, ১.২৬.১৪ ; যজু০ ৩২.২-৪, ৪০.৮]
শুদ্ধ - পবিত্র [ঋ০ ৮.৯৫.৭-৮, ৯.৩৫.৬ ,৮.২৮.৫ , অথর্ব ম০ ১০.৮.৪০]
সর্ব জীবের পাপ পূণ্যের যথাযথ ফল দাতা [ঋ০ ১.৯৬.৭, ৬.১৫.১৩]
ন্যায়কারী [ঋ০ ১.৯০.৯, যজু০ ৩৬.৯, অথর্ব ম০ ১৯.৯.৬]
সদ বুদ্ধির ও গুনের প্রেরক [ঋ০ ১.৭৯.১০]
তাঁর কোন দূত নেই এবং তিনি সকল আত্মার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন ।
তিনি নিজেই সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা সকল কিছুর [ঋ০ ৯.৮৬.৩৮, যজু০ ৩১.২]
দুষ্টদের ও তাদের সকল কর্মকে তিনি জানেন [ঋ০ ১.৫১.৮] ,
ধর্মকার্য্যের অধ্যক্ষ [ঋ০১.১.৬],
দণ্ডদাতা [ঋ০ ১.৯৪.৯]

ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৩০ এ এই পরম সত্তা সম্পর্কে বলা রয়েছে-

সেই এক পরম সত্তা যিনি স্বার্থহীন, এই পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান এবং দেবগণেরও দেবতা, একমাত্র তিনিই আনন্দের উৎস। যারা তাকে অনুধাবন করে না, তারা দুঃখে নিমজ্জিত হয় এবং যারা তাকে অনুধাবন করে তারা শর্তহীন আনন্দ অনুধাবন করে।

ঋগ্বেদ ১/৫২/১৩ এ পরমাত্মা সম্পর্কে বলা রয়েছে -

পরমেশ্বর সকল পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ পরিমাপকারী ও পরিজ্ঞাত, সর্বশক্তিমান এবং নক্ষত্রযুক্ত দ্যুলোকেরও স্বামী। সমগ্র জগতকে পরমেশ্বর ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। তার সমতুল্য কেউ না ছিলো, না আছে, না হবে।

দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর

ক্লেশকর্মবিপাকশৈরপরামৃষ্ট: পুরুষবিশেষ ঈশ্বর:।। [যোগ ১।২৪]

অনুবাদ- অবিদ্যা ইত্যাদি পাঁচটি ক্লেশ, শুভ অশুভ এবং মিশ্রিত কর্ম, সুখ দুঃখ রুপী ফল, সুখ দুঃখ ভোগের সংস্কার, এই সকল হতে সম্বন্ধ রহিত এবং জীব হতে ভিন্ন স্বভাব যুক্ত চেতন বিশেষকে ঈশ্বর বলে।।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।। [যোগ ১।২৩]

অনুবাদ - ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি এবং সমাধি ফলের প্রাপ্তি অনেক শীঘ্র হয়।।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।। [যোগ ১।২৫]

অনুবাদ- ওই ঈশ্বরের কাছে অতিশয় সর্বজ্ঞতার বীজ রয়েছে।।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।। [যোগ ১।২৬]

অনুবাদ - সেই ঈশ্বর পূর্বে উৎপন্ন গুরুদেরও গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা, তার কারণ হলো কালের দ্বারা তিনি কখনো মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।। [যোগ ১।২৭]

অনুবাদ- ওতম্ ঈশ্বরের বোধক নাম।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।। [যোগ ১।২৮]

অনুবাদ - ওই ওতম্ শব্দের জপ এবং ওতম্ নামের নামী ঈশ্বরের ভাবনা অর্থাৎ তাঁর রক্ষণাদি গুণের চিন্তন করা উচিৎ।।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোऽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।। [যোগ ১।২৯]

অনুবাদ- ওই ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা ঈশ্বরের এবং জীবের সাক্ষাৎকার হয় এবং রোগ প্রভৃতি বিঘ্নের নাশ হয়।।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।। [সাংখ্য ১।৯২]

সূত্রার্থ- বাহ্যপ্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না, তাই যোগীদের আন্তরিক প্রত্যক্ষ অবশ্যই মানা উচিৎ।।

মুক্তবদ্ধয়োরণ্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধি।।

[সাংখ্য ১।৯৩]

সূত্রার্থ- বাহ্যপ্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে গেলে, বদ্ধ ও মুক্ত ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বার অস্তিত্ব না থাকায় ঈশ্বরের সিদ্ধ হয় না। কারণ ঈশ্বর মুক্ত বা বদ্ধ নন, ঈশ্বর সদামুক্ত।।

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।। [সাংখ্য ১।৯৪]

সূত্রার্থ- বদ্ধ বা জীবনমুক্ত ব্যক্তিকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিলে, সেই দুই ধরণের ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি আদি নির্মাণের যোগ্যতা সিদ্ধ হতে পারে না।।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মনিবৎ।। [সাংখ্য ১।৯৬]

সূত্রার্থ- প্রকৃতির সমীপতার কারণে ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হয়ে যান, যেমনভাবে লৌহখণ্ড চৌম্বকে অধিষ্ঠিত হন।।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ।।

[সাংখ্য ১।৯৮]

সূত্রার্থ- ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানদাতা হওয়ায় সৃষ্টির আদিতে তিনি জীবের অন্তঃকরণে বেদবাক্যের উপদেশ দিলেন।।

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্।। [১।১৬১]

অর্থ- জীবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ব্রহ্ম জীবের সকল কর্মের সাক্ষী।।

নিত্যমুক্তত্বম্।। [১।১৬২]

অর্থ- ঈশ্বর নিত্যমুক্ত।।

স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা।। [৩।৫৬]

অর্থ- প্রকৃতি যার বশে থাকে, তিনি নিশ্চিতরূপে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।।

ইদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।। [৩।৫৭]

অর্থ- উপর্যুক্ত গুণসমূহ ঈশ্বরের সত্ত্বাকে সিদ্ধ করে।।

ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতেফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণাৎসিদ্ধেঃ।। [৫।২]

অর্থ- ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে জীবের কর্মফলের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।।

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।। [৫।৪]

অর্থ- যদি ঈশ্বর বিনা কর্ম করেই জীবকে কর্মফল প্রদান করেন, তবে তিনি লৌকিক রাজার মত অপূর্ণকাম ও রাগযুক্ত হবেন।।

তদ্যোগেহপি ন নিত্যমুক্তিঃ।। [৫।৭]

অর্থ- ঈশ্বরকে রাগযুক্ত মানলে, তিনি নিত্যমুক্ত হবেন না। তাই ঈশ্বরের কোনো রাগ নেই।।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?

নিরাকার। কারণ, সাকার হলে তিনি ব্যাপক হতেন না। ব্যাপক না হলে সর্বজ্ঞাদি গুণও তাঁহাতে সম্ভব হতো না। কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ-কর্ম স্বভাবও পরিমিত এবং উহা শীতোষ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-দোষ ও ছেদন-ভেদনাদি বিহীন হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার হইলে তাঁর নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের নির্মাতা অপর কেউ থাকা উচিত। কারণ, যা সংযোগ হতে উৎপন্ন হয়, তার সংযোগকর্তা নিরাকার ও চেতন হওয়া অবশ্য উচিত। যদি কেহ বলেন

যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্বীয় শরীর নির্মাণ করেছেন, তাহলেও প্রমাণিত হচ্ছে যে , শরীর নির্মাণের পূর্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। অতএব পরমাত্মা কখনও শরীর ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি নিরাকার বলে সমগ্র জগৎকে সূক্ষ্ম কারণ হতে স্থূলাকাররূপে নির্মাণ করে থাকেন।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ যা জানো তা নয়। 'সর্বশক্তিমান' শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বীয় কর্ম অর্থাৎ সৃষ্টি- স্থিতি- প্রলয়াদি এবং সর্বজীবে পাপ পুণ্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে, কারো কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাঁর অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা নিজের যাবতীয় কর্ম পূর্ণ করে থাকেন।

কেন আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত ?

জীবনের প্রাথমিক সত্য হলো পরমসুখ বা মুক্তির সত্য। সত্যের অর্থ হলো যা অস্তিত্বমান তাকে অনুধাবন করা। তাই আমাদের উচিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, কারণ তিনি অস্তিত্বমান।

কেউ কখনো ঈশ্বর দেখেনি। তাহলে কিভাবে বলবো ঈশ্বর অস্তিত্বশীল ?

কেউ কখনো বিদ্যুৎ শক্তিকে দেখেনি, উত্তাপকে দেখেনি, এমনকি অতিপারমাণবিক অংশগুলোকে দেখেনি। কেউ কখনো ফোটন বা কোয়ার্ককে দেখেনি।কেউ কখনো আলোক তরঙ্গ, উত্তাপের বিকিরণ দেখেনি। তবুও আমরা কেন বলি তারা অস্তিত্বমান?

আমরা জানি ফোটন অস্তিত্বমান কারণ আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই যেটা ব্যাখ্যা করা যায় না। একইভাবে এটা বিদ্যুৎশক্তি, অতিপারমাণবিক অংশ, উত্তাপ ও আলোক তরঙ্গের বিষয়টিও এরকমই সত্য।

আমরা নির্বস্তক বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করি কারণ আমরা এর প্রভাবগুলোকে দেখতে পাই। চক্ষুগুলো হলো জগতকে অনুধাবন করার যথাযথ প্রায় (শতভাগ যথাযথ নয়) ইন্দ্রিয়। যা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাইনা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপও একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে ক্ষুদ্রাংশগুলো দেখতে পায় না। অন্যান্য অনুভুতির ব্যাপারেও যেমন শোনা, অনুভব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিষয়টা সত্য। এইভাবে পুরো আধুনিক বিজ্ঞান আমরা যা দেখি বা শুনি তার উপর ভিত্তি ধরেনা বরং ভিত্তি ধরে এর প্রভাবের মাধ্যমে আমরা কি অনুধাবন করতে পারি। এবং এটি (আধুনিক বিজ্ঞান) যা করে তা হলো এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে একটা বিশেষ মডেল সৃষ্টি করে।

ঈশ্বর কি দয়ালু না ন্যায় বিচারক?

ঈশ্বর দয়া ও ন্যায়বিচারের উপমা। কিন্তু এইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য। উদারতা মানে একজন অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া এবং ন্যায়বিচার মানে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান। উভয় বৈশিষ্ট্য কিভাবে একই সাথে বিদ্যমান হতে পারে?

দয়া এবং ন্যায়বিচার এক এবং একই কারণে উভয়েই একই উদ্দেশ্য সাধন করে।

দয়া করা অর্থ অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া বোঝায় না। কারণ যদি অপরাধীকে ক্ষমা করা দেয়া হয়, অনেক নির্দোষ মানুষ তার শিকার হয়ে যাবে। সুতরাং, যদি কোন অপরাধীকে বিচার না করা হয়, তবে একজন বিচারক নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষে দয়ালু হতে পারবেন না। এটা অপরাধীদের জন্য ন্যায়বিচারও হবে না কারণ তাতে সেই অপরাধী আরও অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে না।

ঈশ্বর কি তাঁর ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন না?

ঈশ্বর শুধুমাত্র ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করেন। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ উপাসক হওয়ার দ্বারা, আমাদের মন শুদ্ধ হয়, সেইজন্য, ভবিষ্যতে আমাদের দ্বারা কৃত পাপ কাজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। ঈশ্বর এই শুদ্ধি প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করেন। কিন্তু অতীতের পাপ কখনো ক্ষমা করা হয় না।

ঈশ্বরের কি কোন কিছুর আকাঙ্খা আছে?

ঈশ্বরের কোন ধরনের আকাঙ্খা নেই যেমনটা আত্মার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আত্মা সে সকল কিছুর জন্য আকাঙ্খা করে যা সে অর্জন করতে পারেনি। যাইহোক, তিনি আত্মাকে সুখ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংসের প্রেরণা যোগান । এটিকে ঈশ্বরের 'ইক্ষন' বা তার কর্মের উদ্দেশ্যপূর্ণতা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ঈশ্বর কোথায় বাস করেন ?

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান অতএব তিনি সব জায়গাতেই আছেন। যদি ঈশ্বর কোন একটা বিশেষ স্থানে যেমন কোন বিশেষ আকাশে অথবা কোন বিশেষ আসনে বাস করেন, তবে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল কিছু পরিচালনাকারী সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা হতে পারবেন না। আমরা কোন স্থানে উপস্থিত না থেকে সে স্থানের কর্মগুলো সম্পাদন করতে পারব না।

ঈশ্বর কি একস্থানে থেকে জগতকে পরিচালনা করছেন, না ঠিক যেমন সূর্য অনেক দূর থেক পৃথিবীকে আলোকিত করছে ?

ঈশ্বর একস্থানে থেকে জগতকে পরিচালনা করছেন ঠিক যেমন সূর্য অনেক দূর থেকে পৃথিবীকে আলোকিত করছে অথবা যেমন আমরা রিমোটের মাধ্যমে টিভিকে নিয়ন্ত্রন করি এগুলো ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি। কারণ সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে বা রিমোট কন্ট্রোল টিভিকে চালনা করতে পারে বিকিরন তরঙ্গের মাধ্যমে যেটা অন্তবর্তী মহাশূণ্যের মধ্যে ভ্রমন করতে পারে। শুধুমাত্র আমরা এটাকে দেখতে না পাওয়ায় আমরা রিমোট কন্ট্রোল বলি। বাস্তবে রিমোট কন্ট্রোলের মতন কিছু নেই। তাই, বাস্তবতাটি হলো ঈশ্বর পরিচালনা করতে পারেন, এর দ্বারা বোঝায় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন এটিকে পরিচালনা করতে।

এটা কি বোঝায় ঈশ্বর নোংরা জিনিস যেমন এলকোহল, প্রস্রাব ও মলমূত্রেও আছেন ?

সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। ঈশ্বর এই জিনিসগুলির বাইরেও আছেন, কিন্তু এই জিনিসগুলি ঈশ্বরের বাইরে বিদ্যমান নেই। অতএব, বিশ্বের সব কিছু ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

একটি মোটামুটি উপমা দিতে গেলে, আমরা ঈশ্বরের মধ্যে আছি ঠিক যেমনভাবে জলের একটি পাত্রের মধ্যে কাপড় একটি টুকরা থাকে। কাপড়ের ভেতরে, বাহিরে এবং সর্বত্র জল আছে । কাপড়ের এমন কোনও অংশ নেই যা শুকনো বা জল দিয়ে ভেজা নয়, তবে কাপড়ের পাশাপাশি জল কিন্তু বাইরেও আছে।

দেবতা

নিরু০ ৭।১৫ অনুযায়ী **দেবের লক্ষণ হচ্ছে দান**। সবার হিতার্থে যে দান করে, সে দেব। দেবের **গুণ** হচ্ছে দীপন অর্থাৎ প্রকাশ করা। সূর্য ,চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশ করে বলে তাদের দেব বলা হয়। দেবের **কর্ম** হচ্ছে **দ্যোতন** অর্থাৎ সত্যোপদেশ করা। অর্থাৎ যে মানুষ সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য উপদেশ দান করেন, তিনি দেব।

অথর্ব০ ১০।৭।২৩ অনুযায়ী, বেদে স্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে যে, দেব তেত্রিশ জন।

বৃহ০ উপ০ ৩।৯।২ অনুযায়ী , অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই কয় জন মিলে একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলে তেত্রিশ দেব।

বসু: [বৃহ০ উপ০ ৩।৯।৩] অনুযায়ী, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এই অষ্ট বসু। কারণ মহাবিশ্বের সকল পদার্থ এদের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই জন্য এদের নাম বসু।
রুদ্র: [বৃহ০ উপ০ ৩।৯।৪] অনুযায়ী, পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ উপপ্রাণ এই দশ এবং জীবাত্মা মিলে একাদশ রুদ্র। এই এগারো দেহান্তকালে রোদন করায়, বলে এদের রুদ্র বলা হয়। এগুলো হচ্ছে - পঞ্চ প্রাণঃ প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান, অপান। উপ প্রাণঃ নাগ, কুর্ম, কৃকল, দেব, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা।

প্রাণ-- যে বায়ু নাসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তাকে বলে প্রাণবায়ু।
অপান-- যে বায়ু মলাশয় দিয়ে মল নিষ্ক্রমণ করে, তাকে বলে অপান বায়ু।
সমান- যে বায়ু উদরে খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করে এবং কখনও কখনও শব্দ করে ঢেকুর তোলায় তাকে বলে সমান বায়ু।
উদান-- যে বায়ু কণ্ঠনালী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং যার অবরোধের ফলে শ্বাসরোধ হয়, তাকে বলে উদান বায়ু।
ব্যান-- যে বায়ু সমগ্র শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত, তাকে বলে ব্যান বায়ু।
এছাড়া আরও পাঁচ প্রকারের সুক্ষ্ম বায়ু আছে, তাহলো-
নাগ-- যা চক্ষু, মুখ ইত্যাদিকে বিস্তার করতে সাহায্য করে, তাকে বলে নাগ বায়ু।
কৃকল-- যে বায়ু ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাকে বলে কৃকল বায়ু।
কূর্ম-- যে বায়ু সংকোচনে সাহায্য করে, তাকে বলে কূর্ম বায়ু।
দেবদত্ত-- যে বায়ু হাই তোলার মাধ্যমে ক্লান্তি দূরীকরণে সাহায্য করে, তাকে বলে দেবদত্ত বায়ু।
ধনঞ্জয়- যে বায়ু পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে, তাকে বলে ধনঞ্জয় বায়ু।

আদিত্য: [বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৬] অনুযায়ী, দ্বাদশ আদিত্য হচ্ছে - চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্রপদ, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন
ইন্দ্র: [বৃহ০ উপ০ ৬।১] অনুযায়ী , বিদ্যুৎ হচ্ছে ইন্দ্র। কারণ তা ঐশ্বর্যের সাধন। বিদ্যুৎ হতে গতি শক্তি, প্রকাশ, সমৃদ্ধি এবং সুখের সাধন প্রাপ্তি হয়।
প্রজাপতি: [বৃহ০ উপ০ ৬।১।৬] অনুযায়ী, যজ্ঞ হচ্ছে প্রজাপতি। কারণ এর দ্বারা বর্ষা হয়, প্রাণিদের সুখ মেলে। গীতা ৩।১৪ মধ্যে বলা হয়েছে - প্রাণী অন্ন থেকে, অন্ন বৃষ্টি থেকে এবং বৃষ্টি যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে যজ্ঞ প্রাণীদের জীবন ও সুখের আধার।

ভগবান

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখে থাকি, যার অনেক ধন রয়েছে তাকে **"ধনবান"** বলা হয়, যার অনেক জ্ঞান রয়েছে তাকে **"জ্ঞানবান"** বলা হয়। তেমনি যার **"ভগ" অর্থাৎ ঐশ্বর্য** রয়েছে, ডাকে "ভগবান " বলা হয়। ঈশ্বরের গুণবাচক নাম ভগবানঃ- (ভজ সেবায়াম) এই ধাতু থেকে **"ভগ"** সিদ্ধ হয়, এর সাথে "**মতুপ্**" প্রত্যয় যোগে "**ভগবান**" শব্দটি সিদ্ধ হয়। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যযুক্ত অথবা ডজন্নের যোগা, এইজন্য **পরমেশ্বরের একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে "ভগবান"।**
যিনি শাস্ত্রবিদ তথা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী, সর্বদা বৈদিক ধর্মের আচরণকারী অর্থাৎ সদাচারী, অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসকারী যোগী এবং সর্বজীবে সমদর্শী-এইরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষকে অবশ্যই "ভগবান্" বলে সম্বোধন করা যাবে।

এরকম ঐশ্বর্যবান্ মানুষের অর্থাৎ ভগবানের গুণের সমাদর করা যাবে, তাঁদের গুণসমূহ গ্রহণ করা যাবে, কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে উপাসনা করা যাবেনা কারণ মানুষ ধী, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল, বৈরাগ্য প্রভৃতি "ভগ" অর্থাৎ ঐশ্বর্য অর্জন করতে পারে আর এর জন্য তাঁকে ভগবান বলা যাবে। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্ট্যাদি সমস্ত গুণ ও পূর্বোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে, তাঁকে কখনোই ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করা যাবে না।

উপনিষদাদি শ্রুতি ও মনুয়াদি স্মৃতি শাস্ত্রের বাক্যে, জ্ঞানৈশ্বর্যবান ঋষিদের ভগবান বলে সম্বোধন করতে দেখা গেলেও, বেদাদিশাস্ত্রের কোথাও তাঁদেরকে উপাস্য রূপে উপাসনা করতে দেখা যায় না।

এরকম ঐশ্বর্যবান্ মানুষের অর্থাৎ ভগবানের গুণের সমাদর করা যাবে, তাঁদের গুণসমূহ গ্রহণ করা যাবে, কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে উপাসনা করা উচিত না।

উপনিষদে বহু শ্লোকে শিষ্যগণ নিজেদের আচার্য ঋষিগণকে "ভগবান" বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন প্রশ্ন উপনিষদে পিপ্পলাদ ঋষিকে "ভগবান্" বলা হয়েছে। মনুসংহিতার শুরুতেই (১।১,২) রাজর্ষি মনুকে অন্যান্য ঋষিগণ "ভগবান্ মনু" বলে সম্বোধন করেছেন। আবার বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়, ঋষি "পরাশর" কে ভগবান ডেকেছেন।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কি ঈশ্বর?

আমরা সাধারণত দিব্য ঈশ্বরের আকার হিসাবে যা বিবেচনা করি (যেমন রাম ও কৃষ্ণের মতন ব্যাক্তিদের) তারা আসলে ঐশ্বরিক অনুপ্রাণিত ছিলেন। মনে করে দেখ; আমরা ঈশ্বর এর 'ভেতরের ডাক' সম্পর্কে বলেছিলাম। এই কিংবদন্তি পুরুষরা ছিলেন ঈশ্বর অনুরাগী এবং মনের বিশুদ্ধতার প্রতীক। তাই, সাধারণ মানুষের জন্য তারা স্বয়ং ভগবান ছিলেন ।

জীবাত্মা

একজন ব্যক্তি চোখে দেখেই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বিশাল বস্তুর অস্তিত্বকে সহজেই স্বীকার করে নেয়, এমনকি সে চোখ না দেখেও অনুমানের সাহায্যে নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদির মতো সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বও স্বীকার করা শুরু করে। কিন্তু আজকের বস্তুবাদী (বৈজ্ঞানিক) মানুষ সহজে মেনে নেয় না যে, এই দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা নামক একটি পদার্থ আছে, যেখানে দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা নামে একটি বস্তুও রয়েছে, একটি পদার্থ রয়েছে, যার কারণে মানুষ ও বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তুসমূহ দেখে- শুনে, খাওয়া- দাওয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

আত্মা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করেও তা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। যেমন মহর্ষি কপিল ব্যাখ্যা করেছেন-

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ

[সাংখ্যদর্শন ৬।২]

অর্থাৎ আত্মার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হওয়ার কারণে আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক ।

এই আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুর আকারের। এত সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও, এটি হাতির মতো দৈত্যাকার প্রাণী এবং পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহকেও পরিচালনা করে এবং দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও নিজেকে ধ্বংস করে না। বরং আপন কর্মানুসারে পুণ্য কর্মের পরিমাণ বেশি হলে সে মানুষের দেহ লাভ করে এবং পাপকর্ম বেশি হলে পশু- পাখি, পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির দেহ লাভ করে।

আসলে আত্মার তিনটি দেহ আছে। **১) কারণ শরীর , ২) সূক্ষ্ম শরীর, ৩) স্থূল শরীর**

এর মধ্যে -

১) কারণ-শরীর = প্রকৃতি যা সকলের জন্য সমান।

২) সূক্ষ্ম-শরীর = ৫ টি জ্ঞান ইন্দ্রিয়, ৫ টি কর্ম ইন্দ্রিয়, ৫ টি তন্মাত্র, ১ টি মন, ১ টি অহংকার এবং ১ টি বুদ্ধি এই ১৮ টি তত্ত্বকে সূক্ষ্ম দেহ বলে। যা বদ্ধ আত্মা সৃষ্টির শুরুতে লাভ করে এবং সৃষ্টির সময় মুক্তি থেকে ফিরে আসা আত্মাও সৃষ্টির মাঝখানে এটি লাভ করে । মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত বা প্রলয়াবস্থা পর্যন্ত এই কারণ-শরীর দেহের দেহান্তর পর্যন্ত আত্মার সাথে চলতে থাকে।

৩) স্থুল-শরীর = যা চোখ দিয়ে দেখা যায়।

এই তিনটি দেহের মধ্যে সকলের কারণ-শরীর একই, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন। জীবাত্মা এভাবে দেহ লাভ করেই (শরীর ধারণ করে) সাংসারিক সুখ- দুঃখ অনুভব করতে পারে, যে কোনো কাজ করতে পারে। দেহ ব্যতীত কোন বদ্ধ জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না । অর্থাৎ দেহ ব্যতীত আত্মা সাধন(চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি) হীন হওয়ার কারণে দেখতে, শুনতে ইত্যাদি পায় না। অকাল মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিচরণ করে, প্রতিশোধ নেয়, অন্য মানুষের ওপর অত্যাচার করে ইত্যাদি বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, একটি আত্মা দেহ ত্যাগ করার সাথে সাথে ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে, আরেকটি দেহ লাভ করার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে কোন মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে । একটি দেহ ত্যাগ করার পর এবং আরেকটি নতুন দেহে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সে স্থিতি বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর এবং নতুন দেহ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সে অচেতন অবস্থায় থাকে। তাই তার বিচরণ করা , শত্রুর প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি শুধুই কল্পনা মাত্র , বাস্তবতা নয়।

প্রকৃতপক্ষে, সকল জীবাত্মার মূল স্বরূপ ও স্বভাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাত্ত্বিকভাবে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, কেউ শিশু নয়, কেউ বৃদ্ধ নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কার ও কর্মের। আত্মার সংখ্যা অসীম, আমরা তাদের সংখ্যা গণনা করতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর তাদের সংখ্যা জানেন।

দর্শনে আত্মার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কণাদ মুনি বলেছেন-

প্রাণপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতিন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ

সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রয়অত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি। [বৈশেষিক দর্শন ৩।২।৪]

অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের চলন , চোখের পাপড়ি বন্ধ ও খোলা, খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ হয়, চিন্তাভাবনা, নড়াচড়া, ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে ব্যাধি হয়। টক তেঁতুলের নাম শুনলে যেমন মুখে জল আসে, তেমনি সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ, প্রচেষ্টা শরীরের অভ্যন্তরে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

একইভাবে মহর্ষি গৌতম বলেছেন-

"ইচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যত্মনো লিঙ্গম"। (ন্যায়দর্শন ১|১|৯০)

অর্থাৎ যে বস্তুর মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, আনন্দ, বেদনা এবং জ্ঞান রয়েছে তা হল আত্মার পূর্ণতা। এবং এই আত্মা চেতন শুদ্ধস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তা = বৃত্তি অনুসারে দেখে থাকে।

প্রকৃতি

প্রকৃতিও আত্মা এবং পরমাত্মার মতো একটি অস্তিত্বশীল পদার্থ । দড়িকে সাপ মনে করার মতো অথবা স্বপ্নের মতো কোন মিথ্যা কল্পনা নয় । বরং এটিও ঈশ্বর ও জীবাত্মার মতো অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তার নিজস্ব সত্তায় বিরাজ করছে। প্রকৃতি তার প্রকৃতরূপে সত্ত্ব, রজ এবং তমের ভারসাম্যে, এমনকি প্রলয় অবস্থায়ও অস্তিত্বশীলভাবে বিদ্যমান থাকবে। তবে এটি নিশ্চিত যে, সেই সময়ে প্রকৃতি থেকে আত্মার কোন লাভ-ক্ষতি হয় না। কিন্তু পরমাত্মা যখন প্রকৃতির বিকৃতি করে বা পরিবর্তন করে জগতে রূপান্তরিত করেন, তখনই আত্মারা এর থেকে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিলম্ ভুতেন্দ্রিয়ম্ ভোগাপবগার্থম্ দ্রষ্যম্ । [যোগদর্শন ২|১৯]

অর্থাৎ দৃশ্য বা প্রকৃতি হলো প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল এবং স্থিতিশীল স্বভাবযুক্ত আত্মার ভোগ এবং অপবর্গরূপী প্রয়োজন সিদ্ধকারী ।

প্রত্যেকের লক্ষ্য = ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রকৃতি হল সাধন, যা সকল সাধক আত্মাকে তাদের লক্ষ্য ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে দেয় । কিন্তু প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে তার নিজের সুখ থাকা সত্ত্বেও সে তার নিজের সুখ উপভোগ করতে পারে না এবং না কখনো দুঃখ অনুভব করে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি রচনা হয়েছে আত্মার জন্য।উট যেমন নিজে জাফরান উপভোগ না করে তা বহন করে, তেমনি প্রকৃতি নিজেই নিজের ভোগকারী না হয়ে অন্যের উপকারের জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ আত্মার ভোগের জন্য।

মহর্ষি কপিল যেমন এই কথা নিম্নলিখিত সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

প্রধানসৃষ্টিম পরার্থম স্বতোऽপ্যভোক্তৃত্বা - উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ [সাংখ্য ৩।৫৮]

একইভাবে অন্য একটি উদাহরণ দ্বারাও তা বোঝা যায়। পালংক বা বিছানা যেমন নিজে নিজেকে ব্যবহার করতে পারে না, তার থেকে উপকৃত হতে পারে না কিন্তু তার (বিছানা) থেকে ভিন্ন একজন মানুষ তাকে ব্যবহার করে। তেমনি তার অচেতন, দ্বন্দ্ব হওয়ার কারণে প্রকৃতিও নিজেকে ব্যবহার করতে পারেনা, মানুষই এর থেকে উপকৃত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আদি প্রকৃতিতে কোনো রূপ বা বর্ণ নেই। কিন্তু যখন তা ঈশ্বরের দ্বারা কর্মজগতে রূপান্তরিত হয় তখন তা বিভিন্ন রূপে ও বর্ণে সুশোভিত হয় এবং তার সত্ত্ব গুণের দ্বারা সুখ উৎপন্ন করে, রজো গুণের দ্বারা দুঃখ, চঞ্চলতা, গতিশীলতার সৃষ্টি করে ; তারপর তমো গুণের মাধ্যমে এটি মোহ, মূঢ়তা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে।

সৃষ্টির কারণ ৩ টি।

তিন কারণ তত্ত্বঃ এই জগতের প্রতিটি বস্তুর কারণ তিন প্রকার। নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ ও সাধারণ কারণ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সামনে একটি কলস আছে। কলসটির উপাদান কারণ হলো মাটি যার দ্বারা পাত্রটি তৈরি করা হয়েছে। নিমিত্ত কারণ হলো কুমার, যিনি কলসটি তৈরি করেছেন। সাধারণ কারণ হলো চাক ইত্যাদি, যার সাহায্যে কুমার কলসটি তৈরি করেছেন। ইংরেজিতে উপাদান কারণকে Material cause, নিমিত্ত কারণকে Efficient cause এবং সাধারণ কারণকে Formal cause বলা হয়। প্রশ্ন হলো, কলসের মতো সৃষ্টির এই তিনটি কারণ কী কী?

নিমিত্ত কারণ - ঈশ্বর

উপাদান কারণ- প্রকৃতি

সাধারণ কারণ - জীব

ত্রয় কেশিনঃ ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।

বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভিৰ্জিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্ ।।

[ঋ০ ১।১৬৪।৪৪]

সরলার্থঃ তিন প্রকাশময় পদার্থ নিয়মানুসারে বিবিধ কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে থেকে একটি বাসযোগ্য সংসারে, অথবা সৃষ্টিকালে বীজ বপন করে। একটি শক্তি, কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বকে দুই দিক থেকে দেখেন। একটির বেগ তো দেখা যায়, কিন্তু রূপ দেখা যায় না।

জীবের স্বরুপ:

অল্পজ্ঞঃ বেদে জীবকে অল্পজ্ঞ ও অজ্ঞানী বলা হয়েছে।

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীনপৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।

বি য়স্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য রুপে কিমপি স্বিদেকম্।।

[ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬]

ভাবার্থ- অবিদ্বান যেমন বিদ্বানদের সংসর্গ লাভে বিদ্বান হয়। তেমনি বিদ্বানেরা পরম বিদ্বানদের সংসর্গ লাভ করে স্বীয় বিদ্যার বৃদ্ধি করেন।।

তাই জীব মেধাবী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে।

মামদ্যমেধাবিনং কুরু।। [যজুর্বেদ ৩২/১৪]

অনুবাদ- আমার বুদ্ধি ও ধনকে সমৃদ্ধ করুন।।

তমসো মা জ্যোতির্গময় [বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮]

অনুবাদঃ অজ্ঞানরুপ অন্ধকার থেকে আমাকে জ্ঞানরুপ জ্যোতির দিকে নিয়ে যাও।

ভোক্তাঃ জীবাত্মা প্রকৃতির ভোক্তা। তাই জীব ঈশ্বরের কাছে ভোগ্যবস্তুর প্রার্থনা করছে :

ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।

অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ।।

[সামবেদ ৪১]

অনুবাদ - হে বাসস্থান প্রদানকারী পরমাত্মা! বিস্ময়কর গুণ-কর্ম-স্বভাবময়, পূজনীয় এবং অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দর্শনীয় তুমি আমাদের রক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের জন্য বিদ্যা, সুবর্ণ, চক্রবর্তী রাজ্য, মোক্ষ প্রভৃতি ধনকে প্রেরণ করো। তুমি এই দৃশ্যমান লৌকিক তথা পারমার্থিক ধনের অধিপতি। তাই আমাদের তথা আমাদের সন্তানদের শীঘ্রই সেই পূর্বোক্ত ধন প্রদান করো অর্থাৎ অপরিমিত

উপলব্ধিকে প্রাপ্ত করাও।।

আবাগমনযুক্তঃ জীবাত্মা চিরকাল একই শরীরে বিদ্যমান থাকে না। কর্মানুসারে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়।

'স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমাবিবেশ।।' [ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩২]

অনুবাদ - সেই জীবের মাতার যোনীতে পরিবেষ্টিত হয়ে বহুবার জন্ম নিয়ে দুঃখে নিমগ্ন হয়।।

বাসাংসি জীর্ণানি য়থা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

[গীতা ২।২২]

অনুবাদঃ মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।।

উপাসকঃ জীব ঈশ্বরের উপাসক। তাই বেদ, উপনিষদ তথা দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ আছে।

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।

নমো ভরন্ত এমসি।।

[সামবেদ ১৪]

অনুবাদঃ হে মোহরুপ রাত্রির নিবারণকারী প্রকাশময় পরমাত্মা! আমরা উপাসকেরা প্রত্যেকে জ্ঞানপ্রকাশের জন্য ধ্যান, বুদ্ধি এবং কর্মের মধ্যে নম্রতাকে ধারণ করে তোমার উপাসনা করি।।

'মা চিদন্যদ্বি শংসত' (সামবেদ ২৪২)

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুকে বা কাউকে উপাস্যরুপে গ্রহণ করো বিপর্যস্ত হয়ো না।।

অনাদিঃ

গীতা ১।২০ = আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। আত্মা অজ,নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন এবং শরীর নিহত হলেও আত্মাও মরে না।।

প্রকৃতিঃ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন পদার্থকে প্রকৃতি বলে।

কার্য্য-কারণ সম্পর্কঃ সৃষ্টিবিদ্যা বোঝার জন্য কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বোঝা উচিৎ। উদাহরণঃ কলস নির্মাণে মাটি ব্যবহৃত হয়। এখানে 'মাটি' হলো কারণ। আর কার্য্য হলো 'কলস'। তেমনি প্রকৃতি থেকেই আজকের এই জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতি(সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ) হলো সৃষ্টির কারণ, আর আজকের এই দৃশ্যমান জগত হলো কার্য্য।

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ।। [সাংখ্যদর্শন ১।১২৬]

অনুবাদ- কার্য ও কারণের মধ্যে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ও অচেতন আদি সাধর্ম্য দেখতে পাওয়া যায়।।

জগতের সৃষ্টি ও বিনাশঃ

যখন প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাকে কারণ প্রকৃতি বলে।

'সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ........' [সাংখ্যদর্শন **১**।৬**১**]।।

পরমেশ্বর এই যখন এই সাম্যাবস্থাকে ভেঙ্গে দেন তখন কারণ জগত গতিশীল হয়ে কার্য জগতে রুপ নেয়। আর এটিই হলো 'সৃষ্টি'।

আর বিনাশ মানে কি?

নাশঃ কারণলয়ঃ।। [সাংখ্যদর্শন **১**।১২**১**]

অনুবাদ- নাশ অর্থ কারণে লয় হওয়া।।

অর্থাৎ, কার্য জগত আবার যখন ঈশ্বরের নির্দেশে সাম্যাবস্থায় ফিরে যায়, তখন তাকে বিনাশ বলে।

প্রকৃতি অনাদি।

গীতা ১৩।১৯ ও বলা আছে, 'প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিও'।

ঈশ্বর প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেননি, বিকার ঘটিয়েছেন। আর এই বিকারকে আমরা বলছি 'সৃষ্টি'। আর সেই সৃষ্ঠ কার্য জগত যখন কারণ জগতে পরিণত হয়, তখন আমরা তাকে বলছি 'প্রলয়'। এভাবেই সৃষ্টিচক্র অব্যাহত থাকে।

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ত্। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।।

[ঋগ্বেদ ১০।১৯০।০৩]

অনুবাদঃ সর্ব জগতের ধারণকর্তা পরমাত্মা সূর্য ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় লোক ও জ্যোতিহীন লোককে এবং অন্তরিক্ষ লোক ও লোকলোকান্তরকে পূর্বকল্পের ন্যায়ই রচনা করিয়াছেন।

পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য

পরমাত্মা	জীবাত্মা	প্রকৃতি
১. **সর্বরক্ষকঃ** পরমাত্মা, জলচর,স্থলচর, উভচর, বৃক্ষ বনস্পতি ইত্যাদিকে বিবিধ প্রকার শক্তি প্রদান করে তথা সূর্য, বায়ু, জল, অগ্নি ইত্যাদি পদার্থ উৎপন্ন করে জীবকে রক্ষা করেন।	১. **সর্বরক্ষক নয়ঃ** সকল জীবকে রক্ষা করা তো দূরে থাক ঈশ্বর থেকে শক্তি, সামর্থ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাপ্ত করা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করারও সামর্থ্য নেই।	১. একইভাবে প্রকৃতিও সর্বরক্ষক নয়।
২. **সর্বব্যাপকঃ** পরমাত্মা জগতের প্রতিটি কোনে কোনে আকাশের সমান বিস্তৃত হয়ে আছেন। জগতের কোন বস্তু বা স্থান ঈশ্বর ছাড়া খালি নয় অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকল পদার্থের মধ্যে, প্রত্যেক	২. **একদেশীঃ** জীবাত্মা একই সময়ে এক স্থানে থাকতে পারে। একই সময়ে বহু স্থানে থাকতে পারে না।	২. প্রকৃতিও সর্বব্যপক নয়। কেননা, এই সৃষ্টির বাইরেও এমন স্থান আছে যেখানে না আছে প্রকৃতি, না আছে জীব। বরং ঈশ্বর আর ঈশ্বরই রয়েছেন।

জীবাত্মার মধ্যে সবসময় মিশ্রিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপক বলে তাঁকে **বিষ্ণু** বলা হয়।		
৩. **সর্বজ্ঞঃ** পরমাত্মা সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী। অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগতে বিদ্যমান সকল প্রকার বিদ্যা তিনি জানেন, জগতে এমন কোন বিদ্যা নেই যা পরমাত্মা জানেন না। বরং তিনি সেই সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞাতা। এজন্য বেদে ঈশ্বরকে **'কবি'** বলা হয়েছে।	৩. **অল্পজ্ঞঃ** কোন জীবাত্মারই জ্ঞান পরমাত্মার থেকে না অধিক হতে পারে, না পরমাত্মার তুল্য হতে পারে। বরং যতই জ্ঞান প্রাপ্ত করে করুক না কেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করুক না কেন সে কদাপিও সর্বজ্ঞ হতে পারে না।	৩. প্রকৃতি সর্বদা জ্ঞানশূন্য হয়।
৪. **সর্বাধার:** পশু-পাখি, নর-নারী, বৃক্ষ-বনস্পতি, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি সকল জড় ও চেতনের আধার হলো পরমাত্মা। যদিও সূর্যকে এসবের আধার বলা হয়। কিন্তু তিনি সূর্য ইত্যাদি প্রকাশকেরও প্রকাশক ও আধার। তাই তাঁকে **বিশ্বাধার** বলা হয়।	৪. জীবাত্মা কখনোই সর্বাধার হতে পারে না। না কখনো সবকিছুর আধার ছিলো এবং ভবিষ্যতেও কখনো সবকিছুর আধার হতে পারবে না।	৪. প্রকৃতিও সবকিছুর আধার নয়। প্রকৃতি স্বয়ং নিজেই ঈশ্বরের আধারের মধ্যে টিকে আছে।
৫. সর্বানন্দপ্রদ: পরমাত্মা জীবের জন্য তার নিজ নিজ কর্মানুসারে সুখ প্রদান করার ব্যবস্থা রাখেন অর্থাৎসকল জীবের জন্য খাবার, জল, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করে তার জন্য সুখ প্রদান করে থাকেন। অতএব তিনি জীবকেই আনন্দ প্রদান করে থাকেন বলে তাঁকে সর্বানন্দপ্রদ বলা হয়। তিনি মুক্তির মধ্যেও মুক্ত আত্মাকে তার মোক্ষ প্রদান করে থাকেন।	৫. জীবাত্মা কখনোই সর্ব আনন্দময় হতে পারে না। জীবাত্মা ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবকে আনন্দ প্রদান করার সামর্থ্য নেই।	৫. প্রকৃতিও সর্ব আনন্দময় নয়।
৬. **সর্বেশ্বর:** জগতে যত জড় ও চেতন পদার্থ রয়েছে তাদের সবার স্বামী হলেন ঈশ্বর তথা ঈশ্বর সবচেয়ে অধিক ঐশ্বর্যবান। কারণ, প্রকৃতপক্ষে জগতে বিদ্যমান যত স্বর্ণ, রূপা, হীরা, মতি, ধন-সম্পত্তি, মানুষ-পশু, বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, রাজ্য ইত্যাদি সব কিছুর একমাত্র অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর।	৬. কোন জীবাত্মা পৃথিবীতে উপলব্ধ সকল পদার্থের স্বামী বা প্রভু কখনো ছিলো না, না বর্তমানে হয়ে, না ভবিষ্যতেও হতে পারবে।	৬. প্রকৃতি কখনোই সর্বেশ্বর হতে পারে না। বরং ঈশ্বরই তার স্বামী।
৭.**সর্বহিতৈষী:** এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যতটি জীব রয়েছে ঈশ্বর প্রত্যেকের হিত কামনা করেন, কখনোই কোন জীবের অহিত কামনা করেন না। অতএব তিনি সর্ব হিতৈষী।	৭. জীবাত্মা সর্ব কল্যানকারী নয়। তার নিজের জ্ঞানের, অক্ষমতার কারণে সকল জীবের কল্যান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।	৭. প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে জীবের হিত-অহিত চাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই।

৮. **সর্বহিতকারী:** পরমাত্মা শুধু সর্ব হিতৈষীই নয় তিনি সর্ব হিতকারীও। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র সকল জীবের কল্যাণ করেন, কখনো একটি জীবাত্মারও অকল্যাণ করেন না। এই জন্যই তাকে **শিব** বলা হয়।	৮. জীবাত্মা সর্বহিতকারী নয়। নিজের অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ইত্যাদির কারণে প্রাণীমাত্রই কল্যাণ করা সম্ভব নয়।	৮. প্রকৃতি জড় হওয়ায় স্বয়ং নিজে কারো হিত বা অহিত করার সামর্থ্য নেই।
৯. **সর্বদ্রষ্টা:** জগতে যত জড়-চেতন, চর-অচর বস্তু রয়েছে পরমাত্মা চোখ ছাড়াই নিজ দর্শনশক্তি দিয়ে সবকিছুকেই যথাযথ দেখেন।	৯. জীবের দর্শনশক্তি সীমিত হওয়ায় নিজ চোখ দিয়ে জগতের সকল বস্তু দেখতে অক্ষম।	৯. প্রকৃতির কোন দর্শনশক্তি নেই।
১০. **সর্বশ্রোতা:** পরমাত্মা কান ছাড়াই আপন শ্রবণ শক্তি দিয়ে জগতের সকল জীবের কথা তথা জগতের সকল ধ্বনি শুনতে পান। এমনকি মৃদু থেকে মৃদু এবং তীব্র থেকে তীব্রতর ধ্বনিও তিনি শুনতে পান।	১০. জীবের মধ্যে এরকম শ্রবণশক্তি নেই। সে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায় এর বাইরে নয়।	১০. প্রকৃতির শ্রবণশক্তি নেই অর্থাৎ কোন প্রকার শব্দ বা ধ্বনি শোনার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই।
১১. **সর্বশক্তিমান:** কারোর সহায়তা ছাড়াই পরমাত্মা আপন কর্ম নিজেই দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেন অর্থাৎ তিনি সবচেয়ে অধিক বলবান।	১১. জীব স্বল্প শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর এবং প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া এক টুকরা ঘাসও ওঠাতে পারেন না।	১১. পরমেশ্বর প্রকৃতিকে যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যরূপে রূপান্তর করেন না প্রকৃতি ততক্ষণ শক্তিহীন থাকে।
১২. **সৃষ্টিকর্তা:** পরমাত্মা চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি লোক-লোকান্তর সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তথা হাত-পা ছাড়াই আপন জ্ঞানময় সামর্থ্য দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন। এইজন্যই তাঁকে **বিশ্বকর্মা** বলা হয়।	১২. জীবের মধ্যে সৃষ্টি রচনা করার সামর্থ্য নেই। জগতের সকল জীব মিলেও সৃষ্টি রচনা করতে পারবে না এবং মুক্ত আত্মার মধ্যেও এমন শক্তি নেই।	১২. প্রকৃতি, প্রলয় অবস্থা থেকে শুরু করে সৃষ্টি নির্মাণ অবস্থা পর্যন্ত স্বয়ং নিজে পরিবর্তিত হতে পারেনা।
১৩. **সর্বপরিচালনাকারী:** পরমাত্মা সমগ্র সংসার পরিচালনা করেন এবং সকল জীবকে পালন করেন।	১৩. জগৎ পরিচালনায় জীব কিঞ্চিৎ সামর্থ্যবানও নয়।	১৩. পরমেশ্বরের সহায়তা ছাড়া প্রকৃতি নিজে পরিচালিত হতে পারে না।
১৪. **সংহারকারী:** পরমাত্মা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন।	১৪. জীবের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করার বা প্রলয় করার সামর্থ্য নেই।	১৪. পরমেশ্বর এর সহায়তা ছাড়া সৃষ্টি প্রলয় অবস্থায়ও পৌঁছাতে পারেনা।
১৫.**সর্বান্তর্যামী:** পরামাত্মা সকলের ভিতরের কথাও জানেন। তথা সকলের ভিতরে বিরাজমান হয়ে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন।	১৫. জীব সকলের ভিতরের কথা জানতে অসমর্থ । এবং সকল জীবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।	১৫. প্রকৃতির মধ্যে না জীবের অভ্যন্তরের কথা জানার সমর্থ্য আছে, না বাহিরের কথা জানার সামর্থ্য আছে এবং সে নিজেকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

১৬. **সুখস্বরূপ**: পরমাত্মা সব দিক থেকেই ওতোপ্রোতো, সুখময় এবং সুখের সাগর। অর্থাৎ তিনি অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। ঈশ্বরের দ্বিতীয় কোন আনন্দ প্রাপ্ত করে নেওয়ার আবশ্যকতাই নেই। তিনি নিজেই সর্বদা নিজ আনন্দ দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন।	১৬. জীবাত্মা সুখস্বরূপ নয়। অর্থাৎ আত্মা নিজেই সুখ থেকে রহিত। সে প্রকৃতি থেকে সুখ প্রাপ্ত হয়ে কিছু সময়ের জন্য সুখের অনুভূতি করেন। অথবা ঈশ্বর থেকে সুখ প্রাপ্ত হয়ে সুখী হয়।	১৬. প্রকৃতির মধ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে।
১৭. **সর্ব গুণসম্পন্ন**: জগতে যত গুণ রয়েছে তার সবই ঈশ্বরের আছে।এমন কোন সদ্গুণ নেই যা ঈশ্বরের মধ্যে নেই। অর্থাৎ ঈশ্বর সকল সত্য গুণ দ্বারা সুশোভিত।	১৭. জীবাত্মা কখনোই সর্বগুণসম্পন্ন হতে পারে না। বেদ, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দয়াবান, বুদ্ধিমান, গুণবান হতে পারে কিন্তু সর্বগুণসম্পন্ন নয়।	১৭. প্রকৃতির মধ্যে এই গুণ নেই।
১৮. **স্তুতি করার যোগ্য:** পরমাত্মা মানুষের কাছে স্তুতি, উপাসনা, প্রসংশা করার যোগ্য এবং সকলের দ্বারা প্রসংশনীয়।	১৮. জীবাত্মা সবার কাছে স্তুতি যোগ্য ও প্রসংশার যোগ্য নয়।	১৮. প্রকৃতিকে জীবনের পরিচালনার জন্য প্রয়োগ করা হয়।
১৯. **সর্বশ্রেষ্ঠ:** সমগ্র বিশ্বে যত জীব-জন্তু, উত্তম-উত্তম পদার্থ রয়েছে সবার মধ্যে পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই কোথাও নেই।	১৯. জীবাত্মা কখনোই সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে না। যত গুণই অর্জন করুক না কেন ঈশ্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে কখনোই হতে পারে না।	১৯. প্রকৃতিও ঈশ্বরের চেয়ে নিকৃষ্ট হওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ নয়।
২০. **সর্বজনমান্য:** ঈশ্বর সব মানুষের জন্যই মান্য। অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হওয়ার যোগ্য।	২০. কোন জীবাত্মাই সবসময় সর্বজন মান্য হতে পারে না। কখনো উচ্চ কাজ করে যেমন সম্মানিত অনুভব করে , খারাপ কাজ করলেও অপমানিত অনুভব করতে হয়।	২০. প্রকৃতি মান অপমান রহিত।
২১. **সবার মাতা-পিতা:** এ জগতে যত জীবজন্তু রয়েছে সবার মাতা-পিতা হলেন ঈশ্বর। তিনি সবার উৎপন্নকারী, পালনকারী এবং রক্ষাকারী ।	২১. জীবাত্মা সকল জীবের মাতা পিতা কখনোই ছিল না, না আছে, ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।	২১. প্রকৃতি সাংসারিক পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের মতো সকল জীবের মাতা-পিতা নয়।
২২. **সবার রাজা:** সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত দেশ দেশান্তর রয়েছে সকল কিছুর রাজা হলেন পরমাত্মা। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম, কানুন, সংবিধান জগতের সকল দেশে বিরাজমান রয়েছে।	২২. কোন জীবাত্মা কখনোই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হতে পারে না। অতীতে কখনো ছিল না হবেও না। জীবাত্মা হল পরমাত্মার প্রজা।	২২. প্রকৃতি = সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের সাম্রাজ্য।
২৩. **সবার গুরু:** পরমাত্মা সংসারে প্রাণী মাত্রই তার জীবন নির্বাহ করার জন্য জ্ঞান দান করে থাকেন। তথা যত দেহধারী মানুষ রয়েছে তাদের সকলের গুরুরও পরমগুরু।	২৩. জীবাত্মা কখনোই প্রাণীর গুরু হতে পারে না।	২৩. প্রকৃতি জ্ঞানরহিত হওয়ায় স্বয়ং নিজে অন্য কাউকে উপদেশ করার বা গুরু হওয়ার সামর্থ্য নেই।

২৪. **সবসময় স্বতন্ত্র:** পরমাত্মা কখনো কারো অধীন হয় না। অর্থাৎ পূর্ণ স্বতন্ত্রতার সাথে নিজেই নিজের সমগ্র কাজ করে থাকেন।	২৪. জীবাত্মা কর্ম করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিন্তু ফল ভোগের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অধীন।	২৪. প্রকৃতিও পরমাত্মার অধীন।
২৫. **সদা সর্বদা জাগ্রত:** সৃষ্টিকাল হোক অথবা প্রলয়কাল হোক, দিন হোক অথবা রাত হোক পরমাত্মা সব সময় জাগ্রত থাকেন। তিনি ক্ষণিকের জন্যও না বিশ্রাম করেন না, আলস্য প্রমাদ করেন।	২৫. জীবাত্মা সব সময় জাগ্রত থাকেনা। অর্থাৎ নিদ্রায় রত এবং কখনো জেগে থাকে।	২৫. প্রকৃতি জড় হবার কারণে সে কখনো জাগ্রত অবস্থায় থাকে না সদা অজাগ্রত অবস্থায় থাকে।
২৬. **শান্তিময়:** পরমাত্মা সব সময় শান্ত থাকেন, কখনোই অশান্ত হন না। এবং তিনি নিজে শান্তির আবাস হওয়াই তাঁর উপাসকদেরও শান্তি প্রদান করে থাকেন।	২৬. জীবাত্মা সব সময় শান্ত থাকে না। অনেক প্রকার প্রতিকূলতা আসার কারণে অশান্ত, বিচলিত হয়ে পড়ে।	২৬. শান্ত-অশান্ত উভয়েই হয়। কিন্তু জড় হওয়ার জীবের মতো কখনো বিচলিত হয়না।
২৭. **সবার বন্ধু:** সংসারে যত জীব রয়েছে পরমাত্মা তাদের সবার বন্ধু। কারো সাথেই ঈশ্বরের শত্রুতা নেই। তিনি কাউকে নিজের শত্রুও মনে করেন না। ঈশ্বর তো সব সময় সকলকে নিজের বন্ধু হিসেবে দেখেন। তাই তাকে **বিশ্বামিত্র** বলা হয়।	২৭. জীবাত্মা সংসারে কারো সাথে বন্ধুত্ব রাখে, কারো সাথে শত্রুতাও রাখে অথবা যে তার হিত সাধন করে তাকে নিজের মিত্র এবং যে ক্ষতি করে তাকে নিজের শত্রু মনে করে।	২৭. প্রকৃতিতে শত্রুতা, মিত্রতা ইত্যাদি চেতন গুণ নেই।
২৮. **প্রকৃত বন্ধু:** একমাত্র ঈশ্বরই প্রাণীর প্রকৃত বন্ধু। তিনি কখনোই কারো সাথে দুষ্ট বা শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করেন না। কথা কখনো কারো সাথেই কপটতা করেন না। কারো সাথেই নিজের বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চান না।	২৮. জীবাত্মা নিজের বন্ধুর সাথেও কখনো কখনো দুষ্টতা বা শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করে থাকে, কপটতাও করে থাকে এবং সুযোগ পেলে বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বও ছেড়ে দিয়ে থাকে।	২৮. প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে কারো সাথে বন্ধুত্ব তৈরিও করে না ,কখনো কারো সাথে বন্ধুত্ব নষ্টও করে না।
২৯. **শোকহীন:** পরমাত্মা তিন কালে কোন পরিস্থিতিতেই শোকাগ্রস্ত হন না। তিনি সবসময় প্রসন্ন থাকেন এজন্য তাকে **অশোক** বলা হয়।	২৯. বিপরীত পরিস্থিতি এলে প্রায় সময় শোকাগ্রস্ত হয়ে যায়।	২৯. প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে সে শোকাগ্রস্ত হয় না
৩০. **রোগমুক্ত:** পরমাত্মা সবসময় সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ ঈশ্বর শরীরহীন এবং মন রহিত হওয়ার কারণে কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক রোগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অতএব তিনি **নিরাময়কারী।**	৩০. জীবাত্মা জগতে অনেক প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগে পীড়িত থাকে। তথা শরীর ধারণ করে সবসময় রোগমুক্ত থাকতে পারেনা ।	৩০. শরীরহীন হওয়ার কারণে জীবের সমান প্রকৃতি রোগযুক্ত হয় না।

৩১. **বিয়োগ রহিত**: পরমাত্মা কখনো কারো থেকে বিয়োগ হন না। অর্থাৎ কখনো কোন জীব থেকে পৃথক হন না। সব সময় সবার সাথে থাকেন। এমনকি প্রকৃতিও পরমেশ্বর থেকে দূরে যেতে পারে না। কেননা, যেখানে প্রকৃতি আছে সেখানে আগে থেকেই পরমেশ্বর বিরাজমান রয়েছেন।	৩১. জীবাত্মা সব সময় সবার সাথে থাকেন না। একটি জীবাত্মা নিজে ছাড়া অন্য জীবাত্মার সাথে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।	৩১. প্রকৃতির সাথে জীবের সংযোজন ও বিয়োজন হতে থাকে। অর্থাৎ বন্ধন অবস্থায় জীবাত্মা প্রকৃতির সাথে যুক্ত এবং মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে থাকে ।
৩২. **সদা শুদ্ধ:** জ্ঞান,কর্ম ও স্বরূপের দৃষ্টিতে পরমাত্মা সদা শুদ্ধ। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোন প্রকার মলিনতা বা অপবিত্রতা পরমেশ্বরের মধ্যে নেই। এজন্যই বেদে পরমেশ্বরকে **শুদ্ধ** বলা হয়েছে।	৩২. জীবাত্মা স্বরূপে শুদ্ধ কিন্তু জ্ঞান এবং কর্মের দৃষ্টিতে সবসময় শুদ্ধ থাকতে পারে না।	৩২. জগতে প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে অনেক প্রকার অশুদ্ধির উৎপত্তি হয়ে থাকে।
৩৩. **সম্পূর্ণ**: ঈশ্বরের কোন প্রকার ন্যূনতা বা কমতি নেই। জ্ঞান, আনন্দ এবং ঐশ্বর্যের দৃষ্টিতে তিনি সব সময় সম্পূর্ণ। তখন দৃষ্টিতে তিনি পরিপূর্ণ।	৩৩. জ্ঞান,বল এবং সামর্থ্যের দৃষ্টিতে অপূর্ণ। তথা অনেক প্রকার ন্যূনতা এবং কমতি যুক্ত।	৩৩. প্রকৃতিতেও ঈশ্বরের সমান পরিপূর্ণতা নেই
৩৪.**নির্লিপ্ত:** পরমাত্মা সাংসারিক সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ছল-কপটতা থেকে মুক্ত থাকেন।	৩৪. জীবাত্মা প্রায়ই সাংসারিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি, রাগ-দ্বেষ ,ছল-কপটতা ইত্যাদির শিকার হয়ে থাকে।	৩৪. প্রকৃতির জড় হওয়ার কারণে জীবের সমান সুখ-দুঃখের অনুভূতি লাভ করতে অসমর্থ। অতএব এর মধ্যে কোন রাগ-দ্বেষ, ছল-কপটতা নেই।
৩৫.**নিষ্কাম: পরমাত্মা** সবসময় সাংসারিক কামনা থেকে রহিত। রচনা করেছি, জীবের উপকার করেছি, অতএব এর পরিবর্তে জীবাত্মা আমার প্রশংসা করুক উপাসনা করুক। পরমেশ্বর এরকম সকাম ভাবনা থেকে রহিত। তথা সবসময় নিষ্কাম কর্ম করেন। এজন্য বেদে পরমেশ্বরকে **নিষ্কাম** বলা হয়েছে।	৩৫. জীবাত্মা সকাম ভাবনা সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম ভাবনা করে থাকেন। অর্থাৎ যখন সাংসারিক রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি অবিদ্যা যুক্ত থাকে তখন সকাম কর্ম এবং যখন বিবেক, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করে নেয় তখন নিষ্কাম কর্ম করতে থাকে।	৩৫. প্রকৃতি জ্ঞানপূর্বক কর্ম করতে অসমর্থ্।
৩৭. **নিশ্চিন্ত**: পরমাত্মা কখনো কোন প্রকার চিন্তা করেন না।	৩৭. জীবাত্মা অনেক প্রকার চিন্তা করে থাকে	৩৭. প্রকৃতির জীবের সমান ডর-ভয় নেই। কেননা, এটি জড়।
৩৮. **ন্যায়কারী**: পরমাত্মা সব সময় সবার সাথে ন্যায় করেন। তিনি কখনো কারো	৩৮. জীবাত্মা পূর্ণ ন্যায়কারী হতে পারে না। নিজের স্বার্থ, লোভ, দুরাগ্রহ,	৩৮. প্রকৃতির কারো প্রতি ন্যায় বা অন্যায় আচরণ করার সামর্থ্য নেই।

সাথে অন্যায় পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করেন না। অর্থাৎ যেমন কর্ম করে তেমন ফল প্রদান করেন। যে যতটুকু কর্ম করে ততটুকুই ফল প্রদান করে এর কম বা বেশি নয়।	অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে অন্যায় করে থাকে।	
৩৯. **নিষ্পাপ:** পরমাত্মা কারো সাথে অধর্ম, পাপকর্ম করেন না। তুমি সবসময় নিষ্পাপ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।	৩৯. জীবাত্মা নিজের ন্যূনতা এবং অবিদ্যার কারণে পাপ কর্ম করে থাকে।	৩৯. প্রকৃতি পাপ পুণ্য থেকে রহিত।
৪০. **নির্বিঘ্ন:** পরমাত্মা কোন প্রকারের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বাধা-বিপত্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না।	৪০. জীবাত্মা অনেক প্রকারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বাধা-বিপত্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।	৪০. প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে জীবাত্মা বাধা-বিপত্তি উৎপন্ন করে থাকে।
৪১. **তিনি দ্বন্দ্ব:** তিনি কখনো ঠান্ডা-গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-ক্ষতি ও সম্মান-অসম্মানের দ্বন্দ্বে ভুগেন না।	৪১. জীবাত্মা ঠান্ডা-গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-ক্ষতি ও সম্মান-অসম্মানের দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়।	৪১. প্রকৃতি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সম্মান-অসম্মানের দ্বন্দ্ব রহিত।
৪২.**নির্লোভ:** পরমাত্মা কখনোই লোভ-লালসা করেন না। তিনি নির্লোভ হয়ে উপাসকদেরও নির্লোভ করে তোলেন।	৪২.জীবাত্মা অনেক প্রকার লোভ-লালসা যুক্ত হয়ে থাকে।	৪২. প্রকৃতিতে জীবের মতো লোভ-লালসা নেই।
৪৩. **অশরীরী:** পরমাত্মা কখনোই শরীর ধারণ করেন না। অর্থাৎ তিনি কোন মাতৃগর্ভে জন্ম নেন না। ঈশ্বর স্থূল শরীর বিশিষ্ট নয়, সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্টও নয়। কারণ, তার শরীর নেই। পরমাত্মা এই তিন প্রকার শরীরবিশিষ্ট নয়। তাই বেদে পরমাত্মাকে **অকায়ম্** বলা হয়েছে ।	৪৩. জীবাত্মা শরীর ধারণ করে অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত নিজ কর্ম অনুসারে মানুষ ,পশু ,পাখি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করে থাকে ।	৪৩. মানুষ ইত্যাদি জীবের মতো প্রকৃতির শরীর নেই কিন্তু প্রকৃতি থেকে শরীর নির্মাণ হয়ে থাকে।
৪৪. **অনুপম:** ঈশ্বরকে উপমা দেওয়ার যোগ্য এমন কোন বস্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। কেননা, তার থেকে উত্তম কোন পদার্থ এই জগতে নেই। ঈশ্বরের জন্য যত উপমা রয়েছে তা সবই ছোট উপমা।	৪৪. জীবাত্মা অনুপম নয় কেননা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ গুণ, কর্ম ও স্বভাবযুক্ত পরমাত্মা এই জগতে বিদ্যমান রয়েছেন।	৪৪. প্রকৃতিও অনুপম নয়।
৪৫. **অপরাজিত:** কখনোই কারো থেকে পরাজিত হন না। জ্ঞান,ধন,বল,বুদ্ধি, সামর্থ্য সব প্রকারে তিনি অপরাজিত।	৪৫. জীবাত্মা তার নিজের থেকে অধিক বলবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও সমর্থ্যবান থেকে পরাজিত হয়।	৪৫. প্রকৃতিতে এই প্রকারের জয়-পরাজয় নেই।
৪৬। **স্নায়ুবিহীন:** পরমাত্মা কখনো স্নায়ু-নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এজন্য বেদে ঈশ্বরকে অস্নাবিরম্ বলা হয়েছে।	৪৬. জীবাত্মা স্নায়ু আদির বন্ধনযুক্ত ।	৪৬. প্রকৃতি স্নায়ু আদির বন্ধন থেকে রহিত কিন্তু স্নায়ু আদি স্থুল শরীর প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন।

৪৭.**মনীষী:** পরমাত্মা সমস্ত জীবের মনের অধিপতি তথা তিনি সবার মনে শক্তি দিয়ে থাকেন এবং সবার মানসিক ক্রিয়াকে তিনি জানেন।	৪৭. জীবাত্মা না সকলের মনের অধিপতি, না সকলের মানসিক ক্রিয়াকে সে জেনে থাকে।	৪৭.তিনকালে কখনোই প্রকৃতি কারোরই মনের কথা জানার সামর্থ্য নেই।
৪৮. **পূর্ণ ধৈর্যবান:** পরমাত্মা সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করে থাকেন। তার ওপর যতই মিথ্যা আরোপ লাগানো হোক না কেন তিনি কখনোই বিচলিত এবং অধীর হন না। অতএব বেদ মন্ত্রে ঈশ্বরকে **ধীর** বলে ডাকা হয়েছে।	৪৮. জীবাত্মা পূর্ণ ধৈর্যবান নয়। অপমানিত হলে দুঃখ, কষ্ট, রোগ বেড়ে গিয়ে বিচলিত ও অধীর হয়ে ওঠে এবং ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।	৪৮. প্রকৃতিতে জীবাত্মার মত অধৈর্যের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না।
৪৯. **অদ্বিতীয়:** তিনি এক অর্থাৎ পরমাত্মার সমান বা তার থেকে বড় দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই । অনেক ঈশ্বর নেই বরং ঈশ্বর নামক বস্তু এক তবে তার নাম অনেক হয়ে থাকে।	৪৯. জীবাত্মা এক নয় বরং অনেক হয়ে থাকে।	৪৯. একইভাবে প্রকৃতি সমূহের আকারে এক। তবে এর অনেক অংশ রয়েছে।
৫০. **সকলের সহায়:** এক ঈশ্বর, জলজ, স্থলজ, জলজ প্রভৃতি প্রাণীকে সর্বদা সাহায্য করেন এবং এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। পরমাত্মার সাহায্য নিয়েই শরীরধারী আত্মা খাওয়া- দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি কাজ করে। তাই একে সকলের **সাহায্যকারী** বলা হয়।	৫০. জীবাত্মা সবসময় সবার সহায়তা করতে পারেনা। সে ঈশ্বর থেকে শক্তি-সামর্থ্য প্রাপ্ত করা ছাড়া এক ক্ষণের জন্যও কোন জীবের সহায়তা করতে পারে না ।	৫০. প্রকৃতির নিজে কারো সহায়তা বা অসহায়তা করার সামর্থ্য নেই।
৫১. **সর্বদা দুঃখরহিত:** অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিন কালেই ঈশ্বরের দুঃখের স্পর্শ হয় না। তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ইত্যাদি সব প্রকারের আভ্যন্তর এবং বাহ্য দুঃখ থেকে সর্বদা রহিত।অতএব যে জরা ,ব্যাধি, রোগ, বিয়োগ ইত্যাদি দ্বারা দুঃখিত হয় সে ঈশ্বর হতে পারে না।	৫১. জীবাত্মা অধ্যাত্মিক = নিজের দোষে ভুগতে থাকে (আধিদৈবিক = বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, অধ্যাত্মিক = অন্যান্য জীবের দ্বারা সৃষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।	৫১. প্রকৃতির জড় হওয়ায় দুঃখ থেকে রহিত।
৫২. **পরম দয়ালু:** পরমাত্মা জীব মাত্রই তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন । তিনি কখনোই কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা বা নিষ্ঠুরতাপূর্ন ব্যবহার করেন না।	৫২. জীবাত্মা কারো প্রতি দয়াপরবশ আচরণ করে আবার কারো সাথে নিষ্ঠুর, নির্দয়, হিংসাপূর্ণ ইত্যাদি আচরণ করে থাকে।	৫২. প্রকৃতিতে জীবের মতো দয়া, নিষ্ঠুর, হিংসা ইত্যাদি মনোভাব নেই।

৫৩. **পরম শ্রদ্ধেয়:** পরমাত্মা মানুষের দ্বারা শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য অর্থাৎ তিনি স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব সবার জন্য সমান রূপে শ্রদ্ধার পাত্র।	৫৩. কোন জীবাত্মা সকল মানুষের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র হয় না। শুধু কিছু মানুষের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকে।	৫৩. প্রকৃতি ঈশ্বরের মতো শ্রদ্ধেয় হতে পারে না।
৫৪. **পরম প্রিয়:** ঈশ্বর সকল মানুষের প্রেমের পাত্র হওয়ার যোগ্য। ঈশ্বর যতটুকু প্রিয় হতে পারে ততটুকু প্রিয় অন্য কেউই হতে পারে না। অতএব ঈশ্বর সকলের প্রিয়তম।	৫৪. সকল জীবাত্মা সবার প্রিয় হয় না।কেউ কারো প্রিয় হলেও অন্য কারো অপ্রিয় হয়ে থাকে।	৫৪. প্রকৃতিরও পরম প্রিয় হওয়ার সামর্থ্য নেই।
৫৫. **পরম পূজ্য:** ঈশ্বর জগতে সব থেকে অধিক পূজনীয় তথা সকল বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য পূজনীয় ও প্রার্থনীয়।	৫৫. কোন জীবাত্মা সকল মানুষের জন্য পূজনীয় হয় না। একটি জীবাত্মা কোন ব্যক্তির জন্য পূজনীয় হলেও অন্য ব্যক্তির জন্য অপুজনীয় হতে পারে।	৫৫. প্রকৃতি কখনো পূজার যোগ্য নয়।
৫৬. **পাপ নাশক:** পরমাত্মা পতিতপাবন। যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, আজ্ঞা পালন করে ঈশ্বর তার পাপ নাশ করে থাকে (অর্থাৎ তার ভবিষ্যতের পাপ থেকে রক্ষাকারী)। পাপী ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করে ঈশ্বর তাকে পবিত্র করে এবং পূণ্যাত্মা বানায়।	৫৬. জীবাত্মা পাপ থেকে পুরোপুরি বাঁচাতে সমর্থ নয়। সে চাইলেও কাউকে পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত করতে পারে না, কাউকে সম্পূর্ণরূপে পুণ্যবান আত্মাতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না।	৫৬. একই প্রকারে জীবকে পাপ কর্ম থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য প্রকৃতির নেই।
৫৭. **পুরুহুত:** প্রাচীন মুনি-ঋষি, বিদ্বান থেকে শুরু করে আজ অব্দি সকল বিদ্বান পরমাত্মাকে ভক্তিভাব নিয়ে ডেকে থাকেন। এবং তিনি ভক্তের ডাক সব সময় শুনে থাকেন।	৫৭. কোন জীবাত্মাকে সকল মানুষ বা সকল বিদ্বান ভক্তিভাব নিয়ে ডাকেন না।	৫৭. প্রকৃতিতে জীবের ডাক শোনার সামর্থ্য নেই।
৫৮.**প্রাণদাতা:** তিনি সকল জীবের প্রাণদাতা সকলের প্রাণের আধার। অর্থাৎ তিনি প্রাণীর প্রাণ তথা সকল প্রাণীর রক্ষক।	৫৮. কোন জীবাত্মা সকল প্রাণের আধার হতে পারে না। এবং সে সবার প্রাণদাতাও নয়।	৫৮. প্রকৃতির নিজেই কারো প্রাণ রক্ষা করতে অক্ষম কেননা প্রকৃতি চেতনা(প্রাণ) রহিত।
৫৯. **সর্বপ্রসিদ্ধ:** ঈশ্বর সবচেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ তথা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ।	৫৯. কোন জীবাত্মা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হতে পারেনা তথা কোন জীবাত্মাই তিনকালে ঈশ্বরের সমান প্রসিদ্ধ হতে পারে না।	৫৯. প্রকৃতিও ঈশ্বরের সমান প্রসিদ্ধ হতে পারে না।
৬০.**হরি:** পরমাত্মা সকলের দুঃখ-কষ্ট, রোগ, চিন্তা, বাধা-বিঘ্ন হরণকারী। তাই বেদে তাঁকে **হরি** বলে সম্বোধন করা হয়েছে।	৬০. সকলের দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন হরণ করার সামর্থ্য নেই।	৬০. প্রকৃতিরও সকলের দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন হরণ করার সামর্থ্য নেই।

৬১.**বৈশ্বানর:** ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের নেতা নায়ক , তিনি সমগ্র বিশ্বের জড়-চেতন পদার্থকে গতি প্রদান করে অগ্রগামী করেন।	৬১. কোন জীবাত্মার সমগ্র বিশ্বের সকল জড় ও চেতন পদার্থকে গতি প্রদান করে অগ্রগামী করার সামর্থ্য নেই।	৬১. প্রকৃতিতে নিজের ইচ্ছায় স্বয়ং গতিপ্রাপ্ত হওয়ার সামর্থ্য নেই।
৬২. **বেদ জ্ঞান প্রদানকারী:** পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে আদিত্য, বায়ু ,অগ্নি এবং অঙ্গিরা এই চার ঋষির হৃদয়ে বেদ জ্ঞান প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ তিনিই বেদ জ্ঞান প্রকাশকারী।	৬২. কোন জীবাত্মার বেদ জ্ঞান রচনা করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ কোন ঋষি, মহর্ষি বা ব্রহ্মা ইত্যাদি বেদ এর রচয়িতা নন।	৬২. প্রকৃতিতে বেদ উৎপন্ন করার সামর্থ্য কখনোই থাকে না।
৬৩.**অবিদ্যা রহিত:** পরমাত্মা তিনকালেই কখনো অবিদ্যাগ্রস্ত হন না। এবং অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে কখনো জীবে পরিণত হন না।	৬৩. জীবাত্মা অবিদ্যা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এই বিদ্যার কারণেই পুনরায় শরীর ধারণ করে বলে তাকে **শরীরধারী** বলা হয়।	৬৩. প্রকৃতিও স্বয়ং আপনাআপনি অবিদ্যা রহিত।
৬৪.**অদিতি:** পরমাত্মা কখনো নিজের ব্রত, নিয়ম, কর্তব্য-কর্ম, তথা সত্য, ন্যায়, ধর্মের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত, পতিত, খন্ডিত হন না। এজন্য বেদে ঈশ্বরকে **অদিতি** নামে বর্ণনা করা হয়েছে।	৬৪. জীবাত্মা নিজের ব্রত, নিয়ম, কর্তব্য-কর্ম, তথা সত্য, ন্যায়, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত, পতিত, খন্ডিত হয়ে থাকে।	৬৪. প্রকৃতিতে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট নিয়মের লঙ্ঘন, ভঙ্গ করার সামর্থ্য নেই।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক:

১. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার মাতা-পিতা।	১. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার সন্তান।
২. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার স্বামী	২. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার সেবক।
৩. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার গুরু।	৩. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার শিষ্য।
৪. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার রাজা।	৪. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার প্রজা।
৫. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার উপাস্য।	৫. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার উপাসক।
৬. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার ভেতরে-বাইরে সবখানেই বিস্তৃত।	৬. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার অভ্যন্তরে রয়েছে।
৭. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার আধার।	৭. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার আধেয় (অর্থাৎ পরমাত্মার আধারে থাকেন।)
৮.পরমাত্মা সকল জীবাত্মার সাধ্য = প্রাপ্তি।	৮. সকল জীবাত্মা পরমাত্মার সাধক
৯. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার ন্যায়ধীশ।	৯. সকল জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে ন্যায় প্রাপ্ত হয়ে থাকে।
১০. পরমাত্মা সকল জীবাত্মার জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি প্রদাতা।	১০. জীবত্মা ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত শরীর-মন-বুদ্ধির প্রয়োগকারী।
১১. পরমাত্মা জন্ম প্রদাতা।	১১. জীবাত্মা জন্মগ্রহীতা।
১২. পরমাত্মা বরণীয়।	১২. জীবাত্মা বরণ কর্তা।

১৩. পরমাত্মা যজনীয়।	১৩. জীবাত্মা যাজক।
১৪. পরমাত্মা শরণ।	১৪. জীবাত্মা শরণাগত।
১৫. পরমাত্মা লক্ষ্য।	১৫. জীবাত্মা পথিক
১৬. পরমাত্মা স্তুতিযোগ্য।	১৬. জীবাত্মা স্তোত্রকারী।
১৭. পরমাত্মা দেব (পূজনীয়)।	১৭.জীবাত্মা পুজারী।
১৮. পরমাত্মা ভগবান।	১৮. জীবাত্মা ভক্ত।
১৯. পরমাত্মা সুখ-শান্তি প্রদাতা।	১৯. জীবাত্মা সুখ-শান্তি প্রাপ্তকারী।
২০. পরমাত্মা দণ্ড প্রদাতা।	২০. জীবাত্মা দণ্ডিত।
২১. পরমাত্মা পুরস্কার প্রদাতা।	২১. জীবাত্মা পুরস্কৃত।
২২. পরমাত্মা নিয়ন্ত্রক।	২২.জীবাত্মা নিয়ন্ত্রিত।
২৩. পরমাত্মা আনন্দ-মুক্তি প্রদাতা।	২৩. জীবাত্মা মুক্তিগ্রহীতা।
২৪. পরমাত্মা প্রেরক।	২৪. জীবাত্মা প্রেরিত।
২৫. পরমাত্মা ভোগ প্রদাতা।	২৫. জীবাত্মা ভোগ ভোগকারী
২৬. পরমাত্মা প্রার্থিত।	২৬. জীবাত্মা প্রার্থিতা।
২৭. পরমাত্মা রক্ষক।	২৭. জীবাত্মা রক্ষিত।
২৮. পরমাত্মা উপকারকারী।	২৮. জীবাত্মা উপকার প্রাপ্তকারী।
২৯. পরমাত্মা অনুগ্রহকারী।	২৯. জীবাত্মা অনুগৃহীত।
৩০. পরমাত্মা পুরোহিত।	৩০. জীবাত্মা যজমান।
৩১. পরমাত্মা ধ্যেয়।	৩১. জীবাত্মা ধ্যাতা।
৩২. পরমাত্মা জ্ঞেয়।	৩২. জীবাত্মা জ্ঞাতা।
৩৩. পরমাত্মা মন্তব্য ।	৩৩. জীবাত্মা মন্ত্রা।
৩৪. পরমাত্মার ধ্যান করতে হয়।	৩৪. জীবাত্মা ধ্যানে মগ্ন হয়।
৩৫. পরমাত্মা কমনীয়।	৩৫. জীবাত্মা কামনাকারী।
৩৬. পরমাত্মা জনক।	৩৬. জীবাত্মার জন্ম হয়।
৩৭. পরমাত্মা ধ্রুব।	৩৭. জীবাত্মা প্রবহমান ।

পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য

১. **সত্তাবানঃ** পরমাত্মা এক সত্তাবান পদার্থ, কোন মিথ্যা কল্পনা নয়। তিনি বাস্তবিকতায় পরিপূর্ণ, এবং অকাল্পনিক।	১. জীবাত্মাও এক সত্তাবান পদার্থ, কোন কাল্পনিক বস্তু নয়। কিন্তু এটি ঈশ্বরের অংশ নয় বরং ঈশ্বরের মতো আপন স্বতন্ত্র সত্তায় বিরাজ করে।
২.**অজন্মা:** পরমাত্মা কোন মাতার গর্ভ থেকে জন্ম নেন না, কারোর থেকে উৎপন্ন হন না।	২. জীবাত্মা অজন্মা কেননা , জীবাত্মার কখনো জন্ম হয় না , কখনো উৎপন্ন হয় না । উৎপত্তি হয় কেবল শরীরের, আত্মার নয়।

৩. **অজর**: পরমাত্মা কখনো বৃদ্ধ হন না তিনি সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকেন অর্থাৎ তিনি বাল্যাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা রহিত।	৩. স্বরূপের দিক থেকে জীবাত্মা কখনো বৃদ্ধ হয় না। বাল্যাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা ইত্যাদি শরীরের হয় ,আত্মার হয় না।
৪. **অমর**: পরমাত্মা অবিনাশী অর্থাৎ তার কখনো মৃত্যু বা বিনাশ হয় না বরং তিনি সদা বিদ্যমান নিত্য পদার্থ।	৪. আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। এটিও অবিনাশী, অমর, সতত বিদ্যমান নিত্য পদার্থ।
৫. **অনাদি অনন্ত**: সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরমাত্মার কখনো না শুরু হয়েছে, না কখনো শেষ হবে।	৫. কালের দৃষ্টিতেও জীবাত্মা অনাদি অনন্ত। এটিও সবসময় ছিল সবসময়ই থাকবে।
৬. **নির্বিকার**: পরমাত্মা হ্রাস-বৃদ্ধি, পচন-গলন, বিকৃত ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন না।	৬. স্বরুপের দিক থেকে জীবাত্মা কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি, পচন-গলন, বিকৃত ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।
৭. **চেতন**: পরমাত্মা এক জ্ঞান বান পদার্থ।	৭. জীবাত্মাও জ্ঞান বান পদার্থ।
৮. **অদৃশ্য**: চোখ দিয়ে পরমাত্মাকে কখনো দেখা যায় না। কেননা, পরমাত্মার কোন রূপ নেই।	৮. জীবাত্মাও অদৃশ্য ।তাকে কখনো চোখ দিয়ে দেখা যায় না।
৯. পরমাত্মার কোন সাধারণ অথবা উপাদান অথবা নিমিত্ত কারণ নেই।	৯. জীমাত্মারও কোন সাধারণ অথবা উপাদান অথবা নিমিত্ত কারণ নেই।
১০. **নিরাকার**: পরমাত্মার কোনো আকার নেই অর্থাৎ দেহের মতো তার কোন রূপ নেই।	১০. জীআত্মারও কোন রূপ নেই। এটাও ঈশ্বরের মতো নিরাকার।
১১.**বর্ণহীন**: ঈশ্বরের কোন রঙ নেই যেমন নীল, হলুদ, (লাল, সাদা ইত্যাদি) রং তার মধ্যে নেই।	১১. জীবাত্মা ঈশ্বরের মত বর্ণহীন।
১২. **ভরহীন**: পরমাত্মার কোন ভর নেই।	১২. জীবাত্মাও ভরহীন।
১৩. **রুদ্র**: পরমাত্মা দুষ্ট কে দন্ড দিয়ে রোদন করান। অতএব তাকে রুদ্র বলা হয়।	১৩. জীবাত্মাকেও রুদ্র বলা হয় কেননা শরীর ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনকে রোদন করিয়ে থাকে।
১৪. **অবয়বহীন**: ঈশ্বরের কোন অবয়ব নেই এবং তার কোন ভাগ, টুকরো বা কোন অংশ নেই।	১৪. জীবাত্মাও অবয়ব রহিত।
১৫. **সক্রিয়**: জীবদের কর্মের ফল এবং মোক্ষ প্রদানের জন্য যত দেশে এবং সময়ে এটি কাজ করা উপযুক্ত মনে করে, তত দেশ এবং সময়ে সৃষ্টি রচনা ইত্যাদি কাজ করে থাকেন।	১৫. জীবাত্মাও সক্রিয়। এটি জীবন নির্বাহের জন্য অনেক প্রকারের কাজ করে থাকে। তথা মুক্তিতেও ঈশ্বরের সহায়তায় সক্রিয় থাকে।
১৬. **পবিত্র**: পরমাত্মার গুণ ,কর্ম এবং স্বভাব সর্বদা পবিত্র । অতএব ঈশ্বর পূর্ণ পবিত্র।	১৬. জীবাত্মা ও স্বভাবের দিক থেকে পবিত্র। তথা পরমাত্মার স্তুতি করে যখন নৈকট্য লাভ করে তখন তার গুণ, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র হয়ে যায়।
১৭. **লিঙ্গ হীন**: ঈশ্বরের কোন লিঙ্গ নেই অর্থাৎ তিনি না পুরুষ, না স্ত্রী, না নপুংসক অর্থাৎ পরমেশ্বর এর মধ্যে কোনো দৈহিক বাহ্য লক্ষণ নেই।	১৭. জীবাত্মারও কোন লিঙ্গ নেই অর্থাৎ স্বরূপের দিক থেকে এটি না পুরুষ, না স্ত্রী, না নপুংসক অর্থাৎ পরমেশ্বর মতোই কোনো দৈহিক বাহ্য লক্ষণ নেই।

❖ **পরমেশ্বরর সুখ ও প্রকৃতির সুখের পার্থক্য:**

পরমেশ্বরের সুখ	**প্রকৃতির সুখ**

১.সর্বোত্তম: ঈশ্বরের সুখ সব থেকে উত্তম এবং উৎকৃষ্ট। যেরকম সুখ ঈশ্বর থেকে লাভ করা যায় কোন ব্যক্তি বস্তু বাসস্থান থেকে পাওয়া যায় না।	**১.** প্রকৃতির সুখ অনিত্য ,ক্ষণিক , শীঘ্র শেষ হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়।
২. নিত্য: ঈশ্বরের সুখ শাশ্বত স্থায়ী এবং একটানা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লাভ করা যায়।	২. প্রকৃতির সুখ তুচ্ছ হীন এবং খারাপ। অর্থাৎ যতটুকু বা যে প্রকারের সুখ ঈশ্বর থেকে লাভ করা যায় ততটুকু বা সেই প্রকারের সুখ প্রকৃতি থেকে লাভ করা যায় না।
৩.শান্তিদায়ক: ঈশ্বরের সুখ পূর্ণ শান্তি প্রদান করে থাকে।	**৩.** প্রকৃতির সুখ শেষে অশান্তি উৎপন্ন করে থাকে।
৪. তৃপ্তিদায়ক: ঈশ্বরের সুখ পরিপূর্ণ তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির প্রদান করে।	**৪.** প্রকৃতির সুখ অতৃপ্তিদায়ক অর্থাৎ এর থেকে যতই সুখ ভোগ করে থাকুক না কেন পূর্ণতৃপ্তি কখনোই লাভ হয় না।
৫.অনন্ত: ঈশ্বরের সুখের কোন অন্ত হয় না । অর্থাৎ এর কোন সীমা নেই, ঈশ্বর থেকে যতই সুখ ভোগ করা হোক না কেন তাঁর সুখের কোন কমতি হয় না।	**৫.** প্রকৃতির সুখ অল্প । কিছুক্ষণ পর তা শেষ হয়ে যায় তা শেষ হয়ে যায়।
৬. দুঃখ রহিত: ঈশ্বরের সুখের মধ্যে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরের সুখ অর্জন করার পর দুঃখের স্পর্শও হয় না।	**৬.** প্রকৃতির সুখে দুঃখ মিশ্রিত থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে সুখ ভোগের পর ব্যক্তি **পরিনাম দুঃখ , তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, গুণবৃত্তি বিরোধ দুঃখ** দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।
৭. সদা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়: দিন বা রাত হোক , সৃষ্টি বা প্রলয় হোক সর্বত্র সব সময় ঈশ্বরের সুখ বিরাজমান থাকে।	**৭.** প্রকৃতির সুখ সর্বত্র অনুভব করা যায় না। অর্থাৎ সৃষ্টিকাল বা প্রলয় কালে সদা-সর্বত্র কোন বদ্ধ জীবাত্মার প্রাকৃতিক সুখ লাভ হয় না।
৮. বাহ্যিক সম্পদের প্রয়োজন নেই : ঈশ্বরের সুখ স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, অন্ন-বস্ত্র , গাড়ি-বাড়ি, সোনা-রুপা, অর্থ-ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পদ ছাড়াই লাভ করা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি থেকেই এই সুখ লাভ করা যায়।	**৮.** প্রকৃতির সুখের জন্য বাহ্যিক সম্পদের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র, গাড়ি-বাড়ি, ধন- সম্পদ, অন্ন- বস্ত্র ইত্যাদি বাহ্যিক সম্পদ ছাড়া পাওয়া যায় না।
৯. আরোগ্য: ঈশ্বরের সুখ জীবাত্মাকে তার নিজের স্বরূপে এবং ঈশ্বরের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।	**৯.** প্রকৃতির সুখ অস্থির করে তোলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে তার নিজের স্বরূপ এবং ঈশ্বরের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
১০. বিবেক ,বৈরাগ্য ,সমাধিতে বাধাহীন: বিবেক, বৈরাগ্য এবং সমাধিতে ঈশ্বরের সুখ বাধা সৃষ্টিকারী নয়।	**১০.** প্রকৃতির সুখ বিবেক, বৈরাগ্য এবং সমাধিতে বাধা সৃষ্টিকারী।
১১. বুদ্ধিবর্ধক: ঈশ্বরের সুখ মন ও বুদ্ধিকে পবিত্র করে এবং বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে থাকে তথা সাত্বিক বুদ্ধি উৎপন্ন করে।	**১১.** প্রাকৃতিক সুখ মন এবং বুদ্ধিকে মলিন করে , তমোগুন এবং রজোগুণের সাথে যুক্ত করে মনকে তামসিক বা রাজসিক করে তোলে।

১২. ঈশ্বরের সুখ একজন ব্যক্তিকে স্বার্থপরতা, মিথ্যা, প্রতারণা, কপটতায় ভোগায় না।	**১২.** প্রকৃতির সুখ স্বার্থপর করে তোলে অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে স্বার্থপরতা, মিথ্যা, প্রতারণা, কপটতায় আক্রান্ত করতে পারে।
১৩. ভবসাগর অতিক্রম করায়: ঈশ্বরের সুখ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে সংসার সাগর থেকে মুক্তি প্রদান করে।	**১৩.** প্রকৃতির সুখ জীবাত্মাকে সংসার সাগরের বন্ধনে আবদ্ধ করে তথা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ করে।
১৪. পরমাত্মার সাথে মিত্রতা বাড়ায়: ঈশ্বরের সুখ পরমাত্মার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে তথা পরমাত্মার সাথে বন্ধুত্ব বাড়ায়।	**১৪.** প্রকৃতির অবিদ্যা যুক্ত ভোগ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা উৎপন্ন করে তথা প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করে।
১৫. বিশুদ্ধ: ঈশ্বরের সুখ সর্বদা বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ কর্ম, বিশুদ্ধ উপাসনার মাধ্যমে ; সত্য, ন্যায় ও ন্যায়ের পথে চলার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়।	**১৫.** প্রাকৃতিক সুখ ঐশ্বরিক সুখের মতো বিশুদ্ধ নয়। অন্যায়ের পথে হেঁটেও এটি দৈহিকরূপে অর্জন করা যায়।
১৬. পরিশেষেও সুখদায়ক: ঈশ্বরের সুখ শেষ পর্যন্ত আনন্দদায়ক, প্রসন্নতা এবং আনন্দ উৎপন্নকারী।	**১৬.** প্রাকৃতিক সুখ পরিশেষে বেদনাদায়ক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সুখ ভোগের সময় তা আনন্দদায়ক কিন্তু শেষে তা বেদনাদায়ক এবং যদি তা অজ্ঞতা ও অধর্মের মাধ্যমে ভোগ করা হয় তবে তা অনুতাপ, অপরাধবোধও সৃষ্টি করতে পারে।
১৭. সবসময় সবার অভীষ্ট: ঈশ্বরের সুখ দিন কালেই সকল বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানদের জন্য বাঞ্চনীয়।	১৭. যতক্ষণ অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ প্রাকৃতিক সুখ ভালো লাগে ।কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয় তখন ভালো লাগা দূর হয়ে যায়।
১৮. ঈশ্বরের সুখ কেউ কখনো চুরি বা ছিনতাই করতে পারে না।	১৮. প্রাকৃতিক সুখ চুরি বা ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।
১৯. ঈশ্বরীয় সুখের পথে কেউই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।	১৯. প্রাকৃতিক সুখের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা যায়।
২০. ঈশ্বরীয় সুখের রস থেকে যায়।	২০. প্রাকৃতিক সুখের রস ক্ষণস্থায়ী
২১. ঈশ্বরের সুখ ভোগ করতে করতে কখনো স্তরে ন্যূনতা আসে না।	২১. প্রাকৃতিক সুখের স্তরে ন্যূনতা আসে।
২২. ঈশ্বরীয় সুখ উপভোগ করতে গিয়ে কখনো একঘেয়েমি জাগে না, অরুচিও হয় না।	২২. প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করতে করতে একঘেয়েমি বা অরুচি এসে যায়।

আমরা কার উপাসনা করবো ও কেন করবো?

উপাসনা অর্থ কী?

উপাসনা অর্থ হলো ঈশ্বরের নিকটবর্তী বা সমীপস্থ হওয়া। অন্য কথায়, উপাসনা বলতে ঈশ্বরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে বোঝায় যাতে আমরা তার নির্দেশিত পথে জীবন চালনা করতে পারি। এভাবেই, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য এবং প্রমাণ সহিত তাঁকে উপলব্ধি করতে আমাদের যে সমস্ত কার্যক্রমগুলি প্রয়োজন এগুলোই 'উপাসনা'এর অন্তর্ভুক্ত।

উপাসনা কেন করবো?

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আমরা তো জানি কর্ম করলেই যদি ফল পাওয়া যায় আর ঈশ্বরও উত্তম ন্যায়কারী, কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন না যে কাউকে কর্মফলের বেশি বা কম দিবেন। তাহলে আমরা কর্ম ছাড়াও তার উপাসনা কেন করব?

এর উত্তরে একটি কারণ দেখালে তা হবে প্রেরণা লাভের জন্য।

উদাহরণ দিলে ভালো বোঝা যাবে। যেমন আমাদের উপাসনায় **শতায়ু মন্ত্রে** প্রার্থনা করা হয়েছে **"হে ঈশ্বর ! আমি যেন শত বছর জীবন ধারণ করতে পারি।"**

এই প্রার্থনা করেই কি আমরা শতায়ু লাভ করব?

না। কখনই নয়। এই মন্ত্রটি আমাদের শতায়ু লাভ করার প্রেরণা দিচ্ছে। আর শতায়ু কিভাবে লাভ করতে হবে সেটি **যজুর্বেদের ৪০.২** এ ঈশ্বর বলেছেন,

"কর্ম করতে থেকে শত বছর বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।"

আর সেই কর্ম কি? সে কর্ম হলো আমাদের দেহকে সুস্থ রাখতে সকল কর্ম করা যেমন আমাদের পরিবেশ সুস্থ রাখা, বায়ুমন্ডল শুদ্ধ রাখা যার জন্য আমাদের দৈনিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যার ঔষধি হবি সামগ্রি বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে তা দূষণমুক্ত করে; স্বাস্থ্যসম্মত সাত্ত্বিক আহার করা- যা হিংসারহিত পুষ্টিগুণসম্পন্ন মানবদেহের জন্য উপযুক্ত; শরীরচর্চা করা ও ব্রহ্মচর্য পালন করা। এসব কর্মের নির্দেশ বেদেই রয়েছে তাই ঈশ্বর নির্দেশিত এসব কর্ম করলেই শতায়ু অর্জন সম্ভব এবং এই কর্মগুলো করতে প্রেরণা প্রাপ্তের জন্যই শতায়ু মন্ত্র পাঠ করা হয়।

প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণ দিলে আমাদের পড়ার টেবিলে বিভিন্ন ধরণের অনুপ্রেরণা মূলক কথা লিখে রাখতে বলা হয়। যেমন কেউ লিখে "আমি ডাক্তার হতে চাই, আমি ডাক্তার হবো।" এসব মূলত তার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার লক্ষ্যে কর্ম করাতে। চান্স সে তার পড়ালেখার জন্যই পাবে কিন্তু অনুপ্রেরণা তাকে সেই পথে চালিত করছে, তাকে উদ্যমী করছে।

আরেকটি কারণ হিসেবে যদি 'উদ্দেশ্য' বলি তবে তা হলো ঈশ্বরের গুণ অর্জনের চেষ্টা।

যেমন অগ্নির নিকটবর্তী হওয়ামাত্র অগ্নির গুণ অর্থাৎ তাপ প্রাপ্ত হই ও শীত নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে তার সামীপ্য প্রাপ্ত হলে আমাদের সকল দোষ ও সকল দুঃখ দূর হয় এবং পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের ন্যায় জীবাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র হয়ে উঠে।

উদাহরণস্বরুপ উপাসনার দ্বারা আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের গুণ প্রাপ্ত হবো ফলে আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাবে যে আমাদের ত্রিতাপ দুঃখের ন্যায় পর্বতাকার দুঃখ উপস্থিত হলেও তাতে ব্যাকুল হবো না এবং সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে সমর্থ হবো।

এজন্যই উপাসনা প্রতিদিন করতে হবে। উপাসনা দ্বারা মনের মলিনতা দূর হয়, মন শুদ্ধ হয় কেননা ঈশ্বর নিজেই শুদ্ধস্বরূপ। দেহের প্রতিদিন শুদ্ধি যেমন প্রয়োজন, মনেরও তেমনই প্রয়োজন।

আমাদের দেহ ময়লা থাকলে যেমন শান্তি লাগে না একইভাবে মনেরও মলিনতা থাকলে কোনো কর্মেও মন বসবে না।

আমরা কার উপাসনা করবো?

উপাসনা শুধুই ঈশ্বরের সম্ভব। যিনি সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী, সর্বদাতা তার উপাসনাই আমাদের পরম গতি লাভ করাতে সক্ষম। তাই তো পবিত্র বেদে বলা হয়েছে-

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।

নমো ভরন্ত এমসি।।

[সামবেদ: ১৪]

সরলার্থ: হে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা! আমরা ধ্যানবৃত্তি তথা মন দ্বারা নমস্কারাদি সমর্পণের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে তোমার উপাসনা করি।

"মা চিদন্যদ্বি শংসত"[সামবেদ ২৪২]

অর্থাৎ, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু বা কাউকে উপাস্য রুপে গ্রহণ, উপাসনা করে বিপর্যস্ত হয়ো না।

হে মানব! কেবল সেই ঈশ্বরের উপাসনা কর যিনি এক ও অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। [ঋগ্বেদ ৬।৪৫।১৬]

আমরা তাঁরই উপাসনা করি যিনি এই সমস্ত জগত রচনা করেন, সমস্ত সৃষ্টির পূর্বেও যিনি বিদ্যমান ছিলেন।

[ঋগ্বেদ ৮|৯৬|৬]

বেদ বলে,

"আত্মনাত্মানমভি সং বিবেশ" [যজু০ ৩২।১১]

অর্থাৎ নিজেকে সর্বতোভাবে পরব্রহ্মে সমর্পণ করাই সত্যিকারের উপাসনা।

উপাসনা কেন সকাম কর্ম নয়?

আমরা জানি কর্মকে ২ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সকাম কর্ম - যা রাগ-দ্বেষ দ্বারা যুক্ত হয়ে করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে লোভ, বাসনা, চাহিদার উৎপন্ন হয়ে থাকে । এর লক্ষ্যই থাকে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নতি।

২. নিষ্কাম কর্ম - যেসব কর্ম রাগ-দ্বেষ রহিত; কোনো রূপ বাসনা, লোভ উৎপন্ন হয় না । এর লক্ষ্য থাকে সার্বিক উন্নতি।

শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মই করতে বলা হয়েছে কেননা তা মোক্ষাদায়ী।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।

[গীতা ৫।১২]

অর্থঃ নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্মফল ত্যাগ করে নিষ্ঠাযুক্ত পরম শান্তিকে প্রাপ্ত হন । তথা নিষ্কাম কর্ম না করা সকামী ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হয়ে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।

[গীতা ৩।১৯]

অর্থাৎ, সেজন্য তুমি সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করো। কেননা, অনাসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

কিন্তু আমরা যা করি, তা হলো বিভিন্ন পূজা করি এবং তার পেছনে থাকে আমাদের ভৌতিক সুখের লোভ ও কামনা যেমন A+ পাওয়া, ব্যবসায় উন্নতি, গাড়ি-বাড়ি নেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ মূলত আমরা সকাম কর্মতেই আবদ্ধ থাকছি।

কিন্তু উপাসনা করা হয় মোক্ষপ্রাপ্তির লক্ষ্যে। এখন এই লক্ষ্য অর্জনের কৃত সকল কর্মতেই হয় সার্বিক ও জাগতিক উন্নতি। কেননা মোক্ষের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ হল মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যা পরিবেশ থেকে সকল প্রাণীর উন্নতি সাধন করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক লাভে নিহিত থাকে না। তাই উপাসনা নিষ্কাম কর্ম হয়ে থাকে, সকাম নয়।

তাছাড়াও আমরা **গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকে** ও দেখতে পাই-

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

[গীতা ৩.৯]

অর্থ: যজ্ঞের ভাবনায় করা কর্ম ব্যতিত অন্য কর্ম এই জগতে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে, তাই হে অর্জুন! আসক্তিরহিত হয়ে যজ্ঞের ভাবনা দ্বারা নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করো।

এখানে **যজ্ঞের ভাবনায় কর্মকেই মোক্ষদায়ী বলা হয়েছে**। আর আমরা জানি পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম হল **ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ দ্বিসন্ধ্যা উপাসনা**। তাই **গীতাতেও উপাসনাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়েছে।**

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা শাস্ত্রীয় নিষ্কাম কর্ম বাদ দিয়ে শুধু সকাম কর্মই করে থাকি। বছরের নির্দিষ্ট কোনো অমুক পূজা অমুক ব্রত পালন করলে অমুক ফল লাভ হবে এই আশায় থাকি। অথচ বেদে ঈশ্বর পূজা বা উপাসনা প্রতিদিনই করতে বলা হয়েছে-

ইন্দ্রা য়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ||

[সামবেদ-১১৪৮ নং মন্ত্র]

ভাবার্থ- মনুষ্যদের উচিত স্ব পরিবারে প্রতিদিন পরমেশ্বরের উপাসনা করে আনন্দরস প্রাপ্ত করে দৈনিক কার্যতে প্রবৃত্ত হওয়া।

কেন শুধু বেদমন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা ?

অনেকের মনে এমন শঙ্কা থাকে যে আমরা কেন শুধু বেদমন্ত্রের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনা করবো? এর কারণ হলো মানবসৃষ্ট বচন ও শ্লোক সামান্য ও সাধারণ, কিন্তু বেদমন্ত্র স্বয়ং পরমব্রহ্মের বাণী হওয়ার কারণে মন্ত্রের আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। এখন দেখা যাক বেদমন্ত্রের মাধ্যমে উপাসনার বিধি বেদে কোথায় বর্ণিত।

যেহেতু সামবেদ উপাসনা কাণ্ড তাই সামবেদের বিভিন্ন মন্ত্রে বেদমন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করার বর্ণনা রয়েছে।

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। য়জিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা [সামবেদ ১২]

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা! দূত অর্থাৎ সদগুণসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য দূতের মতো আচরণকারী, আমাদের পূর্বজন্ম তথা এই জন্মে কৃত সব কর্মের জ্ঞাতা, কৃতকর্মের ফলদাতা, অমর, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ মহান সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনরূপ যজ্ঞের সঞ্চালক তোমাকে, বেদবাণীর মাধ্যমে আমি উত্তমরূপে সাধনা করছি।

অগ্নিমীডিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।

অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীতয়ে ছর্দিঃ।।

[সামবেদ ৪৯]

সরলার্থঃ হে বিবিধ গুণে সিক্ত স্তোতা! তুমি রক্ষা, প্রগতি, সর্বজনপ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভের জন্য সর্বত্র ব্যাপক জ্যোর্তিময় তেজস্বী পরমাত্মাকে মন্ত্রবাণী দ্বারা স্তুতি এবং আরাধনা করো। মহিমা বর্ণনকারী বেদাদি শাস্ত্র থেকে শ্রুত সেই পরমাত্মাকে তুমি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, সকল প্রকারের ধন প্রাপ্তির জন্য স্তুতি এবং আরাধনা করো। হে মানুষ! জগতের অগ্রনায়ক পরমাত্মা উত্তম কর্মকারী পুরুষার্থী জনের জন্য আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকেন।

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।

নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্।।

[সামবেদ ১৪৪]

সরলার্থঃ হে ভ্রাতাগণ! তোমরা মানবজাতির সম্রাট, নবীন বা স্তবযোগ্য, পথপ্রদর্শক, দুষ্টজনকে পরাজিতকারী, অতিশয় দাতা, বীর পরমাত্মাকে বেদবাণী দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিগান করো।

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত।।

[সামবেদ ১৯৮]

সরলার্থঃ মহান পরমেশ্বরকেই সামগানকারী উদ্গাতাগণ, সেই মহান পরমেশ্বরকে মন্ত্রপাঠী হোতাগণ বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুতি করেন এবং অন্যদের বাণীসমূহও সেই মহান পরমেশ্বরকে অধিকতরভাবে বন্দনা করে ॥৫॥

ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ।

গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।।

[সামবেদ ২০১]

সরলার্থঃ হে স্তুতিবাণী দ্বারা যাচনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা! নিজের দুগ্ধদানকারী বা নিজের দুগ্ধে তৃপ্তকারী গাভী যেমন বাছুরকে প্রাপ্ত হয়; তেমন ভাবে আমাদের দ্বারা উচ্চারিত বেদ বাণী অথবা স্তুতিবাণী প্রত্যেক জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা যজ্ঞে সার্থক ব্যবহারের দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হয়।

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।

সজোষা বৃষভং পতিম্।

[সামবেদ ২০৫]

সরলার্থঃ হে পূজনীয় জগদীশ্বর! আমি তোমার জন্য, তোমার স্তুতির জন্য বেদ বাণীসমূহ উচ্চারণ করছি। প্রীতিপূর্বক উচ্চারিত এই বেদবাণীসমূহ সমস্ত অভীষ্টের বর্ষণকারী পালনকর্তা তোমাকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বে ধাবিত হচ্ছে, উৎকণ্ঠা পূর্বক তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ।

ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ।।

[সামবেদ ২৩০]

সরলার্থঃ হে বেদবাণী দ্বারা ভজনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা! আমরা স্তোতাগণ নিশ্চয়ই তোমারই হয়ে থাকি অর্থাৎ সর্বদা তোমারই উপাসনা করি ও পবিত্র বেদবাণী অনুসরণপূর্বক জীবন পরিচালনা করি। হে আমাদের মৈত্রী রস গ্রহণকারী! তুমি আমাদের সর্বদা তৃপ্ত করো।

তমু অভি প্র গায়ত পুরুহুতং পুরুষ্টুতং।

ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত।।

[সামবেদ ৩৮২]

সরলার্থঃ হে মানবজাতি! সেই নানাভাবে অনেক কীর্তিগানকৃত, নানাভাবে আহ্বানকৃত জগদীশ্বরকে লক্ষ্য করে উত্তমভাবে স্তুতিগীত গাও। মহান সেই পরম ঐশ্বর্যবান জগৎপতিকে বেদবাণী দ্বারা আরাধনা করো।

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ।।

[সামবেদ ৪৪৫]

সরলার্থঃ উত্তম স্তোতা, অথবা উত্তম বিধিতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণকারী ঋত্বিক মানব অর্চনীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ অথবা শ্রুত সদা যুবা, যুবকের মতো অসীম বলশালী সেই পরমেশ্বর তাকে সহায়তা করেন।

উপাসনা কখন করবো?

সনাতনীদের মনে একটি প্রচলিত বিভ্রান্তি রয়েছে যে উপাসনা মূলত কয়বেলা করা উচিত? কেউ করে দ্বিসন্ধ্যা কেউবা ত্রিসন্ধ্যা। এমতাবস্থায় আমাদের গীতা শ্লোকদ্বয় স্মরণ করা উচিত:

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

[গীতা ১৬।২৩]

অর্থঃ যে মানুষ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না; পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।

[গীতা ১৬।২৪]

অর্থঃ সেইজন্য এই কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ হোক। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ জেনে এই সংসারে কর্ম করা উচিৎ।

শাস্ত্রে দ্বিসন্ধ্যারই বর্ণনা রয়েছে। কারণ সন্ধ্যা শব্দের অর্থ হলো সন্ধিস্থল।

প্রশ্নঃ কিসের সন্ধিস্থল?

উত্তরঃ সকাল ও রাতের।

'সন্ধ্যা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- **'সন্ধ্যায়ন্তি সন্ধ্যায়তে বা পরব্রহ্ম য়স্যাং সা সন্ধ্যা'** অর্থাৎ যার মাধ্যমে পরমেশ্বরের ধ্যান করা হয়, সেটিই মূলত **'সন্ধ্যা'**। এজন্য রাত এবং দিনের সংযোগকালে দুই সন্ধ্যাবেলায় [সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর] প্রত্যেক মানবেরই পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত। **প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মমুহূর্তের অর্ধাংশ থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সে হিসেবে বলা যায় যখন দিনরাত সমান তখন সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট আগে থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আর সায়াহ্নকালীন সন্ধ্যোপাসনার সময় সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট পর্যন্ত।** বেদে বলা হয়েছে-

"সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা। বসোর্বসোর্বসদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।।"

[অথর্ব০ ১৯।৫৫।৩]

অনুবাদঃ প্রতিনিয়ত **সায়াহ্নে** (দিনের শেষে) এবং **প্রাতঃকালে** (ভোরবেলায় ব্রাহ্মমুহূর্তে) আমাদের গৃহের রক্ষক তেজস্বী পরমেশ্বর! তুমি উত্তম চিত্ত, উত্তম সংকল্পযুক্ত মন এবং সুখের দাতা হও। তোমার অনন্ত গুণসমূহ প্রকাশিত করে, আমরা নিজেদের শরীরকে পুষ্ট করি।

মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে **১০১-১০২** নম্বর শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে-

"পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমর্কদর্শনাৎ।

পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ।।" ১০১।।

অনুবাদঃ প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্যোদয় দর্শন পর্যন্ত সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপ করতে করতে আসনে স্থিত হবে এবং সূর্যাস্তের পর যে পর্যন্ত নক্ষত্রগুলোর দর্শন না হয়ে, ততক্ষণ আসনে সমাসীন হয়ে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করবে।

"পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।

পশ্চিমাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্।।" ১০২।।

অনুবাদঃ প্রাতঃসন্ধ্যাকালে আসনে বসে গায়ত্রী জপ করলে রাত্রিকালীন মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ দূর হয় এবং আসনে সমাসীন হয়ে সায়ংসন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করলে দিনের বেলায় সঞ্চিত মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

প্রতিদিন দুই সময়ে সন্ধ্যোপাসনা করার মাধ্যমে পূর্ববেলায় সঞ্চিত দোষসমূহের উপর চিন্তন-মনন এবং পশ্চাত্তাপ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে না করার জন্য সংকল্প করা হয় তথা গায়ত্রী জপের দ্বারা নিজের সংস্কারকে শুদ্ধ-পবিত্র করা সম্ভব। সন্ধ্যোপাসনা মোট দশটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেই ধাপগুলো হল- **[১] আচমন, [২] ইন্দ্রিয় স্পর্শ, [৩] মার্জন, [৪] প্রাণায়াম, [৫] অঘমর্ষণ, [৬] মনসা পরিক্রমা, [৭] উপস্থান, [৮] গায়ত্রী পাঠ, [৯] সমর্পণ এবং [১০] নমস্কার।**

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য দ্বিসন্ধ্যা উপাসনা করতেন-

আমাদের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন দুইবেলা সন্ধ্যোপোসনা করতেন। মহাভারতে এর উল্লেখ রয়েছে, তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ, হোম, যজ্ঞ এইসবের মাধ্যমে বৈদিক নিয়মে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।

" তত উণ্থায় দাশার্হঃ স্নাতঃ প্রাঞ্জলিরচ্যুতঃ।

জপ্ত্ব গুহ্যং মহাবাহুরগ্নীনাশ্রিত্য তস্থিবান্।। "

[মহাভারতঃ শান্তিপর্ব, ৫৩।৭]

ভাবার্থ- অনন্তব মহাবাহু কৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া, স্নান করিয়া, হস্তযুগল সংযোজন - পূর্ব্ব বেদমাতা গায়ত্রী মহামন্ত্র জপ (প্রাতঃসন্ধ্যা) করিয়া,হোমাগ্নিব নিকটে যাইয়া, প্রাতঃকালীয় হোম করিবার জন্য অবস্থান করিলেন।।

"স ধ্যানপথমাবিশ্য সর্বজ্ঞানানি মাধবঃ।

অবলোক্য ততঃ পশ্চাদ্দধৌ ব্রহ্ম সনাতনম্।।"

[মহাভারতঃ শান্তিপর্ব, ৫৩।২]

ভাবার্থঃ---- তদনন্তর যাহাতে সমস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইভাবে ধ্যান অবলম্বন করিয়া, তিনি নাসিকার অগ্রদেশ দেখিতে থাকিয়া, সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিলেন।

ভাগবতেও আমরা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও গায়ত্রী উপের উল্লেখ পেয়ে থাকি:

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।

গর্গাদ্ যদুকুলাচার্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ।।

[ভাগবত ১০।৪৫।২৯]

অর্থঃ এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যদুকুলাচার্য গর্গের নিকট উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে দ্বিজত্বে উপনিত হলেন এবং গায়ত্রী ধারণ ধারণপূর্বক ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হলেন

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।

চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্‌যতঃ।।

[ভাগবত ১০।৭০।৬]

অর্থঃ অতঃপর তিনি বিধি অনুসারে নির্মল ও পবিত্র জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করে যথাবিদি নিত্যকর্ম সন্ধ্যা বন্দনা করেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ করতে বসেন ও মৌন হয়ে গায়ত্রী জপ করেন।

ব্রাহ্মে মুহুর্ত্তে উথ্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ।

দধৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্।।

[ভাগবত ১০/৭০/৪]

অর্থঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃ কৃত্যাদি সম্পন্ন করে প্রসন্ন চিত্তে তমোগুণ হতে দূরে থেকে ঈশ্বর উপাসনা করতেন।

একং স্বয়ং জ্যোতিরনন্যমব্যয়ং স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।

ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভির্লক্ষিত ভাবনির্বৃতিম্।।

[ভাগবত ১০।৭০।৫]

অর্থঃ যিনি এক এবং জ্যোতি স্বরূপ, অনন্ত, অব্যয় অর্থাৎ একরূপ বা একরসে বিদ্যমান এবং সর্বত্র নিজ অবস্থান হেতু নিয়ত অন্যায় কার্য দূর করেন এবং যাকে ব্রহ্ম বলা হয়, যিনি এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করার সামর্থ্য যুক্ত, কৃষ্ণ তাঁরই উপাসনা করতেন।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভাগবতের রেফারেন্সসমূহ দুর্জনসন্তোষ ন্যায়ের জন্য ব্যবহার করে দেয়া হয়েছে।]

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য বৈদিক উপাসনা-

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ও মাতা সীতাকে রামায়ণের বেশকিছু স্থানে উপাসনা করতে দেখা গিয়েছে।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।

অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে।।

[বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৩।১]

অর্থ- অতঃপর রজনী প্রভাত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শায়িত কাকুৎস্থ কুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে

উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্।

[বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৩।২]

অর্থ- হে রাম! তোমাকে জন্ম দিয়ে কৌশল্যা সুপুত্রের জননী বলে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। হে নরশার্দূল! এখন প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত । অতএব ওঠো, এখনই তোমাকে পূজাহ্নিক করতে হবে।

" তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ।

স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্।।"

[বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৩।৩]

অর্থ- মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরম উদার কথা শুনে নরশ্রেষ্ঠ বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণ স্নান করে জল দ্বারা দেবতর্পণাদি ক্রিয়া করে সমাপনান্তে শ্রেষ্ট জপমন্ত্র গায়ত্রী জপ (জপযজ্ঞ) করলেন।।

মাতা সীতার বৈদিক উপাসনা-

"সন্ধ্যায়কালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।

নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী।।"

[বাল্মীকি রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ১৪।৪৯]

অর্থ-হনুমান সীতা সম্বন্ধে চিন্তা করে মনস্থ করে যে, সীতাদেবী সন্ধ্যা উপাসনায় সদাই আগ্রহী। এখন সন্ধ্যোপসনার সময় উপস্থিত। নিশ্চয় পবিত্রোদক এই নদীতে সান্ধ্য-উপাসনার জন্য তিনি আসবেন।

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।

সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ।।১।।

প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবৎ ততঃ।

মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে।।২।।

[বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৬।১-২]

অর্থ- যখন পুরোহিত বশিষ্ঠজী চলে গেলেন তখন বিশালনেত্র সীতা সহিত রামচন্দ্র স্নান করে মনকে নিয়ত করে নারায়ণ (পরমাত্মার) উপাসনায় প্রবৃত্ত করলেন। প্রথম হবি = হবন সামগ্রী বিধিবৎ প্রস্তুত করে তার প্রতিষ্ঠা করে পরমপিতা পরমাত্মার নিমিত্তে প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

উপাসনা পুজা ও প্রার্থনার পার্থক্য কী ?

উপাসনা - ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে ঈশ্বরের আনন্দকে নিজ আত্মায় অনুভব করা। উপাসনা কেবল পরমাত্মার হয়। অন্য কারোর নয়। কারণ বেদে ঈশ্বরকেই একমাত্র উপাস্যরুপে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

পুজা - কারো প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ঈশ্বর, মা, বাবা, গুরুজন সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রার্থনা- অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য সাহায্য চাওয়া। মোক্ষের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অথবা কোনো বস্তু প্রাপ্তির জন্য কারো নিকট প্রার্থনা।

স্তুতি - প্রশংসা করা।

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কী ?

উপাসনার মন্ত্রসমূহের অর্থপূর্বক চিন্তন করলে সদ্ গুণসমূহ বিকশিত হয়। বেদমন্ত্রের পঠনপূর্বক উপাসনা করলে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জানা যায়। এবং সেই স্বরূপের ধ্যান করলে মন প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, মনে ঐশ্বরিক বল ও প্রেরণার সঞ্চার হয়। ঈশ্বরের প্রেরণা আমাদেরকে কর্মে উদ্যোমী করে তোলে, হতাশা দূর করে।

তাড়াহুড়ো করে কি উপাসনা হয় ?

ভগবান বেদে আমাদের দ্বিসন্ধ্যা উপাসনা করার বিধান করেছেন । আমাদের নৈমিত্তিক জীবনে অনেকেই উপাসনা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে করি । উপাসনার মনসা পরিক্রমা যে সর্বত্রই ভগবানের প্রকাশ এই তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি না । প্রাণায়ামের সময় আমাদের অন্নময়, জ্ঞানময় ও প্রাণময় কোষের স্ফূরণের দিকে লক্ষ্য রাখি না।

প্রশ্ন হতে পারে উপাসনা কি কেবল তাহলে করতে হয় বলে আমরা করি? ভগবান বেদে কিভাবে উপাসনা করতে বলেছেন? আসুন ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ১ম সূক্তের ১৪শ মন্ত্র থেকে জেনে নেই -

অমন্মহীদনাশবাচনুগাসশ্চ বৃত্রহন্ ।

সকৃৎসু ত মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ॥

[ঋগ্বেদ ৮।১।১৪]

অর্থাৎ - (বৃত্রহন্) হে অজ্ঞাননিবারক সকলবিঘ্নবিনাশক দেব ! তোমার উপাসনার সময়ে যেন (অনাশবঃ) আমরা ব্যতিব্যস্ত না হই । (চ) এবং (অনুগ্রাসঃ) উগ্র না হয়ে অর্থাৎ হিংস্রতারহিত স্থিরচিত্তযুক্ত হয়ে তোমার (অমন্মহি+ইৎ) স্তুতিই যেন করি অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে শনৈঃ শনৈঃ শান্তচিত্তে তোমার স্তুতি করবো, এমন শক্তি প্রদান করো । (শূর) হে শূর !

মহাপ্রতাপশালী দেব (মহতা+রাধসা) মহতী উপাসনা দ্বারা (সকৃৎ) বছরে একবার হলেও (সু) উত্তমভাবে (তে) তোমার (স্তোমম্+অনু) স্তুতি করে আমরা (মুদীমহি) আনন্দিত হবো ॥

তাৎপর্য - আমরা যেন বিক্ষিপ্তচিত্তে কিংবা উপাসনা করতে হয় তাই করি এজন্য তাড়াহুড়ো করে কখনো উপাসনা না করি। পাশাপাশি এখানে একবার হলেও স্তুতি করার তাৎপর্য হলো যেন আমরা কখনোই উপাসনা থেকে সদা বিচ্যুত না হই।

প্রাণায়াম কি?

প্রাণা + য়াম = প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসকে 'প্রাণা' বলে। 'য়াম' শব্দের অর্থ বিস্তার। জোরপূর্বক শ্বাস প্রশ্বাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোকে বলে প্রাণায়াম। এটি অষ্টাঙ্গযোগের চতুর্থ ধাপ।

প্রাণায়ামের উপকারিতা

দৈনিক কমপক্ষে ১০ মিনিট প্রাণায়াম করলে-

(১) ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়

(২) মন একাগ্র হয়

(৩) মনকে প্রফুল্লিত ও চাপমুক্ত রাখে

(৪) কর্মে উদ্যোমী করে

(৫) ত্বককে উজ্জ্বল করে

(৬) অনিদ্রা দূর করে

(৭) রক্তের pH মানের ভারসাম্য রক্ষা করে

কীভাবে উপাসনার অভ্যাস গড়ে তুলবেন? কীভাবে মন্ত্র পড়লে সহজে হবে?

নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন। কিন্তু ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই আমাদের জীবন গড়ে তোলে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা অর্জুন, এই অভ্যাসের বলেই শ্রেষ্ঠ। পুরো মহাভারতের বহু স্থানে অর্জুনের এই অভ্যাস ও অধ্যাবসায়ের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী এসেছে।

ভালো অভ্যাসই আপনাকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করবে। এজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অন্য নাম অভ্যাসযোগও। তাই ভালো ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ। অন্ততপক্ষে তিনটি অভ্যাস প্রত্যেকের গড়ে তোলা উচিৎ।

১. শরীরচর্চা

২. ধ্যান-উপাসনা

৩. বই পড়া

আত্ম-উন্নয়ন করতে হলে এগুলো অপরিহার্য। তাছাড়া একজন সনাতনী হিসেবে, ধার্মিক হিসেবে শরীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কর্মক্ষম থাকা আপনার কর্তব্য।

মাত্র তিষ্ঠঃ পরাঙ্মনাঃ [অথর্ববেদ ৮।১।৯] উন্মনা / বিষন্ন হয়ে বসে থেকো না।

যেকোনে অভ্যাস গড়ার তিনটি নিয়ম রয়েছে —

১. অভ্যাসটিকে ছোট ছোট মজাদার ও সহজ ধাপে ভেঙে নেওয়া;

২. কঠোর সংকল্প ও অধ্যাবসায় নিয়ে অভ্যাস করে যাওয়া ;

৩. দ্বিতীয় নিয়মকে অনুসরণ করা।

উদাহরণ স্বরূপ এভাবে করতে পারেন।

ধ্যান-উপাসনা

ধ্যান বলুন বা মেডিটেশন, তা আমাদের চিন্তা ভাবনায় স্বচ্ছতা আনে, মনকে শান্ত করে, দৃঢ় অথচ কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। কিন্তু অভ্যাস না থাকলে চোখ বন্ধ করে দুই মিনিট বসে থাকলেই মাথা চক্কর দেবে। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারেন —

(১) পুরো সন্ধ্যোপাসনা বিধিটি অডিও ডাউনলোড করে নেবেন।

(২) সন্ধ্যাবেলায় ইয়ারফোনে অডিওটি চালিয়ে চুপ-চাপ শুনবেন শুধু। শুয়ে বসে যেভাবেই হোক।

(৩) ১০-১২ দিন শোনার পর চোখ বুজে মনে মনে মন্ত্রগুলো বলাও শুরু করবেন। তারও ১০-১২ দিন পর একটা নিরালা জায়গা বেছে সেখানে সোজা হয়ে বসে শুনবেন।

শুনতে শুনতে কবে যে মন্ত্রসহ পুরো বিধি মুখস্থ হয়ে যাবে, টেরও পাবেন না।

মেডিটেশনের জন্য ইউটিউবে অনেক ভালো ভালো টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়, সেগুলো অনুসরণ করে দেখতে পারেন।

বই পড়া

শাস্ত্রবিষয়ে জানতে চান বা অন্য কোনো বিষয়ে, পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

এই অভ্যাস গড়তে প্রতিদিন অন্তত ৫-১০ পাতা করে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। যে কোনো কিছু পড়তে পারেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ধর্মীয়... যা ভালো লাগে। কিন্তু পড়তেই হবে। পড়তে পড়তে একসময় পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে।

এভাবে ছোট ছোট মজাদার ধাপে ভেঙে নিয়ে যেকোনো ভালো অভ্যাস গড়ে তুলুন। সেই খরগোশের মত ১০০ কি.মি. দৌড় দিয়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়লে অভ্যাস আর গড়া হবে না। রয়ে সয়ে কচ্ছপের গতিতে হলেও ধীরে সুস্থে লক্ষ্য ধরে এগিয়ে গেলে তবেই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল।
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।।

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নেমে পড়তে হবে শুধু। মনকে বশ করা কঠিন কিন্তু মনকে একবার মানিয়ে নিতে পারলে সব করা সম্ভব। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভ্যাসযোগ (ধ্যানযোগও বলা হয়) থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

শ্রীভগবান্ উবাচ –

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥
... বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

[গীতা ৬।৩৫-৩৬]

“ হে অর্জুন! নিঃসন্দেহে মন চঞ্চল, দুর্নিগ্রহ। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করা যায়। ... যথাবিহিত উপায়ে চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তির পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব। ” — এটিই হল আসল কথা।

পথ চলতে গিয়ে পা পিছলে যাবে বারবার, আলস্য পেয়ে বসবে, ইচ্ছা হবে না। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মনে মনে এই মন্ত্রটি বলবেন,

"অহমিন্দ্রো ন পরা জিগ্যে।" [ঋগ্বেদ ১০।৪৮।৫] "আমি ঐশ্বর্যবান, কখনোই হেরে যেতে পারি না"

মনে রাখবেন আপনি শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের, মহান মহর্ষিদের উত্তরাধিকারী; যেকোনো পরিস্থিতে থেমে যাওয়া আপনার বৈশিষ্ঠ্য নয়। তবেই হবে, আর হবেই, নিশ্চিত থাকুন।

তাহলে আর কী? আজ থেকেই শুরু করে দিন । কারণ,

রম্ভী চিদত্র বিবিদে হিরণ্যং [ঋগ্বেদ ২।১৫।৯] কার্যারম্ভ করা ব্যক্তিই ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত করে।

বেদ অনুযায়ী একজন সনাতনীর দিনপঞ্জি কেমন হওয়া উচিৎ

১। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তেই ঘুম থেকে উঠবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত = সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট থেকে ৪৮ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত সময়।

২। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জাগরণ মন্ত্র পাঠপূর্বক মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করবে।

৩। তারপর ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরের প্রভাতী বন্দনা করবে।

৪। তারপর যথাক্রমে শৌচপূর্বাদি কর্ম যথা জলপান, দাঁত মার্জন ও মুখ ধুয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হবে।

৫। এরপর দূরে কোথাও বা নির্জনে যোগাভ্যাস করতে হবে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যায়াম বা জগিং করা যেতে পারে। দূরে যাদের সম্ভব না, তারা ঘরেই করবে। সূর্যোদয়ের সময় জগৎপিতা পরমাত্মাকে বেদমন্ত্র পাঠ করতে হবে।

৬। এরপর স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র ধারণ করে ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা ও শাস্ত্রপাঠ করবে। বেদপাঠ করবে। তারপর অন্যান্য শাস্ত্রপাঠ করবে। যদি সস্বরে না সম্ভব হয় তবে একশ্রুতিতে পাঠ করবে। স্নান উভয় বেলাতেই সন্ধ্যোপাসনার পূর্বে করা শ্রেয়। অন্যথায় শারীরিক মার্জন আবশ্যক।

৭। সম্ভব হলে সকালেই দেবযজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র করা বাঞ্ছনীয়। না পারলে সন্ধ্যায় করবে। অগ্নিহোত্র সূর্যোদয়ের পরে ও সূর্যাস্তের পূর্বে করতে হবে। যদি দেখা যায় প্রতিদিন করা সম্ভব নয় তবে সপ্তাহে একবার কিংবা দর্শপৌর্ণমাসরূপে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অবশ্যই দেবযজ্ঞ করবে। [উপনয়ন নেওয়া সকল সনাতনী অবশ্য পালনীয়]

৮। তারপরে পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও অতিথি যজ্ঞ সম্পন্ন করা। ।

৯। আমাদের খাদ্যগ্রহণ ও সমাপ্তির পূর্ব মন্ত্র, স্নান মন্ত্র, ভ্রমণ, পড়াশোনা [মেধাসূক্ত], ব্যবসায় বা যথাস্থানে, শয়নের আগে [শিবসংকল্প] যেসব মন্ত্রপাঠ প্রযুক্ত হয়েছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে।

১০। পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি অবশ্য পালনীয়।

পঞ্চমহাযজ্ঞ কাকে বলে?

যে কর্মগুলো মানুষের প্রতিদিন অবশ্য করা কর্তব্য তাই পঞ্চমহাযজ্ঞ।

আমরা ৫টি জায়গায় প্রতিদিন অজ্ঞাতসারে পাপ বা হিংসা করি -

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ । ।
তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্ । ।
অধ্যাপনং ব্রহ্ময়য়্জ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্

[মনুস্মৃতি ৩।৬৮-৭০]

অনুবাদঃ চুল্লী, জাঁতা বা শিল নোড়া, উপস্কার বা হাড়িকড়া, কন্ডনী বা ঢেকি ও কলসী এই পাঁচটির নাম সূনা বা পশুবধস্থান। এগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণিহিংসা ঘটে, তার জন্য গৃহস্থকে পাপে লিপ্ত হতে হয় ।

উপরোক্ত পাঁচটি থেকে উৎপন্ন পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থদের পক্ষে যথাক্রমে পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন।
বেদাদি অধ্যায়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্ন উদকাদির দ্বারা জীবিত পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা সহকারে তপর্ণের নাম পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে প্রক্ষেপরূপ হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশুপাখি,কৃমি, কুকুর, বেড়াল, অধম, পাপীকে খাওয়ানোর নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ ।

কেন আমরা পঞ্চমহাযজ্ঞ পালন করবো ?

পঞ্চ মহাযজ্ঞে গৃহস্থের পুরোহিতের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পঞ্চমহাযজ্ঞে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেবতা, ঋষি, পিতর, জীব এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিজ কর্তব্যের পালন করা। অতএব পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবস্থায় নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রগতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সকল জীবের প্রতি একাত্ম ভাবনা সৃষ্টি হয়।
গীতায় বলা আছে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হলে দেব বা বিদ্বান ইষ্টকে অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পন্নকারীকে ফল দান করবেন। অর্থাৎ গীতা ও মনুস্মৃতিতে যে দেবযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তা নিরুক্ত অনুসারে মূলত বিদ্বান মানবদের ও পরিবেশের শুদ্ধিকারী দেবযজ্ঞের কথা ।
আর এই ধরণের যজ্ঞ কেন করবেন ও করলে কি হয় তাও একবার দেখুন-
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥
[গীতা ৩।১৪]
অর্থ: সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি থেকে , বৃষ্টি হয় যজ্ঞ দ্বারা এবং যজ্ঞ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ [গীতা ৩।১৫]
অর্থ: কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। বেদ অবিনাশী অক্ষর থেকে উৎপন্ন। সেজন্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য (সবসময়) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।
অক্ষর শব্দে ক্ষয় রহিত পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে (মুণ্ডক উপনিষদ : ১।১।৭)। প্রাচীন টীকাকারেরা বলেছেন - **ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝতে হবে এবং অক্ষর শব্দে পরমাত্মা**। তবে কেউ কেউ প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝেছেন, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরমব্রহ্ম বুঝেছেন। তা না হলে অর্থের অসঙ্গতি হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝেছেন। অর্থাৎ '**বেদ সর্বার্থ প্রকাশক হেতু নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত**।' তবে এজন্য মূল তাৎপর্যের কোনো সমস্যা হয় না। পাঠক যেকোনো একটি অনুবাদ গ্রহণ করতে পারে। আমরা এই স্থানে শ্রীধর স্বামী, কেদারনাথদত্ত, বিশ্বনাথ ইত্যাদি বহু প্রচলিত টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করেছি ।
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ [গীতা ৩।১৬]
অর্থ: হে পার্থ (অর্জুন)! যে এই পৃথিবীতে এই প্রকার প্রবর্তিত চক্র অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগী পাপময় ব্যর্থ জীবন ধারণ করে।
'**প্রবর্তিত**' শব্দে উপরে উল্লেখিত কর্মকে বুঝানো হয়েছে। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন যে, গীতা ও বৈদিক গ্রন্থসমূহে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতা পূজা বলতে কি বুঝানো হয়েছে ।
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ [গীতা ৩।১৩]

অর্থ:- যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্নের ভোগকারী শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যে পাপী (শুধুমাত্র) নিজের শরীর পালনের জন্য পচন [রান্না] করে তারা তো পাপকেই ভোজন করে।

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে পঞ্চমহাযজ্ঞ বুঝানো হয়েছে।

১। ব্রহ্মযজ্ঞ (শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যোপাসনা),

২। দেবযজ্ঞ (হবন অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হয়),

৩। পিতৃযজ্ঞ (পিতা-মাতা সহ গুরুজনদের শ্রদ্ধার সাথে সেবা করা),

৪। অতিথিযজ্ঞ (ধর্মাত্মা অতিথিদের সেবা করা),

৫। ভূতযজ্ঞ (প্রাণীদের সেবা করা) –এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট অন্ন ভোগকারী পাপমুক্ত হয় ।

পঞ্চৈতান্যো মহাঅয়জ্ঞান্ন হাপয়তি শক্তিতঃ ।

স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে ।

[মনুস্মৃতি ৩।৭১]

অনুবাদঃ যে গৃহস্থ প্রতিদিন পূর্বোক্ত পাঁচটি মহাযজ্ঞ যথাসম্ভব পরিত্যাগ না করেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করেও সূনা বা পশুবধস্থান জনিত দোষে লিপ্ত হন না ।

ঋগ্বেদ ১০।১১৭।৬ এ বলা হয়েছে -

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইতস তস্য।

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।।

উদার চিত্তরহিত, অদূরদর্শী, ক্ষুদ্রজ্ঞানী ব্যক্তির ধন উপার্জন ও অন্নাদি ভোজন সবই ব্যর্থ হয়। আমি সত্য বলছি যে, ঐসব ধন বৈভব তার জন্য মৃত্যুস্বরূপ। যে ব্যক্তি অন্নাদি দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি অথবা তার আত্মীয় স্বজনকে পালন পোষণ করে না, প্রকৃতপক্ষে সেই একলা ভোজনকারী ব্যক্তি শুধু পাপই ভোজন করে অর্থাৎ সে পাপী হয়।।

পঞ্চমহাযজ্ঞ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

ব্রহ্মযজ্ঞ [ঋ০ ১।৬।১]

ব্রহ্মযজ্ঞ হল ব্রহ্মকে জানার প্রচেষ্টা।

পশুজন্মের সাথে মানবজন্মের পার্থক্য কী?

একটি পশু আহার করে, ঘুমায়, মৈথুন করে। একজন মানুষের জীবনও যদি আহার, নিদ্রা, মৈথুনেই কেটে যায়, তাহলে পশুর সাথে তার পার্থক্য কী! ঈশ্বর আমাদের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যযোনী দিয়েছেন, বর্তমান মনুষ্য জন্মকে সার্থক তখনই করতে পারি, যদি আমরা এই দুর্লভ জন্মকে ব্রহ্ম সাধনার কাজে লাগাই।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। [যজু ৩১।১৮]।

এই ব্রহ্মকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের আর কোনো উপায় নেই। এভাবেই আমরা ক্রমান্বয়ে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিরূপ মোক্ষের দিকে ধাবমান হতে পারব। ব্রহ্মকে জানার যেকোনো প্রচেষ্টাই ব্রহ্মযজ্ঞ। সাধারণত যোগ, প্রাণায়াম, স্বাধ্যায় [শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন], অধ্যাপনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা এসকলই ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

কীভাবে আমরা ব্রহ্মযজ্ঞ করতে পারি ?

যোগ প্রাণায়াম

স্বাধ্যায় [শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন]

অধ্যাপনা

ঈশ্বরের স্তুতি

প্রার্থনা

উপাসনা

এসকলই ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

দেবযজ্ঞ [ঋ০ ৮।৪৪।১, যজু০ ৩।১, যজু০ ১২।৩০] নিত্য অগ্নিহোত্রসহ সকল যজ্ঞ, প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে হবি অর্পণ, বিদ্বাণগণের সংসর্গ লাভ ও সেবা করাই দেবযজ্ঞ।

গীতায় আছে, তাই প্রতিদিন কিংবা বিশেষ তিথিতে কাষ্ঠ, নানা আহার্য শস্যদ্রব্য, ঘৃত, সুগন্ধি মশলা, কেসর, জাফরান, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। নানা সুগন্ধি দ্রব্য হবি দেয়ার ফলে বায়ু ও বিশুদ্ধ ও নিরোগ থাকে।

মহর্ষি যাস্কাচার্য লিখিত বৈদিক শব্দকোষ নিরুক্তে [৭।১] বলা হয়েছে-

"য়ৎকাম ঋষির্য়েস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্স্তুতিং প্রযুংক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি॥"

অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেন তখন মন্ত্রের সেই বিষয়টিকে দেবতা বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ **ঋগ্বেদ ১০।১৫১** এর দেবতা হলো **'শ্রদ্ধা'** এবং এই সূক্তের **আলোচ্য বিষয় হলো ঈশ্বর ও গুরুজনে শ্রদ্ধা বা সম্মান। ঋগ্বেদ ১০।১১৭** এর দেবতা হলো **'ধনদানপ্রশংসা'** এবাং এই সুক্তের মন্ত্রসমূহের **আলোচ্য বিষয় হলো গরীবদুঃখীদের দানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। ঋগ্বেদ ১০।১৪৬** এর দেবতা হলো **'দ্যুতনিন্দা'** এবং তাই এর **আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো জুয়াখেলার অপকারিতা ও নিষিদ্ধতা। ঋগ্বেদ এর প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের** দেবতা হলো **'অগ্নি'**।

আজ ম্যাক্সমুলার সহ বিদেশী মিশনারীদের অপপ্রচারের কারণে একে সবাই নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত আলাদা একটি দেবতা মনে করে, যদিও তা সম্পূর্ণ ভুল।

(১) উপযোগের দেব -

এই তেত্রিশ প্রকার দেব এর মধ্যে কেবল জীবাত্মা চেতন। ইহা অন্যের উপযোগ করে অথবা স্বয়ং অন্য জীবাত্মার উপযোগে আসে। যেমন গাভী দুধ দিয়ে, ভেড়া ঊণ [লোম] দিয়ে, ষাঁড় হাল চাষের উপযোগে আসে। তেমনি সৈনিক, বৈদ্য আদিও উপযোগে আসে। জীবাত্মার অতিরিক্ত শেষ বত্রিশ দেব জড় এবং উপযোগের দেব বলা হয়।

(২) ব্যবহারের দেব -

মাতা, পিতা,আচার্য, অতিথি এবং পতি-পত্নী দ্বারা সংসারের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এ জন্য এই পাঁচ কে ব্যবহারের দেব বলা হয়।

এই পাঁচজন বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ দেব-দেবী। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আমরা এইরূপ দেবতাদেরই দেখতে পাই এবং তাদের পূজনের কথা পাই। **"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য়দেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।"** তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।২। তবে দেব হবেন তিনিই, যাঁর মধ্যে উত্তম গুণাবলী তথা বিভিন্ন দৈবী সম্পদ [গীতা ১৬।১-৩] রয়েছে। পিতামাতা, আচার্য, পতি-পত্নী প্রত্যেকে আদর্শ আচরণ না করলে তারা দেব হিসেবে আখ্যার যোগ্য হবেন না।

ওম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম। ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।

ব্রহ্মাদিদেবসুতাস্তৃপ্যন্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবগণপ্যন্তাম।

পারস্কর ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।

"বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" এটা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন (৩।৫।৬।১০)। যিনি বিদ্বান তাকেই **দেব** বলা যায়। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদ জানেন তাঁহাকে **ব্রহ্মা** বলা যায়। এর ন্যূন হলে তাঁরাও নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান। তাঁহাদিগের সদৃশী তাদের বিদুষী স্ত্রী **ব্রাহ্মণী** অথবা **দেবী**, তাদের অনুরূপ পুত্র ও শিষ্য এবং তাদের সদৃশগণ অর্থাৎ সেবককে সেবা করার নাম **শ্রাদ্ধ** এবং **তর্পণ।**

পিতৃযজ্ঞ [যজু০ ২।৩৪] আমাদের প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, পিতামহ-পিতামহী, মাতা-পিতা, স্বগোত্রীয় কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরু বা আচার্য তথা অন্য যেকোনো বিদ্বান্ বা শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা অনুভবপ্রবীণ, জ্ঞানপ্রবীণ ও মান-সম্মান পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে 'পিতর' বলা হয়। তাদের যথাযথভাবে সন্মান প্রদর্শন, তাঁদের সাথে ভালো আচরণ ও তাঁদের শ্রদ্ধা করাই পিতৃযজ্ঞ।

'যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে', [যজু০ ১৯।৪৫] 'পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ', [যজু০ ১৯।৩৬]
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহাদির তথা **'নমো বঃ পিতরো রসায়'** ইত্যাদি মন্ত্র **[যজু০ ২।৩২]** পিতরদের সেবা ও সৎকার করার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ । **'অহতৌ পিতরৌ ময়া' যজুর্বেদ [১৯।১১]** = আমার মাধ্যমে যেন আমার মা-বাবা কষ্ট না পায়।
এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলেছেন—

"কুর্য়াদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাঽপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্।।
[মনু০ ৩।৮২]"

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজ্য পদার্থ এবং জল, দুধ, কন্দমূল, ফল ইত্যাদি দ্বারা পিতরদের প্রসন্নতার জন্য প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করবে অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে পিতামাতার সেবা-সৎকার করবে। এখানে ভগবান মনু স্পষ্টভাবে জীবিত পিতরদের সেবা করার জন্য বিধান দিয়েছেন এবং সেটি প্রতিদিন করতে বলেছেন।

পিতর কত প্রকার রয়েছে?

পিতর শব্দের অর্থ রক্ষক। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার বলা হয়েছে

জনকক্ষোপনেতা চ যশ্চ বিদ্যা প্রয়াচ্ছতি।
অন্নদাতা ভয়াএতা , পঞ্চায়তে পিএঃ স্মৃতঃ।
(চাণক্য নীতি ৫।২২)

অর্থাৎ পিতা, আচার্য, বিদ্যাদানকারী অধ্যাপক, অন্ন দানকারী এবং ভয় হতে রক্ষাকারী এই পাঁচ জনকে পিতর বলা হয়।

পিতৃযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধ কি এক নাকি আলাদা? মৃত পিতরীদের আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ করা কি বেদ সম্মত?

পিতৃযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধ একই। শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ হল শ্রদ্ধাপূর্বক পিতা মাতা এবং গুরুজনদের সেবা করা। এই যজ্ঞ প্রতিদিন করার যোগ্য। প্রসঙ্গত অন্ত্যেষ্টি কর্ম ব্যতীত পৃথক কোনো কর্ম মৃতের জন্য দ্বিতীয়বার কর্তব্য নয়। মূলত **'শ্রাদ্ধ' শব্দের মূল অর্থ শ্রদ্ধা, "শ্রৎ সত্যং দধাতি য়য়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া য়ৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্।"** অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা যায় তার নাম শ্রদ্ধা এবং যা শ্রদ্ধা সহকারে করা যায়, তার নাম শ্রাদ্ধ। মৃত্যুর পরে তো জীব কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে গমন করে, অতএব মৃত্যুর ১৫ দিন বা ১ মাস পরে কোনো অনুষ্ঠান করে তাদের তৃপ্তি বা সেবা কখনো সম্ভব নয়। আর মাতা, পিতা, পুত্রাদি সম্বন্ধ শারীরিক। শরীর নষ্ট হওয়ার পর কে কার পিতা আর কে কার পুত্র? **অতএব জীবিতকালে শ্রাদ্ধ করাই বৈদিক নিত্যকর্ম।**

ভূতযজ্ঞ হল জগতের সকল মানুষ ও পশুপাখির কল্যাণ কামনা ও তাদের সর্বদাই যথাসাধ্য সাহায্য করা [ঋ০ ২।১৩।৪] । **"দ্বিপাদব চতুষ্পাৎ পাহি"** [যজু০ ১৪।৮] দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ প্রাণীদের সংরক্ষণ করো। **"উর্জম্ নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে"** [যজু০ ১১।৮৩] সকল দ্বিপদী ও চতুষ্পদী বৃদ্ধি ও পুষ্টিপ্রাপ্ত হোক- এভাবেই পবিত্র বেদে সকল প্রাণীর সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। মানব ও পশুর প্রতি আমাদের সর্বদাই উত্তম আচরণ করা উচিত। আমরা অসুস্থ মানবের সেবা করতে পারি, দুঃস্থদের সাহায্য করতে পারি, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে পারি, অবলা প্রাণীর জন্যও আহার, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। এসবই ভূতযজ্ঞ। **শুনাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্ ।বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি॥** [মনু ৩।৯২] কুকুরাদি পশু, পতিত ব্যক্তি, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, কুষ্ঠাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী, কাক আদি পক্ষী ও পিঁপড়া আদি কীটের জন্যে খাদ্যদ্রব্যের ছয় ভাগ আলাদাভাবে ভাগ করে দেওয়া ও তাদেরকে সদা প্রসন্ন রাখা উচিত।

অতিথিযজ্ঞ অতিথিদের যথাযথ সেবা। যিনি পূর্ণ বিদ্বান, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, সত্যবাদী, ছল-কপট-রহিত, নিত্য ভ্রমণকারী মানুষ, তিনিই 'অতিথি' । [অথর্ব০ ৯।৬।[৩]১-৮] কারো ঘরে যখন এসব গুণযুক্ত, সেবা করার যোগ্য অতিথি আসেন; তখন তাঁকে গৃহস্থ দাঁড়িয়ে নমস্কার করে, উত্তম আসনে বসাবেন। পরে গৃহস্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, "আপনার জল, খাদ্য বা অন্য কোনো বস্তুর ইচ্ছা হয় সেটা বলুন । হে অতিথি! যেভাবে আপনার কামনা পূর্ণ হয়, আমরা সেভাবেই

আপনার সেবা করবো।" এভাবেই আমরা মানব পরস্পর সেবা ও সৎসঙ্গপূর্বক বিদ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সর্বদা আনন্দে থাকতে পারি।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল কী ?

(১) ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম এবং সভ্যতা ইত্যাদি শুভ গুণের বৃদ্ধি হয়। স্বাধ্যায় করলে মনে সুচিন্তা স্থির হয় , যা জীবনকে পবিত্র করতে অনেক সাহায্য করে।

(২) 'অগ্নিহোত্র' দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি হয়। বৃষ্টি দ্বারা জগতের সুখলাভ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস, স্পর্শ এবং পান ভোজন দ্বারা আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বর্ধিত হয়। তদ্দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ণ হয়। এই জন্য একে 'দেবযজ্ঞ' বলা হয়।

(৩) 'পিতৃযজ্ঞ' দ্বারা মাতা, পিতা এবং জ্ঞানী মহাত্মাজনের সেবা করলে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। তা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করে সুখী হবে। দ্বিতীয়তঃ কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য সন্তান ও শিষ্যদের যে উপকার করেন, তার প্রতিদান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

(৪) বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞের উদ্দেশ্য হলো মনুষ্য সকল জীবের মধ্যে নিজের সমতুল্য আত্মাকে অনুভব করে তাদের সাথে প্রেমময় আচরণ করতে শেখা।

(৫) অতিথিযজ্ঞ যতদিন পর্যন্ত জগতে শ্রেষ্ঠ অতিথির আবির্ভাব না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত উন্নতিও হয় না। তাঁরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সত্যোপদেশ প্রদান করেন বলে ভণ্ডামি বৃদ্ধি পায় না। গৃহস্থদিগের সর্বত্র সহজে সত্যবিজ্ঞান লাভ হতে থাকে এবং সকল মনুষ্য একই ধর্মে স্থির থাকে। অতিথি ব্যতীত সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না এবং সংশয়-নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ়নিশ্চয়ও হয় না।

আর্য সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক বীর বিপ্র পণ্ডিত লেখরামজীর দিনলিপি কেমন ছিল:-

(১) প্রতিদিন ভোর ৪ টাই ব্রহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠতেন।

(২) ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে শৌচাগার ব্যবহার করে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন।

(৩) ব্যায়াম করার পর স্নান সেরে সন্ধ্যোপাসনা ও প্রাণায়াম ইত্যাদি করতেন।

(৪) এর পর নিত্য যজ্ঞ (অগ্নিহোত্র) করতেন ।

(৫) অগ্নিহোত্র করার পর এক ঘন্টা বেদ মন্ত্র পাঠ করতেন তারপর এক ঘন্টা ইসলাম, খ্রিস্টান, নাস্তিক বিশ্বাস খণ্ডন কারী সামগ্রী পাঠ করতেন ।

(৬) অধ্যায়েনের পরে তিনি খাবার খেতেন তারপর বিধর্মীদের অভিযোগের জবাব লিখতেন।

(৭) এরপর তিনি দৈনন্দিন কাজ কাজ ইত্যাদি করতেন এবং বেশিরভাগ আর্যসমাজের মন্দির বা অন্য জায়গায় বক্তৃতা দিতেন,কখন ও তিনি পথভ্রষ্ট হিন্দুদের বোঝাতেন এরপর বৈদিক ধর্মে নিয়ে আসতেন,আবার কখন ও বিতর্ক করতেন ধর্ম বিরোধীদের সাথে।

(৮) দুপুরের পর বাড়ি এসে আর্য সভার দেখা শোনার কাজ করতেন।

(৯) সন্ধ্যার পর সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র করে খাবার খেতেন।

(১০) এর পর আবার স্বাধ্যায় করার জন্য বসতেন।

(১১) প্রথমে আর্য সমাজ দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠছিল কারণ তাদের কাছে এই রকম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভালো আচরণকারী প্রচারক ছিলেন যার দিনলিপি কথাই ও কাজে এক ছিলো । কিন্ত যখন থেকে এমন লোকের অভাব ছিলো যারা কেবল মাত্র প্রবচন করা কর্তব্য মনে করে,যারা অগ্নিহোত্র সন্ধ্যোপাসনা আর নিত্যকর্ম করে না,যারা চা খায় যারা কবল মাত্র দক্ষিণার জন্য ক্ষুধার্ত । এমন পতিত মানুষ বৈদিক ধর্ম রক্ষা করবে !! এটা ভেবেই হাসি পায়। আসুন আমরা

সবাই পণ্ডিত লেকরাম, পণ্ডিত চামুপতি,পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল এর মত নিজেদের মধ্যে আর্য সমাজের গুণাবলী ধারণ করি আর আর্য সমাজের মাধ্যমে আমাদের বৈদিক ধর্ম কে উচ্চতাই নিয়ে আসি ।

বর্তমান গুরুকুলের শিক্ষার্থীদের দিনচর্চা কেমন হয়?

সাবরমতী- গুরুকুল'-এর শিক্ষার্থীদের দিনচর্চা আধুনিক বিকৃতিসমূহ গুলো কে দূরে রেখে আর্য পরম্পরার সাথে সুব্যবস্থিত । শিক্ষার্থীদের দিনচর্চা শুরু হয় ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত সাড়ে ৯.৩০ টায় ঘুমানো। শিক্ষার্থীদের দিনচর্চা মোট ১৬.৫ ঘন্টার জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। যেখানে ৭ ঘণ্টা বিবিধ ভাষা ও বৈদিক গণিত আদি বিদ্যার অধ্যয়ন করা হয়। ২ ঘন্টা সংগীত ও চিত্রকলার অধ্যয়ন হয়। যোগব্যায়াম এবং খেলাধুলার কৌশল ইত্যাদির মতো দক্ষতা অভ্যাসের জন্য ৩ ঘন্টা এবং স্নান এবং ভোজনের মতো দৈনন্দিন কাজের জন্য ৪.৫ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১) ব্রহ্ম মুহূর্তে জেগে ওঠা।

(২) যোগযোগব্যায়াম, ধ্যান এবং প্রাণায়াম।

(৩) দর্শন, প্রার্থনা এবং প্রত্যাখ্যান

(৪) গৌ-দোহন, ত্রিফলাঞ্জন, দাঁত মাজা, উষ্ণ দুধ পান এবং নবকারশী।

(৫) সংস্কৃত এবং ধর্মীয় পাঠ।

(৬) স্নান ও প্রভুর পূজা

(৭) মধ্যাহ্ন ভোজন এবং বামকুক্ষী।

(৮) জ্যোতিষ, বৈদিক গণিত, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন।

সোর্স :- http://gurukulamshiksha.org/innerpages.php?page_id=11

বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম

বর্ণাশ্রম বলতে কী বোঝায়?

'বর্ণ' অর্থ হচ্ছে তা, যা বরণ করে নেওয়া যায় পছন্দের দ্বারা। 'বর্ণপ্রথা' বলে ধর্মগ্রন্থসমূহে কোনো শব্দ নেই। আছে *'বর্ণাশ্রম' বা 'বর্ণব্যবস্থা'*। শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় **'বর্ণ' শব্দটির ধাতুগত অর্থ 'বৃণোতে', যার অর্থ 'To Choose' বা পছন্দ করা**। অর্থাৎ পছন্দ অনুযায়ী আশ্রম বা পেশা নির্ধারণ করা। নিরুক্ত ২।৩ এ তাই বলা হয়েছে– **'বর্ণো বৃণোতেঃ'** অর্থাৎ বর্ণ বরণ করে নেয়া হয় বা **যে ব্রত নিজ ইচ্ছায় পছন্দ করে নির্বাচন করা হয় তাই বর্ণ।** কালের পরিবর্তনে যোগ্যতাগুণে নির্ধারিত বর্ণাশ্রম আজ হয়ে গেছে জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথা ! অথচ 'জাতি' ঈশ্বর দ্বারা পূর্বজন্মের কর্মফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত হলেও 'বর্ণ' হচ্ছে আমাদের নিজস্ব পছন্দগত এবং গুণ ও কর্মানুসারে গৃহীত। 'জাতি' শব্দটির দ্বারা শ্রেণিভুক্তকরণ বোঝায়। প্রাণিদের যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তারা এক প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে ভিন্ন এবং যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে একই প্রজাতির প্রাণীদের বুদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করা যাত তাকে জাতি বলে। **ন্যায়দর্শনে [২।২।৭১] বলছে, "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"** অর্থাৎ **যারা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, এরূপ পদার্থ হলো জাতি।** পাণিনীয় ধাতুপাঠের স্বাদিগণে **'বৃ' ধাতুর** অর্থ দেওয়া সংবরণ [বৃ সংবরণে]। অর্থাৎ বৃ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বর্ণ শব্দটির ধাত্বার্থক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখলেই বোঝা যায় বর্ণ শব্দটি বরণ করে নেওয়া অর্থাৎ নিজে বেছে নেওয়া অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ **নিজের ইচ্ছায় যে ব্রত পছন্দ করে বেছে নেয়া হয় তাই বর্ণ।** এই ব্রত বেছে নেয়াই কর্ম তা পুনরায় উক্ত হয়েছে- **ব্রতমিতি কর্ম্মনাম**

বৃণোতীতি সতঃ [নি০২।১৩] ব্রতম্' শব্দটি কর্মের নাম। যেহেতু 'বৃ' ধাতু দ্বারা আবৃত করা অর্থ প্রকাশ করে।আর তা বেছে নেয়াই বর্ণ।

এই কারণেই বৈদিক ধর্মকে বলা হয় 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। বর্ণ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে এটির ভিত্তি হচ্ছে নিজ পছন্দকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া ও নিজ যোগ্যতা অনুসারে পরিচালিত ব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়া। অর্থাৎ **নিজ পছন্দ অনুসারে কর্ম বা ব্রতকে বেছে নেয়াই বর্ণ।**

বর্ণাশ্রমের প্রকারভেদ

ব্রাহ্মণ কে ?

ঋ০ ৭।১০৩।৭-৯ , শত০ ব্রা০ ৫।১।১।১১ , মনু০ ১।৮৭ , গীতা ১৮।৪২ = যে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নিষ্ঠাবান, সুশৃঙ্খল, বেদ প্রচারকারী, বেদ জ্ঞানী , নিয়মিত বেদোক্ত অনুসারে ধ্যান যজ্ঞাদি কর্মে লিপ্ত সে ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন,উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী তিনি-ই ব্রাহ্মণ । অধ্যাপন,অধ্যায়ন,যজন,যাজন,দান ও প্রতিগ্রহ যারা করেন তারাই ব্রাহ্মণ। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য-এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

অধ্যাপনমধ্যযনং যজনং যাজনং তথা ।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥
[মনু ১।৮৮]

অর্থাৎ-ব্রাহ্মণের ছয়টি প্রধান ধর্ম বা কর্মের কথা বলা হয়েছে ১) বেদাদি সত্য শাস্ত্র পাঠ ২)নিজে পড়ে সত্য বিদ্যা শেখানো বা প্রচার করা ৩)আত্মত্যাগ (যা পরে ব্যাখ্যা করা হবে) ৪) অন্যের জন্য যজ্ঞ করা যাতে সকলের উপকার হয় ৫)নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী দান করা ৬)শ্রদ্ধাপূর্বক যা দেওয়া হয় তা সীমার মধ্যে রেখে প্রেমের সহিত গ্রহন করা।যিনি এই ধর্মগুলি যথাযথভাবে পালন করে সমাজের সেবা করেন এবং সকলের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, কেবল তাকেই পণ্ডিত, ধার্মিক, সদাচারী এবং ত্যাগী পুরুষ ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এমন কোন গুণ যা একজন ব্রাহ্মণের জন্য অপরিহার্য এবং যেটা ছাড়া একজন মানুষকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, সে যত উচ্চ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন?

এই গুনগুলোকে বেদ ও শাস্ত্রের ভিত্তিতে গননা করা হয়েছে-

সত্যং দানং ক্ষমা শীলম্, আনৃশংস্যং ত্রপাঃঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥
[মহাভারত, শান্তি পর্ব, অধ্যায় ১৮৯]

অর্থাৎ - নিম্নলিখিত গুন গুলো যার মধ্যে আছে তাকে ব্রাক্ষণ বলা হয়।

১) **সত্য**- সত্যবাদিতা, অর্থাৎ মন, কথা ও কাজে সর্বদা সত্যের ব্রত অনুসরণ করা।
২) **দান**- নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী গরীব, এতিম ও অক্ষমদের সাহায্য করা এবং উওম প্রতিষ্ঠান সমূহে অর্থ দান করা।
৩) **ক্ষমা**- কারো কতৃক অপরাধ সংঘটিত হলে তাকে কমপক্ষে তিনবার ক্ষমা করা।
৪) **শিলম** - ভাল, প্রেমময়, মিষ্টি স্বভাব ধারণ করা।
৫) **অর্নিশংস্যম** - নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত হওয়া। মানুষ এবং প্রাণীদের সাথে কোমলতা এবং প্রেমের সহিত আচরণ করা।
৬) **ত্রপা** - অপকর্মের প্রতি লজ্জা রেখে সেগুলো হতে দূরে থাকা।
৭) **তপ**- সুখ দুংখ, শীত গ্রীষ্ম, মান অপমান ইত্যাদি সহ্য করা তথা ভয়ংকর আপওি আসার সত্বেও ভয় না পাওয়া এবং ধর্মের পথ হতে দূর না হওয়া।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ -

শমো দমস্তপঃ শৌচন ক্ষান্তিরর্জভমেব চ।
জ্ঞানম বিজ্ঞানমস্তিকম ব্রহ্মকর্ম স্বভাজম॥
[গীতা ১৮।৪২]

অর্থাৎ- (শম:) শান্তি, (দম:)মন কে বশে আনা, (তপ:)শীত গ্রীষ্ম আদি সকল কিছুকে সহ্য করে নিরন্তর ধর্মকার্য করে যাওয়া,(শৌচম) পরিচ্ছন্নতা ও সকল প্রকার পবিত্রতা,(ক্ষান্তিহ) ক্ষমা, (অর্জবম) সরলতা, মনে যা আছে তা উচ্চারণ করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা,(জ্ঞানম) সর্বোওম জ্ঞান অর্জন করা, (বিজ্ঞানম)পরমাত্মা, আত্মা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন - এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম, যা ছাড়া কাউকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

শরীরের কোন অংশের সাথে ব্রাহ্মণের উপমা দেওয়া যায়, যার দ্বারা তার ধর্মগুলো উপলব্ধি করা যায়?

বেদের সুপ্রসিদ্ব পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে-- **ব্রাহ্মনস্য মুখমাসীত**। [যজুর্বেদ ৩১।১১] অর্থাৎ মানব সমাজকে যদি মানুষ বলে মনে করা হয়, তাহলে **ব্রাহ্মণ হল এই মানুষের মুখ স্বরুপ**। যেমন মুখ,নাক,কান প্রভৃতি আদি জ্ঞানন্দ্রিয় থাকে এবং কর্মন্দ্রিয় দিয়ে তৈরি,ঠিক একইভাবে মানব সমাজে যেসব পুরুষ সর্বোত্তম জ্ঞান অর্জন করে বক্তব্যের মাধ্যমে তা প্রচার করেন,যারা মুখের অংশের মতো আত্মত্যাগী ও তপস্বী, তাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়।যা মুখে দেওয়া হয়, মুখ নিজের কাছে না রেখে তা দিয়ে দে।একইভাবে, মুখের অংশটি শরীরের সবচেয়ে বড় তপস্বী অঙ্গ। কঠোর হতে কঠোরতম শীতেও এটি নগ্ন থাকে। একইভাবে, ব্রাহ্মণদের উচিত ঠান্ডা-তাপ ইত্যাদি সহ্য করার অভ্যাস করা।

ক্ষত্রিয় কে ?

ঋ০ ১০।৬৬।৮ , মনু০ ১।৮৯ = দৃঢ়ভাবে আচার পালনকারী, সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধ, রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন, অহিংস,ঈশ্বর সাধক, সত্যের ধারক, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্বেষমুক্ত ধর্মযোদ্ধা, অসৎ এর বিনাশকারী সে ক্ষত্রিয়। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা-এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

ক্ষত্রিয়দের ধর্ম কি এবং ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কি?

ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ যিনি ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম (ক্ষতত ত্রয়ত ইতি)।এই ধর্ম পালন করতে হলে তার মধ্যে প্রবল শক্তি থাকতে হবে।তাকে শক্তিশালী, শূরবীর, সাহসী এবং নির্ভীক হতে হবে।বেদে ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ । [যজুর্বেদ ৩১।১১]

শরীরের বাহু যেমন আমাদেরকে অশুভের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে,একইভাবে যে সকল সাহসী পুরুষ সমাজ ও দেশকে দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, প্রয়োজনে যুদ্ধ করেন বা দেশের প্রশাসনে সাহায্য করেন, তাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়।তাদের জন্যও বেদাদি শাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ জাগতিক জ্ঞান শেখা ,যজ্ঞ করা, দান করা, ধার্মিক হয়ে মানুষকে রক্ষা করা, সাহসী, ধৈর্যশীল ও উজ্জ্বল হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এগুলোই ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম ও কর্ম।প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছাড়া রাজকার্য চলতে পারে না।

বৈশ্য কে ?

অথর্ব০ ৩।১৫।১ , গীতা ১৮।৪৪ = দক্ষ ব্যবসায়ী, দানশীল,লোভহীন, চাকুরীরত এবং চাকুরী প্রদানকারী ব্যক্তি সে বৈশ্য। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এগুলি হলো বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম।

বৈশ্য শব্দের অর্থ কী এবং বৈশ্যদের ধর্ম কী কী?

বৈশ্য শব্দের অর্থ হল - যে ব্যবসা ইত্যাদির জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়,অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করুন (বিশতি দেশাদ দেশান্তরম ইতি) যা ব্যবসা,কৃষিকাজ ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থ উপার্জন করে (প্রতারণা, চুরি, জুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নয়) তারা তা সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য ব্যবহার করে,যারা পশুদের রক্ষা

করে,যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং সর্বোত্তম শিক্ষা এবং বহু দেশের ভাষা শেখেন,যারা যজ্ঞ করেন এবং দান করেন তাদের বৈশ্য বলা হয়।

বৈশ্যকে বর্ণনা করার জন্য শরীরের কোন অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে?

শরীরের মধ্যভাগ হতে বৈশ্যের উপমা দেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে পেট,উরু ইত্যাদি বিদ্যমান।

এইজন্য বেদে বলেছে,

মধ্য তদস্য য়দ্ বৈশ্য [অথর্ববেদ ১৯।১।৬]

অথবা **উরু তদস্য য়দ্ বৈশ্য** - [যজু ৩১।১১]

সমস্ত খাবার শরীরের মাঝখানের অংশ পাকস্থলী ইত্যাদি অংশে জমা হয়। সেখান থেকে তাদের শরীরের অন্যান্য অংশে পাঠানো হয়।একইভাবে, বৈশ্য সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে এবং সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য যেখানে যেখানে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সেখানে সেখানে বিনিয়োগ করেন।এইভাবে বৈশ্য সমাজের মহান সেবা করেন, কারণ অর্থ ছাড়া কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি চলতে পারে না।

শূদ্র কে ?

ঋ০ ১০।৯৪।১১ , গীতা ১৮।৪৪ = যে অদম্য, পরিশ্রমী, অক্লান্ত, জরা যাকে সহজে গ্রাস করতে পারেনা, লোভমুক্ত, কষ্টসহিষ্ণু সেই শূদ্র। পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।

শুদ্র কে এবং শুদ্রের ধর্ম কি?

যার বুদ্ধি খুব প্রখর নয়,এই কারণে যে বেদ শাস্ত্রের উচ্চতর বিষয়গুলি বুঝতে পারে না,যার মধ্যে বিষাদ, আসক্তি প্রভৃতি মূর্খের লক্ষণ আছে, যে পেট ভরাবার জন্য এদিক ওদিক দৌড়ায়,তাকে শুদ্র বলে, সে যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন।(শুচ দ্রাবতীতি শুদ্রঃ অথবা শু-আশু দ্রাবতীতি শুদ্রঃ।) শূদ্রের কাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সর্বপ্রকার সেবা করা।শূদ্রের নিজের মধ্যে কোন প্রকার অহংকার রাখা উচিত নয় এবং রান্না প্রভৃতি সেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত।প্রকৃত শূদ্র ব্যতীত সমাজ চলতে পারে না, তাই তাদের সাথে প্রেমের সহিত আচরণ করা উচিত।তাদের উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।যাতে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণাবলী আসে এবং সে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে।

শরীরের কোন অংশের সাথে শুদ্রের উপমা দেওয়া যায়?

বেদে পায়ের সাথে শূদ্রের উপমা দেওয়া হয়েছে, **পদভ্যায় শুদ্রো অজায়ৎ** [যজুর্বেদ ৩১।১১]

আমরা যেমন পা ছাড়া চলতে পারি না,একইভাবে প্রকৃত শূদ্র ও সেবক ছাড়া মানব সমাজ টিকে থাকতে পারে না।যাদের বিশেষ মানব-জ্ঞান ও উচ্চ বুদ্ধি নেই, তারা পেট ভরানোর জন্য পায়ের সাহায্যে এখানে-সেখানে যায় এবং প্রেমের সহিত সবার সেবা করে,তাদের শুদ্র বলে।সেবা করতে হলে কঠোর হওয়া খুবই জরুরী অর্থাৎ ঠান্ডা-গরম ইত্যাদি সহ্য করার ক্ষমতা থাকা জরুরি।তাই বর্ণধর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যজুর্বেদে বলা হয়েছে-

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণম্। ক্ষত্রিয় রাজন্যম।

মরুদ্ভ্যো বৈশ্যম। তপস্যে শূদ্রম।

[যজুর্বেদ ৩০।৫]

অর্থাৎ জ্ঞান প্রচারে ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত কর।বাহিনীর কাজে ক্ষত্রিয়দের নিযুক্ত কর।সকল মানুষের প্রয়োজনীয় ধন আয়ের দায়িত্ব বৈশ্যকে এবং ঠাণ্ডা-তাপ সহ্য করে সেবার কাজে লাগান শূদ্রকে।

মানুষকে এই চারটি ভাগে ভাগ করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কী?

এর উদ্দেশ্য এই যে, সকল মানুষ একত্রে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করুক, তবে সবার মধ্যে ভালোবাসার অনুভূতি থাকতে হবে।কেউ যেন নিজেকে বড় না ভাবে এবং অন্যকে যেন ছোট না ভাবে।মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বর্ণের প্রয়োজন।কোন একটি বর্ণ ছাড়া ঠিকে থাকা অসম্ভব। মুখ, বাহু, পাকস্থলী ও পা ইত্যাদি শরীরের

সকল অঙ্গ সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলেই নিজ নিজ কাজ করে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ অনুভূতি নেই।একইভাবে, মানব সমাজের মধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে পরস্পরের সাথে প্রেম ও সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি সমাজের উন্নতি ও শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বভাব – গুণ – কর্ম অনুযায়ী বর্ণ

ঋ০ ৯।১১২।১ = একেকজনের কর্মক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতা একেক রকম আর সে অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র।

গীতা ৪।১৩ = আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছি।

গীতা ১৮।৪১ = মানুষের স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্ম সমূহ বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্বভাবজাত গুণ অনুসারে কর্ম সমূহ বিভক্ত করা হয়েছে, জন্ম অনুসারে মানুষকে বিভক্ত করা হয় নি।

(১) যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, অধ্যাপনা, গবেষণা পছন্দ করেন, তারা 'ব্রাহ্মণ বর্ণ'।

(২) যারা প্রতিরক্ষা, প্রশাসন যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করেন এবং পেশা হিসেবে বেছে নেন কর্মগুণে তারা হন 'ক্ষত্রিয় বর্ণ'।

(৩) যারা অর্থনীতি ও পশুপালনাদি পছন্দ করেন তারা হন 'বৈশ্য বর্ণ' ।

(৪) যারা নিয়োজিত আছেন অন্যান্য সেবামূলক কাজ-কর্মে, তারা হন 'শূদ্র বর্ণ'।

এসব শুধু বোঝায় নানা ধরনের পছন্দ যেসব মানুষজন তাদের কর্মের জন্য নির্বাচন করেন এবং এর সাথে 'জাতি' বা জন্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

আজকাল লোকেরা এই শাস্ত্রীয় নীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এটি অনুসরণ করে না, তাই এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য কিছু প্রমাণ দিন।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্ ।

ক্ষত্রিয়াজাতমেবং তু, বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ।

[মনু০ ১০।৬৫]

অর্থাৎ শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষও ব্রাহ্মণ হতে পারে, যদি উনি একজন ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্মকে আত্মস্ত করেন এবং কোনো ব্যাক্তি যদি সেই গুণগুলিকে আত্মস্থ না করে, তাহলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষও শূদ্র হয়ে যায়।একইভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি চরিত্রের পরিবর্তন গুণ ও কর্মের কারণে হতে পারে।

এরকম শত শত উক্তি উদ্ধৃত করা যায়,যেখান থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারটি বর্ণ নয় যা জন্মের উপর নির্ভরশীল এবং পরিবর্তন করা যায় না,বরং এগুলি হল সেই বর্ণ, যার ভিত্তি হচ্ছে পুণ্য ও কর্মের উপর এবং তা এই জন্মেই পরিবর্তন করা যায়।

চতুরাশ্রম বলতে কী বোঝায় ?

বেদে মানুষের সাধারণ আয়ু একশো বছর বলা হয়েছে যার জন্য সন্ধ্যায় প্রতিদিন প্রার্থনা করা হয় **"জীবেম শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমরা যেন ঈশ্বরের কৃপায় কমপক্ষে একশো বছর পর্যন্ত বাঁচি।**

আমাদের মানবজীবনের মোট চারটি ধাপ, বাল্যকাল, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য। শাস্ত্রে এই চার বয়সের নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম বর্ণিত রয়েছে এবং তা পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই চারটি আশ্রমে জীবনকে ভাগ করার উদ্দেশ্য হলো— যাতে মানুষ নিজে নিজেকে উচ্চস্তরে নিয়ে যায় এবং সমস্ত প্রকারের উন্নতি করে যা ধীরে ধীরে হয়। যখন কোনো বড় কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তখন আমরা লেখতে পাই যে ধাপে ধাপে কাজ করলে ব্যক্তি সহজেই নিজের অভীষ্ট পর্যন্ত

পৌঁছে যায়। এইভাবে জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই চারটি আশ্রমকে জীবনের চারটি উদ্দেশ্য বোঝা উচিত।

এই চার আশ্রমের নাম কি?

এই চার আশ্রমের নাম যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

এই চারটি আশ্রমে জীবনকে ভাগ করার উদ্দেশ্য ও সুবিধা কী?

জীবনকে এই চার আশ্রমে ভাগ করার উদ্দেশ্য হল :-যাতে মানুষ নিজেকে উচু করতে পারে এবং সর্ব প্রকার উন্নতি করতে পারে যা কেবল ধীরে ধীরে হতে পারে।দূরের কোনো জায়গায় যেতে হলে পথে এমন কিছু গন্তব্য ও পদক্ষেপ তৈরি করতে হয় যাতে মানুষ সহজেই তার লক্ষ্যে পৌছায়।একইভাবে, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এই চারটি আশ্রমকে জীবনের চারটি স্তর হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

মনুষ্য জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য কী?

মানবজীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য সমস্ত দুঃখ, অজ্ঞান এবং অশান্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে পরম আনন্দরূপী মুক্তি প্রাপ্ত করা, যার মধ্যে সর্বদা সুখ, শান্তি এবং আনন্দ থাকে এবং সমস্ত বন্ধন কেটে যায়।

চতুরাশ্রমের প্রকারভেদ

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর ও বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করা এবং নিজের ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে রাখা ইত্যাদি। [অথর্ব০ ১১।৫।৩-২৪]। কমপক্ষে ২৫ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক যুবককে ও ১৬ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক যুবতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকা উচিত।

ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম কি?

ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রাথমিক আশ্রম। ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্তব্য হল বিদ্যালাভ। এছাড়া ব্রহ্মচারী সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি, অশ্লীলতা আদি বর্জন করবে এবং সকল প্রকার সদ্গুণ ধারণ করবে। [মনু০ ২।১২১,১৫৩-১৬৮,২১৮,২৩৮, ২৪০] সুশীল, স্বল্পভাষী, মিতভাষী হয়ে জীবনধারণ করবে। মদ্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য কখনো গ্রহণ করবে না। প্রতিদিন প্রাতকালে উঠে সন্ধ্যোপাসনাপূর্বক ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে দিন আরম্ভ করবে এবং সায়াহ্নেও যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। বেদ শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় করবে। আচার্য গুরুজনদের ধর্মানুসার আজ্ঞার নম্রতার সহিত পালন করে বেদ-শাস্ত্র এবং সমস্ত বিদ্যার জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। সমস্ত নারীকে মাতা ও বোনের দৃষ্টিতে দেখবে। ব্রহ্মচারীর জীবন তপস্বী, অর্থাৎ ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদি সহ্য করা উচিত। গুরুকুলে থেকে আচার্যকে পিতা ও বিদ্যাকে মাতা বোঝা উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, ঈর্ষা, আলস্য, দ্বেষ ইত্যাদি দুর্গুণ ত্যাগ [তৈ০ আ০ ৭।৯,১১ ;১০।৮] করে তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠ, ত্যাগী, তপস্বী, বিদ্বান, ধর্মাত্মা, ঈশ্বর ভক্ত, জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য সদা চেষ্টা করা [মনু০ ২।৯০-১০০]। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা শরীর, মন এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় । ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।। [অথর্ববেদ ১১।৫।১৬] অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যার প্রতাপে সত্যনিষ্ঠ বিদ্বানগণ মৃত্যুর কারণভূত রোগশোক থেকে বিজয় প্রাপ্ত করে। নির্ধারিত বয়সকাল [ঋ০ ৫।৪১।৭, ঋ০ ২।৩৫।৪-৬, ঋ০ ৫।৩৭।৩] অতিক্রান্ত হলে বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্যে পদার্পণ করবে।

ব্রহ্মচর্যের লাভ কি?

ব্রহ্মচর্য দেহ, মন এবং আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করে, যেমন শ্রী ভীষ্মপিতামহ, শ্রী স্বামী শঙ্করাচার্য, স্বামী আনন্দ তীর্থ (শ্রী মাধবাচার্য), ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিত্ব এর জীবন থেকে যা স্পষ্ট প্রণীত হয়।উনারা আমৃত্যু ব্রহ্ষচর্য পালন করেছিলেন।ব্রহ্মচর্যের মহিমায় মানুষ মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং মৃত্যুকে জয় করে।বেদে উল্লেখ আছে-

ব্রহ্মচর্যেন তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নৎ।

[অথর্ববেদ ১১০।৫।১৬]

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার মহিমায় সত্যবাদীরা মৃত্যুকে জয় করে।

গার্হস্থ্য

গৃহস্থাশ্রম চার আশ্রমের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রম। বিবাহের মধ্য দিয়ে পতি পত্নী সংসার জীবন আরম্ভ করে যার মাধ্যমে বংশধারা চলমান থাকে। গৃহস্থ্যাশ্রমে থাকা ব্যক্তিদের মুখ্য কর্তব্য হলো সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্বক ব্যবহার করা, সকলে মিলে উত্তম কার্যক্রমে তৎপর থাকা, পতি একপত্নী ব্রতে এবং পত্নী পতিব্রত ধর্মের পালন করা, মর্যাদা নিয়ম এবং সংযমে থেকে নিজের সমস্ত কর্তব্যের পালন করা [অথর্ব০ ১৪।২।৩২-৭৫]। পতি-পত্নী একে অপরকে একই শরীরের অংশ মনে করে [ম০ ব্রা০ ১।৩।৮-১০] সর্বদা প্রেমের সঙ্গে থাকবে । সমস্ত ধর্ম-কার্য করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করা। পুত্র এবং কন্যাকে উত্তম বিদ্যা দিয়ে তাদেরকে সদাচারী, ধর্মাত্মা এবং পরোপকারী বানানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করা ও স্বার্থ ত্যাগ করে দানশীল হওয়া উচিত [অথর্ব০ ৩।৩০।১-৭]। গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহস্থ নিত্য উপাসনা, অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ যথাবিধি পালন করবে।

গৃহস্থ আশ্রমরত ব্যাক্তিদের প্রধান কর্তব্য কি কি?

গৃহাশ্রমে বসবাসকারী মানুষের প্রধান কর্তব্য পরস্পরের প্রতি প্রেমের সহিত আচরণ করা।সবাইকে একসঙ্গে ভালো কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।স্বামীকে একবিবাহ এবং স্ত্রীকে পতিব্রত ধর্ম পালন করতে হবে।সজ্জা, নিয়ম ও সংযমের মধ্যে থেকে নিজের সমস্ত কর্তব্য পালন করতে হবে।স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে একই দেহের অঙ্গ মনে করে সবসময় প্রেম করা উচিত।সকল ধর্মীয় কাজে একে অপরকে সাহায্য করা।পুত্র-কন্যাদের সর্বদা সর্বোত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গুণী, ধার্মিক ও পরোপকারী করে তোলার চেষ্টা করা।স্বার্থপরতা ত্যাগ করে দানশীল হওয়া।

বানপ্রস্থ

বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশের সময় সাধারণত পঞ্চাশ বছরের পর, যখন সন্তানের সন্তান হয়ে যায় [মনু০ ৬।১-৩, ২৭-২৯]। গৃহস্থাশ্রম উপভোগের পর প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে নিজের মানসিক ও আত্মিক শক্তি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা, গুরুকুলে থেকে পড়ানো এবং অপরের সেবা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত [অথর্ব ১৯।৫।১, ১৯।৪১।১, ১৯।৪০।৩]। ঈশ্বর-ভক্তি, ধ্যান-যোগ এবং বেদাদি শাস্ত্রের মননে নিজের সময়কে বিশেষ রূপে লাগানোই এই সময়ের মূল প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি এইসময়ে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি ধারণ করা উচিত। নিজের জ্ঞান ও অনুভব দ্বারা অপরকে যথাশক্তি লাভ পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। যদি আগের দিনের মতো সকলে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বানপ্রস্থী হওয়ার নিয়ম মেনে নেয়, তাহলে গুরুকুল এবং উত্তম অপর সংস্থা চালোনো সহজ হবে। আজকালকার মতো বিদ্বান, অনুভব, ত্যাগী কার্যকর্তার অভাব এই সংস্থায় অনুভব হবে না। এভাবে শিক্ষা, সমাজের কাজ ভালোভাবে এবং সহজে চলতে থাকবে।

বর্তমানে বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রয়োজন কী? এবং এটাতে লাভ কী?

মানুষ যদি পুরানো দিনের মতো পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বানপ্রস্থি হওয়ার নিয়ম করে, তাহলে গুরুকুল এবং অন্যান্য ভাল প্রতিষ্ঠান চালানো খুব সহজ হবে।আজকালের মতো যারা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তারা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, আত্মত্যাগী কর্মীর অভাব অনুভব করবেন না।এভাবে শিক্ষা ও সমাজের কাজ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে চলতে থাকবে।এতে করে বৃদ্ধরা যে শান্তি পাবে তা বিশেষভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

সন্ন্যাস

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সমস্ত মোহাদি আবরণ ও পক্ষপাতত্যাগ করা। সন্ন্যাসী তাঁকেই বলে যিনি সমস্ত কুকর্ম ও নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যান এবং বৈরাগ্যবান হয়ে পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করেন [ঋ০ ৯।১১৩।১-১১, মনু০ ৬।৩৩-৮৫] । যিনি ধন, পুত্র এবং যশের ইচ্ছা থেকে ওপরে উঠে গেছেন, তিনি নির্ভয় হয়ে সমস্ত জায়গায় ধর্মের প্রচার করেন। অধর্ম, অন্যায়, অত্যাচারের ঘোর বিরোধিতা করেন। যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেম-দৃষ্টি রাখেন। এমন সত্যিকারের সন্ন্যাসীর সংখ্যা যত অধিক হবে তত তাড়াতাড়ি সংসারের ভালো এবং উদ্ধার হবে।

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য কি?
সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল সমস্ত মন্দের ত্যাগ।সন্ন্যাসী হল সেই ব্যক্তি যিনি সর্বদা সমস্ত খারাপ কাজ ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যান ও পরোপকারে মগ্ন থাকেন, যিনি সম্পদ, পুত্র ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠেন,যিনি নির্ভয়ে সর্বত্র ধর্ম ও অধর্মের প্রচার করেন,অন্যায় ও অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করে,যিনি সকল প্রাণীকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, যে চক্রবর্তী রাজাকে অধর্ম করতে দেখে তাকেও তিরস্কার করতে পারে।এই ধরনের সত্য সন্ন্যাসীদের সংখ্যা যত বেশি হবে, পৃথিবীর সংস্কার ও মুক্তি তত তাড়াতাড়ি হবে।

বেদ

আমি কে?
আমার উৎপত্তি কই থেকে?
আমাকে কেন সৃষ্টি করা হলো?

এইধরনের বহু প্রশ্ন শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনে উৎপন্ন হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ধরনের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া রয়েছে ঈশ্বরীয় গ্রন্থ পবিত্র **বেদে**।
যেভাবে একটি বস্তু যখন আমরা ক্রয় করার সময় বস্তুর সাথে একটি ব্যবহার বিধি পেয়ে থাকি, যেভাবে একটি রাষ্ট্র তথা সংগঠন পরিচালনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংবিধান থাকে তদ্রুপ এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জগৎ পৃথিবীর ব্যবহার বিধি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এই ব্যবহার বিধির নামই হলো পবিত্র বেদ।
বেদ শব্দটি "বিদ্" ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। "বিদ্" ধাতুর অর্থ - জানা।
সেইজন্য বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ - জ্ঞান বা বিদ্যা দুই প্রকার পরা এবং অপরা। অলৌকিক জ্ঞান হলো পরাবিদ্যা। জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান হলো অপরা বিদ্যা। বেদে পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যাই স্থান পেয়েছে সেই জন্য বেদকে সর্ব জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের বেদত্ব ওই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য। পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ।
বৈদিক সংস্কৃত "বিদ্" ধাতুর চারিপ্রকার অর্থ হয়-

বেত্তি বেদ বিদ্ জ্ঞানে,বিন্তে বিদ্ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ্ সত্তায়াং, লাভে বিদন্তি বিন্দতে।।

এই চারপ্রকার অর্থ হলো -
(১) জানা
(২) বিচার করা
(৩) অবস্থান করা
(৪) লাভ করা

যা পাঠ করলে মানুষ সত্য জানতে পারে, সত্য এবং অসত্যের বিচার করতে পারে, প্রকৃত বিদ্বান হতে পারে, প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করতে পারে, তার নাম বেদ।
বেদ শব্দের দুই অর্থ - মুখ্য ও গৌণ। ইহার মুখ্য অর্থ হল জ্ঞান রাশি, আর গৌণ অর্থ হল শব্দরাশি। বৈদিক জ্ঞান রাশি আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশির সাহায্যে। এই বেদজ্ঞান কোন সাধারণ জ্ঞান নয়। এক অতীন্দ্রিয় অপৌরুষের জ্ঞান। ঝর্ণা ধারার মত স্নিগ্ধ এ জ্ঞান জীব কল্যাণে নেমে এসেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। পৃথিবী কীভাবে পরিচালিত হবে তার একটি নির্দেশিকাই বেদ। বেদ নৈমিত্তিক (প্রয়োজনার্থক) জ্ঞান। বেদ হলো বৈদিক সংস্কৃতির মূলাধার। এই সংসার রুপ সাগর পারের জন্য বেদ হলো নৌকা স্বরূপ। বেদে মনুষ্য জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে। অজ্ঞানতার অন্ধাকারে পতিত মানুষের জন্য বেদ প্রকাশস্তম্ভ। ভুল পথে গমনকারী লোকের জন্য বেদ সত্য মার্গ দেখায়। পথভ্রষ্টকে কর্তব্য জ্ঞান প্রদান করে। আধ্যাত্ম পথের পথিক এর জন্য প্রভু প্রাপ্তির সাধনার উপদেশ দেয়। সংক্ষেপে বেদ অমূল্য রত্ন ভান্ডার।

বেদের আবির্ভাব কিভাবে হলো?

বিভিন্ন মতবাদে আমরা দেখতে পাই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় গ্রন্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নতুবা তাদের স্বমতের স্রষ্টা কিংবা স্রষ্টার দূত তাদের পৃথিবীতে এসে এই জ্ঞান বলে গিয়েছে। কিন্তু সনাতন বৈদিক ধর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর নিরাকার, সর্বব্যাপক, কায়হীন [যজুর্বেদ ৪০।৮]। সুতরাং ঈশ্বর সরাসরি মানবকে পৃথিবীতে এসে বা মুখে বলে জ্ঞান প্রদানের বিষয়টি ভ্রান্ত।

তাহলে ঈশ্বর কাকে বেদের জ্ঞান দিলেন?

ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে চতুর্ঋষিকে বেদজ্ঞান প্রদান করলেন কারণ এই জ্ঞান ছাড়া তাঁরা কিছুই শিখতে পারতেন না এবং বুঝতে পারতেন না কি কাজ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিখানোর কেউ না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লিখতে পড়তে শিখতে পারব না।

সেই চারজন ঋষি কে কে?

অগ্নি ঋষি - ঋগ্বেদ
বায়ু ঋষি - যজুর্বেদ
আদিত্য ঋষি - সামবেদ
অঙ্গিরা ঋষি - অথর্ববেদ

তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তে ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্যাৎ সামবেদঃ।
[শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।৮।৩]
অর্থঃ সেই তপস্বী ঋষির মাধ্যম দ্বারা পরমাত্মা অগ্নি থেকে ঋগবেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং সূর্য থেকে সামবেদ প্রকট করেছেন।
অঙ্গিরা ঋষির নাম অথর্ববেদের সাথে এসেছে।
যদথর্বাঙ্গিরসঃ স য় এবম্ বিদ্বানোথর্বাঙ্গিরসো অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। [শতপথ ১১।৫।৬।৭।]
এবং
বা অরেস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বাসতমতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহর্থবাঙ্গিরসঃ [শতপথ ১৪।৫।৪।১০]

প্রশ্নঃ এই ঋষিগণ কিভাবে বেদজ্ঞান পেয়েছিলেন??

উত্তরঃ ঈশ্বর তাঁদের অন্তরাত্মায় এই জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

প্রশ্নঃ এটি কিভাবে সম্ভব? বিষয়টি কি অলৌকিক নয়?

উত্তরঃ মোটেও না। যেহেতু ঈশ্বর সর্বব্যাপক তাই সেই অগ্নি আদি ঋষিগণের আত্মায়ও তিনি বিরাজিত ছিলেন। তাই এভাবে ব্রহ্ম তাঁর সর্বব্যাপী গুণের মাধ্যমে ঋষিদের হৃদয়ে বেদজ্ঞান প্রদান করেছেন।

প্রশ্নঃ ঋষিগণ কোন স্থানে বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

উত্তরঃ ত্রিবিষ্টপ বা আজকের ভাষায় তিব্বতে।

প্রশ্নঃ এর কি কোন প্রমাণ আছে?

উত্তরঃ এটি অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে নির্ণয় হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে যেহেতু একটি মহাপ্রলয় হয়েছিলো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান জল দ্বারা নিমগ্ন ছিলো, সেখানে তিব্বত উঁচু স্থান হওয়ার কারণে সেখানে জল পৌঁছাতে পারে নি। তাই বোঝাই যাচ্ছে সেখানে নিশ্চই জনবসতি ছিলো।

প্রশ্নঃ জনবসতিতে তো অনেক মানুষই ছিলেন। তাহলে শুধু এই ৪ ঋষিই কেন বেদজ্ঞান পেয়েছেন?

উত্তরঃ আপনি যদি কোন সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য না হোন তাহলে কি সেই সার্টিফিকেট আপনি পাবেন নাকি যে যোগ্য সে পাবে? অবশ্যই যে যোগ্য সে পাবে। একই ভাবে সনাতন মতানুযায়ী সৃষ্টি শুধু এটিই প্রথম ও শেষ নয়। এরপূর্বেও কল্পনাতীত জগত সৃষ্টি ও ধ্বংশ হয়েছে। সুতরাং পূর্ব কল্পের এই ৪ ঋষি পূণ্যাত্মা এবং বেদজ্ঞান পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন বলেই ঈশ্বর এই কল্পে তাঁদের পরমপবিত্র বেদজ্ঞান দান করেন।

বেদ হলো সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান যাতে মানুষের জন্য উপযোগী সকল প্রকারের জ্ঞান এবং জীবনযাপনের সঠিক বিধি নির্দেশিত হয়েছে।

চারবেদ

পরমাত্মা যেমন নিত্য তাঁর জ্ঞান এই বেদও নিত্য। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা জানার জন্য একই বেদ চারভাগে বিভক্ত হয়েছে- ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। চারবেদে যথাক্রমে চারি, বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যথা- বিজ্ঞান, কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। ঋচ্ ধাতুর অর্থ স্তুতি করা অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করা; যে বেদের সর্ব পদার্থের স্তুতি অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করা হয়েছে তাই 'ঋগ্বেদ'। যজ্ ধাতুর অর্থ দেব পুজা, সঙ্গতি করণ ও দান। যে বেদে মোক্ষ সাধনা ও ইহলৌকি ব্যবহার অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের বিধান প্রকাশিত হয়েছে তাই 'যজুর্বেদ'। যাতে জ্ঞান ও আনন্দের উন্নতি হয় তাই 'সামবেদ'। থর্ব অর্থে সচল এবং অথর্ব অর্থে অচল ব্রহ্ম; যাতে অচল ব্রহ্মের জ্ঞান ও সংশয়ের দোদুল্যমান অবস্থার সমাপ্তি হয় তাই 'অথর্ব' বেদ। ছন্দ, অথর্বাঙ্গিরস ও ব্রহ্মবেদ এগুলি অথর্ববেদেরই নাম।

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো ৩ সত্ত্বা তথা পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতি। এখানে বর্ণিত হয়েছে ঈশ্বরের হাজারো গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান। তাছাড়া আছে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, গণিত, গ্রহ বিজ্ঞান, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি। আবার বস্তুর ক্ষেত্রবিশেষে ফিজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করে এই বেদ। ঋগ্বেদের মন্ত্র সংখ্যা ১০৫৫২ টি। এক বা একাধিক মন্ত্রগুলো একত্রে সূক্ত তৈরি করে। একাধিক সূক্তের সমষ্টি হলো মণ্ডল। সেই বেদ মণ্ডল নামক ১০ টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি মণ্ডল সূক্ত নামক ১০২৮টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত।

যজুর্বেদ

মানুষের মনোজাগতিক বিভিন্ন দিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও কর্তব্য নিয়ে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য, উপাসনা পদ্ধতি দিয়ে আলোচনা করে যজুর্বেদ। মানুষের আত্মিক উন্নয়ন সাধন করে তাকে জীবনের পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভের জন্য করণীয় কার্যবিধি আলোচিত হয়েছে। যজুর্বেদ এর ৪০টি অধ্যায়। মোট মন্ত্রসংখ্যা **১৯৭৫** টি।

সামবেদ

প্রধানত জীবন-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি এবং মোক্ষ লাভের জন্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের কথা বলা আছে। সৃষ্টির বর্ণনা, ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জনের কথা বলা হয়েছে এই বেদে। সামবেদের ২ টি ভাগ- পূর্বার্চিক [মহানাম্নী আর্চিক পূর্বার্চিকেরই অংশ] এবং উত্তরার্চিক। মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১৮৭৫। সামবেদের উদ্ধৃতি দেয়ার তিনটি উপায় আছে। প্রথমত, সরাসরি মন্ত্রের সংখ্যা। দ্বিতীয়ত, আর্চিক লিখে প্রপাঠক, অর্ধপ্রপাঠক, দশতি, মন্ত্র এই চার সংখ্যার। তৃতীয়ত, অধ্যায় খণ্ড মন্ত্র ভিত্তিক।

অথর্ববেদ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, গাণিতিক জ্যোতিষ বিদ্যা, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, চিকিৎসা বিদ্যা [বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব, করে শল্য এবং ভেষজ চিকিৎসা] কৃষি, কারিগরি, যুদ্ধ বিদ্যা, বিমান বিদ্যা, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রধান আলোচ্য বিষয়। অথর্ববেদ বেদ, ব্রহ্মবেদ বিভক্ত। এর মন্ত্রসংখ্যা ৫৯৭৭। ও বলা হয়। এটি ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত।

বেদের আয়তন ও মন্ত্রসংখ্যা

১|ঋগ্বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ১০৫৫২। সমস্ত ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে, ৮৫ অনুবাকে ও ১০২৮ সূক্তে বিভক্ত। ঋগ্বেদকে অন্য ভাবেও বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন-অষ্টক ৮, অধ্যায় ৬৪ ও বর্গ ১০২৪।

২|যজুর্বেদের মোট মন্ত্র সংখ্যা ১৯৭৫ এবং সাম বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১৮৭৫।

৩|সামবেদ ৩ ভাগে বিভক্ত, যথা পূর্বার্চিক, মহানাম্নীআর্চিক ও উত্তরার্চিক। মহানাম্নী আর্চিককে পূর্বার্চিকের মধ্যেই ধরা হয়। পূর্বার্চিক ৪ কাণ্ডে বিভক্ত, ৪ কাণ্ড ৬ প্রপাঠক বা ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রপাঠক অর্দ্ধ প্রপাঠক ও দশতিতে বিভক্ত। উত্তরার্চিক ২১ অধ্যায় ও ৯ প্রপাঠক। এই প্রপাঠকগুলিতে অর্ধ প্রপাঠক আছে, দশতি নাই কিন্তু সূক্ত আছে।

৪|অথর্ববেদের মন্ত্রসংখ্যা ৫৯৭৭। অথর্ববেদে ২০ কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলি ৩৪ প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহাতে ১১১ অনুবাক্, ৭৭ বর্গ ও ৭৩১ সূক্ত।

অর্থাৎ, চার বেদের সর্বমোট মন্ত্রসংখ্যা হলো
১০৫৫২+১৯৭৫ +১৮৭৫+৫৯৭৭ = ২০৩৭৯ টি।

বৈদিক শাস্ত্রসমূহঃ

উপবেদ

উপবেদ হল চারটি।
সেগুলো হল আর্য়ুবেদ, ধনুর্বেদ,গন্ধর্ববেদ ও অর্থবেদ।

(ক) ***আয়ুর্বেদ***

আর্য়ুবেদ হলো ঋগ্বেদের উপবেদ এবং এতে শরীর রক্ষা এবং সুস্থ রাখার উপায়, ওষুধের গুণ এবং রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা আছে। বর্তমানে আর্য়ুবেদের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা প্রসিদ্ধ।

(খ) ***ধনুর্বেদ***

ধনুর্বেদ হলো যজুর্বেদ এর উপবেদ এবং এতে তীর ধনুক চালানো ইত্যাদির কলাকৌশল বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) ***গন্ধর্ববেদ***

গন্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ এবং এতে রয়েছে সঙ্গীত বিষয়ক বিদ্যা।

(ঘ) ***অর্থবেদ***

অর্থবেদ বা স্থাপত্যবেদ হলো অথর্ববেদের উপবেদ, যার মধ্যে শিল্প শাস্ত্রের বিষয় আছে।

বেদের অর্থ বুঝতে সহায়তা পাওয়া যাবে কোন গ্রন্থে

বেদের সর্বপ্রাচীন ভাষ্য হলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যেগুলো মহীদাস ঐতরেয়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল-

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ - **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ , কৌষীতকি, শাঙ্খ্যায়ন**

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ - **শতপথ ব্রাহ্মণ , তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ)**

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ - **তণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ষড্বিংশ, ছান্দোগ্য বা মন্ত্রব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, জৈমিণীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ।**

অর্থববেদীয় ব্রাহ্মণ- **গোপথ ব্রাহ্মণ।**

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রয়েছে গুরু শিষ্যের বার্তালাপ তথা প্রশ্নোত্তর। এই প্রশ্নোত্তরের বেশকিছু অংশ গুলো উপনিষদ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে আর্য্যাবর্তের মহান রাজর্ষি, মহর্ষিগণের ইতিহাস। তাছাড়াও রয়েছে আধ্যাত্মিক আলোচনা। ব্রহ্ম নিয়ে বিশদ্ আলোচনার কারণে এই গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। তাই এখানে ঈশ্বর তথা ব্রহ্ম নিয়ে বহু চর্চা পাওয়া যায়।

ষড়দর্শনঃ

উপাঙ্গ কে দর্শন শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। উপাঙ্গ হলো ছয়টি যেগুলোতে আত্মা, পরমাত্মা, প্রকৃতি, জগতের উৎপত্তি ও মুক্তি ইত্যাদি কঠিন প্রশ্ন নিয়ে গঠনমূলক ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। বেদভিত্তিক ভারতীয় আস্তিক দর্শন শাস্ত্রের সংখ্যা মূলত ৬টি। এগুলোকে একত্রে ষড়দর্শন বলে। এগুলো হল-

সাংখ্য দর্শন - মহর্ষি কপিল

যোগদর্শন - মহর্ষি পতঞ্জলি

ন্যায়দর্শন - মহর্ষি গৌতম

বৈশেষিক দর্শন - মহর্ষি কণাদ

পূর্ব-মীমাংসা দর্শন - মহর্ষি জৈমিনি

উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন বা শারীরিক সূত্র - মহর্ষি ব্যাসদেব

বেদাঙ্গ কয়টি ও কি কি?

বেদাঙ্গ ছয়টি।। যথাঃ

শিক্ষা - বর্ণ পরিচয়, বর্ণের উচ্চারণ, সঠিক প্রয়োগ ইত্যাদি।

কল্প - গৃহ্য [গার্হস্থ্য সংস্কারযজ্ঞ], শ্রৌত [বৃহৎ যজ্ঞ], শূল্ব [পরিমিতি ও জ্যামিতি], ধর্ম [পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন] সম্পর্কিত বিধিবিধান সূত্রাদি।

ব্যাকরণ - শব্দের উৎপত্তি, লিঙ্গ, কাল, সমাস, প্রত্যয়, পুরুষ ও ভাষার পদ বিশ্লেষণ-সংকলনাদি বিষয়ের জ্ঞান।

নিরুক্ত - শব্দার্থ কোষ, শব্দের নির্বচন, শব্দের অর্থ।

ছন্দ - মন্ত্র বা বাক্যের ছন্দ বিষয়ক

জ্যোতিষ - যজ্ঞাদির জ্যোতির্জ্ঞাননির্ভর কাল পরিমাপ, গ্রহ ও নক্ষত্র বিষয় বিদ্যা।

এগুলো অধ্যয়ন করলে বেদ বুঝতে সহায়তা পাওয়া যায়। শিক্ষায় হয়েছে পাণিনীয় শিক্ষা, যাজ্ঞবল্ক শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা। ব্যাকরণ গ্রন্থের মধ্যে পাণিনি মুনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী এবং এর ভাষ্য পতঞ্জলি মুনিকৃত মহাভাষ্য প্রসিদ্ধ। যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্ত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং উপযোগী। পিঙ্গলমুনিকৃত ছন্দশাস্ত্র অনেক প্রসিদ্ধ।

ঋষিকৃত উপনিষদ কয়টি ও কি কি?

সেগুলোতে কোন বিষয় নিয়ে বর্ননা করা হয়েছে?

উপনিষদের উৎপত্তি 'উপ্' ধাতু থেকে যার অর্থ নিকটে বসবাস। উপনিষদের অর্থ হচ্ছে - গুরুর নিকটে বসে সেই জ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়ে আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি এবং দুঃখের শেষ হয় । বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার মুকুটরূপ এই গ্রন্থসমূহ। যদিও বর্তমানে প্রায় ১৫০ এর বেশি উপনিষদ পাওয়া যায় কিন্তু প্রামাণিক ঋষিকৃত উপনিষদ ১১ টি। সেগুলো হলো -

ঈশোপনিষদ - যজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায়

কেনোপনিষদ - সামবেদীয় তবলকার ব্রাহ্মণের অংশ

প্রশ্নোপনিষদ - অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ শাখা

মাণ্ডুক্য উপনিষদ - ঐ

মুণ্ডক উপনিষদ - ঐ

ঐতরেয় উপনিষদ - ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪-৬ খণ্ড

তৈত্তিরীয় উপনিষদ - যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার আরণ্যকের ৭-৯ প্রপাঠক

কঠোপনিষদ - যজুর্বেদ কঠ শাখান্তর্গত

ছান্দোগ্য উপনিষদ - সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষের প্রপাঠক

বৃহদারণ্যক উপনিষদ - যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪ তম কাণ্ডের শেষ ৬ অধ্যায়

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ - যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত

ঋষিরা বেদ এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন, যা পরম বিদ্যা প্রাপ্ত করায়।

আরণ্যকঃ

বেদের জ্ঞানতত্ত্ব তথা আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করে যে গ্রন্থসমূহ তাই আরণ্যক। এখানে দ্রব্যযজ্ঞকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরণ্যকসমূহ মূলত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহেরই নির্বাচিত অংশবিশেষ। এই

আরণ্যক গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, শাঙ্খ্যায়ন, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ, কৌষিতকী ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ।

স্মৃতিঃ

বেদ বর্ণিত আচরণসমূহকে বিশ্লেষণ করে আপ্ত মহাপুরুষ দ্বারা রচিত আইনসমূহই হলো স্মৃতি শাস্ত্র। নানা স্মৃতি প্রচলিত থাকলেও মহর্ষি মনু রচিত মনুস্মৃতিই প্রধান। এতে ১২টি অধ্যায় আছে। প্রচলিতভাবে ২৬৭৫ টি শ্লোক থাকলেও উক্ত ১২।৯৫,৯৬ শ্লোক অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে প্রকৃত বেদানুকূল শ্লোক মূলত ১২১৪টি।

নীতিঃ

দর্শনের একটি শাখা যেখানে নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাত্ত্বিক দিকগুলো, যেমন - ভাল-মন্দের সংজ্ঞা এর সাথে প্রায়োগিক দিক, যেমন - মানুষের ভাল বা মন্দ ব্যবহারের সংজ্ঞাও এর আলোচ্য বিষয়। মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য বৈদিক নীতিশাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বিদুরনীতি , চাণক্যনীতি, ভর্তৃহরি নীতি।

ইতিহাসঃ

যে সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার মহান ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে তাদের ইতিহাস গ্রন্থ বলা হয় । প্রাচীন মনীষী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবন থেকে ভালোমন্দ শিক্ষা নেয়াই এই ইতিহাসের উদ্দেশ্য । বেদেও সামগ্রিক ইতিহাস থেকে বা পূর্বজ ঋষিগণ থেকে শিক্ষালাভের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। আমাদের পূর্বজদের ইতিহাস নানা স্থলে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ বা উপনিষদেও ঋষিদের কথোপকথনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। কাব্যের আলোকে সাজানো আমাদের দুই বিখ্যাত বৃত্তান্ত আমরা জানি-

১। **রামায়ণ** [মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী]

২। **মহাভারত** [প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দুই রাজবংশ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যকার ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস । এছাড়া পরমযোগী যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর উল্লেখযোগ্য কথন পাওয়া যায় এতে]।

রামায়ণ ও মহাভারতের বর্তমান পাণ্ডুলিপির একটা বড় অংশ প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরবর্তীতে সংযোজিত। নানা গবেষণা ইনস্টিটিউট এসব আঞ্চলিক পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করে মূল বা শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের আদিপর্বেই উল্লেখ রয়েছে যে, ব্যাসদেব ২৪ হাজার শ্লোকে মূল মহাভারত রচনা করেন, অথচ বর্তমানে অঞ্চলভেদে পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষেরও অনেক বেশি শ্লোক পাওয়া যায় যা নিঃসন্দেহেই পরবর্তীতে সংযোজিত।

রামায়ণের সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতেও উত্তর কাণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, এবং আদি বা বালকাণ্ডকেও আলাদা কাণ্ড হিসেবে পাওয়া যায় না।

এছাড়া মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ ৭০০ শ্লোক ও ১৮ অধ্যায় বিশিষ্ট **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**, যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন শাস্ত্রের এক অনন্য উদাহরণ ।

ধর্মগ্রন্থ কয়টি এবং কোন কোনটি প্রামানিক?

আগেই বলা হয়েছে, সবচেয়ে অধিক এবং প্রমাণযোগ্য ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। যে পুস্তকে বেদ বিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া যায় সে পুস্তক মান্য করার যোগ্য নয়। ধূর্ত স্বার্থলোভী লোকেরা মহান ঋষিদের নাম দিয়ে পুস্তক লিখেছে তথা ভালো গ্রন্থ সমূহে ভুল জিনিস মিশিয়ে দিয়েছে যার কারণে কোন অংশ আসল কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত তা বুঝা কঠিন হয়ে পড়েছে তবুও ভেবেচিন্তে পড়লে বুঝা যাবে। ধর্ম শাস্ত্র এবং স্মৃতিসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান মনুস্মৃতির, যেটাকে মনু মহারাজ বেদের

ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন। কিন্তু যুগে যুগে এতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে, এজন্য প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো বাদ দিয়ে বেদানুকুল বিষয়গুলো মান্য করা উচিত। আজকাল বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, বৌধায়ণ, হরিত, যম, পরাশর প্রভৃতি নামেও অনেক স্মৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলোর ভালো কথা গুলো মনুস্মৃতি তে পাওয়া যায় এবং এগুলোর অনেক কথা বেদ ও স্মৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায় এগুলোকে ঋষিকৃত মান্য করা যায় না। আপস্তম্ব, পারস্কর, আশ্বলায়ন, গোভিল, জৈমিনী, সাংখ্যায়ন কৃত গৃহ্যসূত্রও পাওয়া যায়। যেগুলোতে ধর্মীয় রীতিসমূহের প্রতিফলন হয়েছে। এগুলো কে প্রায় স্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বেদ বিরুদ্ধ ভাগ বাদে সুপ্ত গ্রন্থ সমূহ সংস্কার তথা আশ্রম ধর্মের বিষয়ে উপযোগী। বেদের শাখা তথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় যেগুলোকে খুঁজে বের করা জরুরি।

সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, এর প্রমাণ কি?

বেদই হলো একমাত্র শাস্ত্র যা সরাসরি ঈশ্বর প্রদত্ত। অন্য সকল শাস্ত্র সে হোক উপনিষদ, দর্শন, ইতিহাস সবই মনুষ্য তথা ঋষিরচিত গ্রন্থ। এছাড়া সকল ঋষি প্রণীত গ্রন্থই বেদের মহিমামণ্ডন করে এবং বেদকেই পরমপ্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে। ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন করেই এই সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন।

- **বেদোখিলো ধর্মমূলম্।** [মনুসংহিতা ২।৬]
  অর্থঃ বেদ হল হল ধর্মের মূল। ধর্মের বিষয়ে বেদ স্বতঃ প্রমাণ।
- যে ধর্মের জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায় তাঁর জন্য পরম প্রমাণ বেদ। [মনুসংহিতা ২।১৩]
- বেদ পিতৃ, দেব, মনুষ্য সকলের জন্য সনাতন মার্গদর্শক চোখের সমান। [মনুসংহিতা ১২।৯৪]
- বেদ সকল জ্ঞানের ভান্ডার। [মনুসংহিতা ২।৭]
- কোনো ব্রাহ্মণ যদি তপস্যা করতে চায় তাহলে সেই ব্রাহ্মণ যেন বেদ অভ্যাস করে, বেদ অভ্যাসই হলো ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা। [মনুসংহিতা ৬।৩৭]
- বেদ হতে উৎকৃষ্ট=শ্রেষ্ঠ আর কোনো শাস্ত্র নেই। [অত্রিস্মৃতি ১৫১]
- বেদের অধ্যয়ন করে মানুষ শীঘ্রই দুঃখ থেকে মুক্তি পায়, সে পবিত্র ধর্মের আচরণ করে এবং স্বর্গলোকের মহিমা প্রাপ্ত হয়। [বৃহস্পতি স্মৃতি ৭৯]
- যে মনুষ্য বেদে শ্রদ্ধা রাখে না, তাকে এই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিৎ নয়। যার বোধের জন্য অধিক পিপাসা তথা যে জিজ্ঞাসু শরণে আসে তিনিই শোনার অধিকারী। [মহাভারত শান্তিপর্ব ৩০৮।৩২]
- বেদ পরম প্রমাণ। [ন্যায় দর্শন ২।১।৬৭]
- শ্রুতি বিরুদ্ধ কুতর্ককারীরা কখনোই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন না। বেদ পৌরুষের নয়, কেননা বেদের রচয়িতা কোনো পুরুষ নয়। জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি হওয়ায় সে সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার বেদ রচনা করতে অসমর্থ। বেদ মনুষ্য রচনা না হওয়ায় বেদ অপৌরুষেয়। [সাংখ্য দর্শন ৫।৪৬, ৫।৫১, ৬।৩৪]
- **স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।।**
  অর্থঃ সেই ঈশ্বর পূর্বে উৎপন্ন গুরুদেরও গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা, তাঁর কারণ হলো কালের দ্বারা তিনি কখনো মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।। [যোগদর্শন ১।২৬]
- **শাস্ত্র য়োনিত্বাৎ** [বেদান্ত দর্শন১।১।৩]
- **অতএব চ নিত্যত্বম্** [বেদান্তদর্শন ১।৩।২৯]
  এইসকল সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বরকে ঋগ্বেদাদি রুপ সর্ব জ্ঞানের কর্তা মেনে বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে।
- **চোদনালক্ষণোহর্থ ধর্মো।**
  অর্থঃ যা বেদবিহিত তাই ধর্ম আর যা বেদবিরুদ্ধ তা অধর্ম। [মীমাংসা দর্শন ১।১।২]

- শব্দের ব্যাবস্থাপনা মানবরচিত শাস্ত্রে শাশ্বত না কিন্তু তা পবিত্র বেদে শাশ্বত কেননা তা ঈশ্বরের বাণী। [মহাভাষ্য ৪।৩।১০১]
- পবিত্র বেদের কথা ও শব্দের ব্যাবস্থাপনা শাশ্বত এবং তা ঈশ্বর হতে প্রকাশিত। [মহাভাষ্য ৫।২।৫৩]

অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে বেদ যেহেতু অনেক সময় পূর্বে ঋষিরা প্রাপ্ত হয়েছে তাই কালের বিবর্তনে কি এতে প্রক্ষিপ্ততা আসে নি? অর্থাৎ নতুন কোন মন্ত্র কি যুক্ত হয় নি?

এর উত্তর হলো একদমই না। বেদের বিনাশ প্রয়াসকারী ম্যাক্সমূলার যখন ভারতে এসেছিলো তখন সে সনাতনীদের মূল হতে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো। সে খুব ভালোভাবেই জানতো সে সনাতনীদের মূলঅস্ত্র বেদকে যদি কোনভাবে ধ্বংস করা যায় অথবা এর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত যুক্ত করা যায় তাহলে তা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরীয় বাণীতে আর প্রক্ষিপ্ততা সংযুক্ত করার যোগ্যতা ম্যাক্সমূলারের কেন, কারোরই নেই। ম্যাক্সমূলার তার পুস্তক 'Lectures On The Origin And Growth Of Religion এ লিখেন, "**The texts of the Veda have been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word, or even an uncertain accent, in the whole of the Rig-Veda.**"

অর্থাৎ, "বেদসমূহ আমাদের হাতে এতোটাই নির্ভুলভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে যে এতে কোন পাঠভেদ পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয় নি।"

এবার জানা যাক এমন হওয়ার কারণ কেন?

(১) সংস্কৃত ২ প্রকার যথা **বৈদিক** ও **লৌকিক। বেদ** বৈদিক সংস্কৃতে রচিত। বেদকে জানার জন্য তথা তথা এর ভাষ্য করার জন্য আমাদের ৬ টি শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় যেগুলোকে একত্রে ষড়বেদাঙ্গ বলা হয়।

এখানে মূল বিষয় হলো নিরুক্তে ঋষি যাস্ক প্রায় সাড়ে ৫০০ টির মত বেদমন্ত্রের সরাসরি ভাষ্য করেছেন। এছাড়া বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্র ছন্দ তথা ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে। অনেক মন্ত্র তো অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যেও পাওয়া যায়।

(২) বেদমন্ত্রে উদ্ধৃত দেবতা, স্বর, ছন্দ এবং প্রত্যেক মন্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে **অনুক্রমণী** নামক শাস্ত্রে। যদি মূল বেদমন্ত্রে কোন গোঁজামিল করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা অনুক্রমণীতে গিয়ে ধরা পড়বে এছাড়া শাখাগ্রন্থ তো আছেই।

ধরা যাক ঋগ্বেদ **১।১।১.** এর দেবতা অগ্নি, ঋষি মধুচ্ছন্দ, ছন্দ গায়ত্রী।

এই মন্ত্র নিয়ে সর্বাণুক্রমণী নামক অনুক্রমণীতে লেখা আছে,

"অগ্নিম্ নব মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র"

[সর্বাণুক্রমণী **১।১**]

অর্থ- প্রথম সুক্তে অগ্নিকে সম্মোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ দেবতা অগ্নি। এর ঋষি মধুচ্ছন্দ বৈশ্বামিত্র।

এইভাবে অনেক অনুক্রমণী আছে যেখা ছন্দ, স্বর, ঋষি, অনুবাক ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

যেমন:সর্বানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, সুক্তানুক্রমণী, আর্ষানুক্রমণী, শৌনকানুক্রমণী, কাত্যায়ানুক্রমণী, ছন্দানুক্রমণী ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুক্রমণীতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

(৩) বেদমন্ত্র যেন সুরক্ষিত থাকে এজন্য আমাদের মহান ঋষিগণ বেদমন্ত্র বিভিন্ন বিকৃতপাঠের উপায় আবিষ্কার করেছিলেন যা ছিলো গাণিতিক সূত্রের মত। এগুলোকে পাঠ বলা হতো যেমন: সংহিতাপাঠ, ক্রমপাঠ, পদপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ, রুদ্রপাঠ, শিখাপাঠ, মালাপাঠ, রেখাপাঠ, ঘনপাঠ।

সংহিতাপাঠঃ

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃতিজম। হোতারং রত্নধাতমম্।।

পদপাঠঃ

অগ্নিম। ঈড়ে। পুরঃ হিতম্। যজ্ঞস্য। দেবম্। ঋত্বিজম্। হোতারম্। রত্নধাতমম্।

ক্রম: ১। ২। ৩। ৪...

জটাপাঠঃ

অগ্নিম ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম। অগ্নিম ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং। পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবং। দেবং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবম্।

ক্রম: ১-২। ২-১। ১-২। ২-৩। ৩-২। ২-৩

ক্রমপাঠ:

অগ্নিম্ ঈড়ে । ঈড়ে পুরোহিতম্ । পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য । যজ্ঞস্য দেবম্ । দেবম্ ঋত্বিজম্ । ঋত্বিজম্ হোতারম্ । হোতারম্ রত্মাধাতমম্

ক্রম: ১-২। ২-৩। ৩-৪। ৪-৫। ৫-৬। ৬-৭। ৭-৮

দণ্ড পাঠ:

অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্।

ক্রম: ১-২। ২-১। ১-২। ২-৩। ৩-২-১

রথ পাঠ:

অগ্নিম্ ঈড়ে যজ্ঞস্য দেবম্। ঈড়ে অগ্নিম্ দেবং যজ্ঞস্য। অগ্নিম্ ঈড়ে ঈড়ে পুরোহিতম্। যজ্ঞস্য দেবং দেবম্ ঋত্বিজম্।

ক্রম: ১-২-৩-৫। ২-১-৫-৪। ১-২-২-৩। ৪-৫-৫-৬

মালা পাঠ:

অগ্নিম ঈড়ে। ঋত্বিজং দেবম্। ঈড়ে পুরোহিতং। দেবং যজ্ঞস্য। পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। যজ্ঞস্য দেবং। পুরোহিতম্ ঈড়ে। দেবম্ ঋত্বিজম। ঈড়ে অগ্নিম্।

ক্রম: ১-২-৬-৫। ২-৩-৫-৪। ৩-৪-৪-৩। ৪-৫-৩-২। ৫-৬-২-১......

রেখা পাঠ:

অগ্নিম ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।

ক্রম: ১-২। ২-১। ১-২। ২-৩-৪। ৪-৩-২। ২-৩। ৩-৪.........

শিখা পাঠ:

অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্। যজ্ঞস্য দেবম্। দেবং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম......

ক্রম: ১-২, ২-১। ১-২-৩। ২-৩। ৩-২। ২-৩-৪। ৩-৪। ৪-৩। ৩-৪-৫

ঘনপাঠ:

অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য.......

ক্রম: ১-২। ২-১। ১-২-৩। ৩-২-১। ১-২-৩। ২-৩। ৩-২। ২-৩-৪। ৪-৩-২। ২-৩-৪ ৩-৪। ৪-৩। ৩-৪-৫। ৫-৪-৩। ৩-৪-৫। ১-২-৩-৫..........

এই সকল পাঠে ঘনপাঠ সবচেয়ে কঠিন। বলা হয় একজন ঘনপাঠী ব্রাহ্মণ একটি বেদমন্ত্রকে **১২-১৩** বার উচ্চারণ করেন। এই সকল আবিষ্কারের ফলে বেদ আজও অক্ষত। এইজন্য আমরা আমাদের মহান ঋষিদের নিকট ঋণী।

এই কারণেই পবিত্র বেদের বিস্ময়কর সংরক্ষণ পদ্ধতিকে; জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) বা ইউনেস্কো (UNESCO) "Master piece of the oral and intangible heritage of humanity" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন !!

বেদের 28000 পাণ্ডুলিপি রয়েছে আর এই পাণ্ডুলিপি মহারাষ্ট্রের পুনের ওরিয়েন্ট রিচার্চ ইন্সটিটিউটে নিরাপদ কেন্দ্রের ভাণ্ডারে রাখা হয়েছে। ঋগ্বেদের 30 পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ইউনেস্কো 1500 থেকে 1800 খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের এই 30 পাণ্ডুলিপির তথ্য সংগ্রহ করে সাংস্কৃতিক তথ্য কেন্দ্রে রাখে।

পবিত্র বেদের মন্ত্র সংখ্যা ২০,৪৩৪ টি নাকি ২০,৩৭৯ টি!!

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ। এর সংরক্ষন প্রণালী আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদদের কাছে এক বিস্ময়। তৎকালীন ঋষিদের নিখুঁত গাণিতিক সংরক্ষন পদ্ধতির কারনেই এই ব্যাপারটি যথেষ্ট প্রমাণিত যে আদিতে বেদের যত সংখ্যক মন্ত্র ছিল এখনো ততগুলো মন্ত্রই আছে। প্রতিটি মন্ত্রের উচ্চারণ রীতি পর্যন্ত এখনো অবিকৃত আছে যা অন্যান্য মতপথের ক্ষেত্রে অলীক স্বপ্ন কেবল। আর যুগযুগ ধরে বেদের একটি মন্ত্রের সামান্যতম পরিবর্তন না হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনেক পাশ্চাত্য বিদ্বানরাও অভিভূত হয়েছেন। তাঁরা প্রশংসা বর্ষণ করেছেন সেসব মুনি-ঋষিদের প্রতি যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন বেদ সংরক্ষণের অভূতপূর্ব সংরক্ষণ প্রণালী। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আলোচনা করবো বেদের সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা নিয়ে যা আমরা অনেকেই জানিনা। এই বিষয়ে আমরা অনেক উড়ো কথা শুনতে পাই। যেহেতু আমরা অধিকাংশই কখনো

বেদ চোখেও দেখিনি তাই অনেকে কল্পনা করে বলেন বেদে লক্ষ লক্ষ মন্ত্র, কেউ বলেন বেদ নাকি পুরো একটি লাইব্রেরীর সমান! কিন্তু এই জল্পনাকল্পনা সরিয়ে আমরা কখনো কি ভেবেছি চারবেদের মন্ত্রসংখ্যা আসলে কত? কেন এই ভিন্নতা? এর মূল কারণে রয়েছে চারবেদের পৃথক মন্ত্র সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি। মহর্ষি বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপির বিশ্বস্থ সংরক্ষণ করে। তাঁদের পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ঋগ, যজু, সাম ও অথর্বেদের মন্ত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১০৫৫২, ১৯৭৫, ১৮৭৫, ৫৯৭৭। তাই মোট মন্ত্রসংখ্যা হলো ২০৩৭৯।

আর্য সমাজের [বঙ্গ] ঋক, যজু, সাম ও অথর্ববেদের মন্ত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১০৫৮৯, ১৯৭৫, ১৮৯৩ ও ৫৯৭৭; অতএব চারবেদে মোট মন্ত্রসংখ্যা দাড়াল ২০৪৩৪।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যজু ও অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। মূলত ঋগবেদ ও সামবেদের মন্ত্রসংখ্যা নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এবার দেখে নেই কোনটি সঠিক?

আর্য সমাজের প্রকাশিত বেদে কি মূল পাণ্ডুলিপির চেয়ে বেশী সংখ্যক মন্ত্র বিদ্যমান?

বা মহর্ষি বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবই বা কম কেন?

দ্বিপদ মন্ত্র ও চতুষ্পদ মন্ত্র:

ঋগ্বেদে বেশকিছু দ্বিপদ মন্ত্র আছে যেগুলোকে কখনো কখনো চতুষ্পদ মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরকম ১৫৭টি দ্বিপদ মন্ত্র আছে যার মধ্যে ১৭টি নিত্য দ্বিপদ মন্ত্র ও বাকি ১৪০ নৈমিত্তিক দ্বিপদ মন্ত্র। এই ১৪০টি দ্বিপদ মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ১৪০/২=৭০টি চতুষ্পদ মন্ত্র। অর্থাৎ দুটি দ্বিপদ মন্ত্র মিলে একটি চতুষ্পদ মন্ত্র।

সায়ণাচার্য তাঁর ঋগবেদ ভাষ্যের ১।৬৫ তে লিখেছেন,

"১।৬৫-৭০ সূক্তে মন্ত্রগুলো মূলত দ্বিপদ মন্ত্র। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যখন বেদ শিক্ষা নিবে তখন সে চতুষ্পদ হিসেবে মন্ত্রগুলো শিখবে এবং যজ্ঞের ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলো দ্বিপদ মন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হবে।"

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এবং নিরুক্ততে এমনটাই বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদের মন্ত্র সংখ্যার সমস্যা সমাধান:

মহাঋষি বিশ্ববিদ্যালয় মূলত মন্ত্র গণনার ক্ষেত্রে দ্বিপদ হিসেবেই একটি মন্ত্র গণনা করে থাকে। তাঁরা ম্যাক্সমুলারের মুদ্রণের ত্রুটি সংশোধন করে বিশুদ্ধভাবে বেদের প্রকাশ করে। ফলে তাঁদের হিসেব অনুযায়ী ঋগ্বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০৫৫২।

আমরা মহর্ষি দয়ানন্দের ঋগভাষ্যের শুরুতে পাই তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্রসংখ্যা উল্লেখ করেছেন ১০৫৮৯। তিনি ভাষ্যের শুরুতে সকল মণ্ডলের মন্ত্র সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো যদি যোগ করি তাহলে পাই ১০৫২১ টি মন্ত্র (১৯৭৬+৪২৯+৬১৭+৫৮৯+৭২৭+৭৬৫+৮৪১+১৭২৬+১০৯৭+১৭৫৪)। এই ত্রুটির কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই:

তিনি ম্যাক্সমুলারের ছাপানো সংস্কৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। ফলে ঋগবেদ ১।৬৫-৭০ সূক্তের ৬০টি দ্বিপদ মন্ত্রকে তিনি ৩০টি চতুষ্পদ মন্ত্র হিসেবে ভাষ্য করেন। তাই ১ম মণ্ডলের মন্ত্র সংখ্যা হবে ১৯৭৬+৩০=২০০৬

তিনি ৮ম মণ্ডলের ২০নং সূক্তের মন্ত্র সংখ্যা ২৬ এর স্থলে ৩৬ লিখেছেন। সুতরাং ৮ম মণ্ডলের মন্ত্র সংখ্যা ১৭২৬ এর বদলে ১৭১৬ হবে।

তিনি ৯ম মণ্ডলের ১০৯নং সূক্তের ২২টি দ্বিপদ মন্ত্রকে ১১টি চতুষ্পদ মন্ত্র হিসেবে যোগ করেন। তাহলে ৯ম মণ্ডলের মন্ত্র সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০৯৭+১১=১১০৮।

এবার সবগুলো মণ্ডলের মন্ত্রসংখ্যা যোগ করুন, যোগফল দাঁড়াচ্ছে ১০৫৫২ (২০০৬+৪২৯+৬১৭+৫৮৯+৭২৭+৭৬৫+৮৪১+১৭১৬+১১০৮+১৭৫৪)। তিনি ঋগ্বেদের যে মন্ত্রসংখ্যা লিখেছেন "১০৫৮৯" তা ছিল মুদ্রণের ভুল।
আর সামবেদ ভাষ্য মহর্ষি দয়ানন্দ তৈরী করে যেতে পারেননি। তাছাড়া আর্য সমাজ বা মহাঋষি বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকাশনীর প্রকাশিত সামবেদে দেখতে পাই মোট মন্ত্র সংখ্যা ১৮৭৫, ১৮৯৩ নয়।
তাহলে পরিশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারবেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ১০৫৫২+১৯৭৫+১৮৭৫+৫৯৭৭=২০৩৭৯

বেদের দেবতা ও ঋষি

দেবতা

অনেক সনাতনী ও বিধর্মীদের বেদমন্ত্রে বর্ণিত দেবতা ও ঋষি বিষয়ে ভুল ধারণা রয়েছে।
সনাতনীরা মনে করেন মন্ত্রে বর্ণিত দেবতা হলো পুরাণে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শরীরধারী দেবতা। অথচ কিন্তু তা নয়। নিরুক্তে দেব বা দেবতা শব্দের অনেক গুলো অর্থ বিদ্যমান।
যেমনঃ
১| **দেবো দানদ্বা** - দান।
২| **দীপনা বা** - প্রকাশ বা দীপনতা, যেমন: সূর্যাদি নক্ষত্র
৩| **দৌতনাদ** - সত্য বচন ও উপদেশ প্রদান - ব্রাহ্মণ বা ঋষি বা বিদ্বান ইত্যাদি।
৪| **দ্যুস্থানো ভবতীতি বানিঃ** - বিশেষ স্থিতি লাভকারী, রাজা বা পণ্ডিত ইত্যাদি। [নিরুক্ত ৭।১৫]
তবে বেদমন্ত্রে দেবতা হলো মন্ত্রের বিষয়বস্তু।
যেমন ঋগ্বেদ ১।১।১ এর দেবতা হলো অগ্নি। মন্ত্রের প্রথম শব্দই অগ্নি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্রটি অগ্নিকে নিয়ে। যেমন শ্রদ্ধা সুক্তের দেবতা হলো শ্রদ্ধা। যজুর্বেদ ১৮।২৪ নং মন্ত্রে ঈশ্বর আমাদের গাণিতিক বিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন এই মন্ত্রের দেবতা হলো **'বিষমাঙ্কগণিত বিদ্যাবিদাত্মা'**। এটি যেমন কোন দেহধারী পুরাণবর্ণিত দেবতা নয় তেমন বেদের অন্যসকল দেবতাও তা নয়।

ঋষিঃ

বেদমন্ত্রে দেবতার সাথে আরেকটি বিষয় থাকে তা হলো ঋষি। অনেক পাশ্চাত্য বিদ্বানরা মনে করেন যে বেদমন্ত্রে বর্ণিত ঋষি হলেন উক্ত মন্ত্রের রচয়িতা। কিন্তু এটি তাদের স্বাধ্যায়হীনতার ফল।
ঋষিরা হলেন বেদমন্ত্রে দ্রষ্টা, সৃজনকর্তা না। যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের নির্মাণ করেন না বরং সেটিকে বিভিন্ন আকার দেন তেমনি ১টি নির্দিষ্ট বেদমন্ত্রে যে ঋষি কার্য করেন তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে মন্ত্রের সাথে তাঁর নাম লেখা হয়। যদিও এটি সংহিতাভাগের অন্তর্ভুক্ত না। ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মন্ত্রের অর্থ বিশেষভাবে দর্শন করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ২।৯।১ এ বলা হয়েছে, "**অজানহ বৈ পৃশ্নী স্তপস্যমানান্ব্রহ্ম স্বয়ভ্যভনষত্ত ঋষয়োঽভবন্তদৃষীংণামৃষত্বং তাং দেবতামুপতিষ্ঠন্ত যজ্ঞ কামাস্ত এতং ব্রহ্মযজ্ঞমপশ্যন্তমাহরন্তেনায়জন্ত**"
অর্থাৎ, কল্পের আদিতে পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট ঋষিগণ তপস্যা করেছেন। তাঁদের তপস্যা মাধ্যমে তাঁরা পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। তখনই সেই তপস্যাকরীরা **ঋষি** হয়েছেন।
তাও যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে ঋগ্বেদ ৯।৬৬।১৯ এই মন্ত্রের ঋষি হলো **'শতম্ বৈখানসঃ'** অর্থাৎ ১০০ জন ঋষি। তারমানে কি এই ছোট মন্ত্র ১০০ জন ঋষি মিলে নির্মাণ করেছেন? মোটেও তা নয়। বরং ১০০ জন ঋষি এতে কাজ করেছেন।
এইপক্ষে প্রমাণ কি?

ঋষিণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি [নিরুক্ত ৭।৩]
অর্থ: ঋষিদের নানা প্রকার দৃষ্টির তাৎপর্য এই যে, তাঁদের বৃহৎ পুরুষার্থ দ্বারা মন্ত্রের ঠিক ঠিক প্রকার সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষাৎকৃতধর্মোণ ঋষয়ো বভূবুস্তেহবরেভ্যোহসাক্ষাত্ কৃতধর্মস্য উপদেশেন মন্ত্রানসম্প্রাদু [নিরুক্ত ১।১৯]
অর্থঃ তপের বল দ্বারা যাঁরা ধর্মের সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরাই (ধর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ঋষি)। আর তাঁরাই যারা ধর্মের সাক্ষাৎ করে নি তাদের উপদেশ দিয়েছেন।

বেদ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে কী বলে ?
১। বেদের চেয়ে বড়ো কোনো শাস্ত্র নেই। [অত্রিস্মৃতি ১৫১]
২। যে দ্বিজ(ব্রহ্মচারী/ব্রাহ্মণ) বেদ না পড়ে অন্যান্য শাস্ত্র পড়ে পরিশ্রম করে,সে জীবনাবস্থাতেই নিজের কুলসহিত শুদ্রে পরিনত হয়। [মনুসংহিতা ২।১৬৮]
৩। বেদ সকল জ্ঞানের ভান্ডার। [মনুসংহিতা ২।৭]
৪। কোনো ব্রাহ্মণ যদি তপস্যা করতে চায় তাহলে সেই ব্রাহ্মণ যেন বেদ অভ্যাস করে,বেদ অভ্যাসই হলো ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা। [মনুসংহিতা ৬।৩৭]
৫। যজ্ঞের বিষয়ে,তপস্যার বিষয়ে, শুভ কর্মের জ্ঞানার্থ দ্বিজের জন্য বেদ পরম কল্যাণের সাধন। [যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৪০]
৬। শ্রুতি=বেদ এবং স্মৃতি এই দুটিকে ব্রাহ্মণের চোখ বলা হয়েছে। যদি এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি না থাকে তবে সেই ব্রাহ্মণ কাণা বলে বিবেচিত হবে এবং দুটোই যদি না থাকে তবে সে অন্ধ বলে বিবেচিত হবে। [অত্রিস্মৃতি ৩৫১]
৭। বেদের অধ্যায়ন করে মানুষ শীঘ্রই দুঃখ থেকে মুক্তি পায়, সে পবিত্র ধর্মের আচরন করে এবং স্বর্গলোকের মহিমা প্রাপ্ত হয়। [বৃহস্পতি স্মৃতি ৭৯]

প্রাচীন সমস্ত স্মৃতিকার, দর্শন শাস্ত্রকার, উপনিষদকার তথা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির লেখকেরা এমনকি পুরাণকারগণও বেদকে ঈশ্বরীয় তথা স্বতঃ প্রমাণ এবং অন্য সমস্ত গ্রন্থকে পরতঃ প্রমাণ বলেছেন।

দর্শন শাস্ত্রে বেদের মহত্ত্ব
ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্ত এই ছয় দর্শন শাস্ত্র যা গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং ব্যাসদেব রচিত। এই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে বেদের মহত্ত্বতার স্পষ্টততা স্বীকার করা হয়েছে।
(১) সূত্রে পরম আপ্ত পরমেশ্বরের বাণী এবং অসত্য, পরস্পর বিরোধী এবং পুনরোক্তি দোষরহিত হওয়ায় বেদকে পরম প্রমাণ হিসেবে সিদ্ধ করা হয়েছে। [ন্যায় দর্শনের ২।১।৬৭]
(২) এই সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বরের বাণী হওয়ায় আম্নায় অর্থাৎ বেদকে প্রামাণ্য বলা হয়েছে। [বৈশেষিক দর্শন ১০।১।৩]
(৩) বেদ বাক্য রচনা বুদ্ধিপূর্বক। এখানে সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কোনো কথা নেই।অতএব ইহা ঈশ্বরীয় জ্ঞান।
[বৈশেষিক দর্শন ৬।১।১]
(৪) শ্রুতি বিরুদ্ধ কুতর্ককারীরা কখনোই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন না। এই সূত্রের মাধ্যমে সাংখ্যকার বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন। [সাংখ্য দর্শন ৬।৩৪]
(৫) বেদ পৌরুষের নয়, কেননা বেদের রচয়িতা কোনো পুরুষ নয়। জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি হওয়ায় সে সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার বেদ রচনা করতে অসমর্থ। বেদ মনুষ্য রচনা না হওয়ায় বেদ অপৌরুষেয়। [সাংখ্য দর্শন ৫।৪৬]
(৬) সূত্রের দ্বারা বেদকে ঈশ্বরীয় শক্তি থেকে অভিব্যক্ত হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ মানা হয়েছে। [সাংখ্য দর্শন ৫।৫১]
(৭) সেই (ঈশ্বর) এর সর্বজ্ঞ হওয়া এতটাই নিমিত্ত যে তিনি ছাড়া আর কারোরই সেই ক্ষমতা নাই। [যোগ দর্শন ১।২৫]

(৮) ঈশ্বরকে এইভাবে সমস্ত জ্ঞানের স্তোত্র মেনে বলেছেন সেই (ঈশ্বর) যাঁর কাল বিভাগ নেই, তিনি পূর্ব ঋষিদের ও গুরু। [যোগ দর্শন ১।২৬]

অর্থাৎ, তিনি জগতের প্রারম্ভে বেদরুপী জ্ঞান দিয়ে মানুষকে শিক্ষিত করেছেন। এই দর্শন এটাই সিদ্ধ করে যে, বেদ হলো ঈশ্বরীয় জ্ঞান। বেদজ্ঞান দান করায় পরমেশ্বর কে আদি গুরু মানা হয়েছে।

(৯) বেদান্ত শাস্ত্রের কর্তা ব্যাসদেব "**শাস্ত্র য়োনিত্বাৎ**" [১।১।৩] তে তথা "**অতএব চ নিত্যত্বম্**"[১।৩।২৯] ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বরকে ঋগ্বেদাদি রুপ সর্ব জ্ঞানের কর্তা মেনে বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

"শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ"

উপরিউক্ত সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখেছেন→

"*ঋগ্বেদাদি যে চার বেদ আছে যা অনেক বিদ্যার দ্বারা যুক্ত, সূর্যের সমান সমস্ত সত্য অর্থের প্রকাশ করে,যা সর্বজ্ঞত্বাদী গুণযুক্ত পরমেশ্বরের বাণী, কেননা সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ছাড়া কোনো জীব সর্বজ্ঞ গুণযুক্ত এই বেদকে তৈরি করতে পারে না।*"

(১০) মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলছেন

"চোদনালক্ষণোঽর্থ ধর্ম"

বেদের আজ্ঞাই হল ধর্ম, এবং যা বেদবিরুদ্ধ তা অধর্ম।

[মীমাংসা দর্শন ১।১।২]

এই ভাবে সমস্ত শাস্ত্র একস্বরে বেদের নিত্যতা এবং স্বতঃ প্রমাণতা প্রতিপাদন করে।

মহাভারতের পরবর্তীকালে বেদের দূর্দশা:

মহাভারতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বেদবিদ্যা ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। মহাভারতের যুদ্ধই হয়েছিলো বেদবিদ্যার প্রতি অবহেলার কারণে। এই যুদ্ধে বহু বিদ্বানদের মৃত্যু হওয়ার ফলে বেদের জ্ঞানের অভাব দেখা গেলো। ধীরে ধীরে এই সময়ে বেদের নামে অবৈদিক প্রথা জন্ম নিলো। বৌদ্ধ ও জৈনের মতো দর্শন সনাতন ধর্মের বিশাল ক্ষতি করলো। সে তো ঈশ্বরের কৃপা যে শঙ্করাচার্য ও মহাত্মা কুমারিল ভট্টের মত মহাপুরুষগণ জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সনাতন ধর্মের রক্ষায় অবদান রাখলেও বেদ নিয়ে তেমন কার্য না করে প্রস্থানত্রী = উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা নিয়ে এবং মীমাংসাশাস্ত্র নিয়ে কার্য করেছেন। এরপরও দীর্ঘ সময় ধরে এসব কুপ্রথা যেমন বলি প্রথা, সতীদাহ, স্ত্রী ও শুদ্রের বেদাধিকার, মদ্যপান, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চলমান রইলো। সময়ে সময়ে যদিও বহু মহাপুরুষ যেমন রাজা রামমোহন রায়ের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো কিন্তু কেউই বেদ নিয়ে কার্য করেননি। মধ্যযুগে আচার্য সায়ণ ও মহীধরের বেদভাষ্যের মত ভূল ও বেদাঙ্গের প্রয়োগহীন ভাষ্য প্রণয়ন করার ফলে এই করুণ সময় চলমান থাকলো।

অবশেষে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতে জন্ম নিলেন **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী**। তিনি স্বামী বিরজানন্দজীর শ্রীচরণে বেদ ও বেদাঙ্গের গভীর অধ্যয়নের পর বেদের সঠিক, বেদাঙ্গ ও ব্যাকরণগত ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এই মহান কৃতির ফলে পুণরায় বেদের সঠিক অর্থ জনসাধারণ বুঝতে পারলেন।

মহর্ষি দয়ানন্দজীর ভাষ্যের বিশেষতা

(১) বেদের সকল শব্দ ধাতু থেকে তৈরি অর্থাৎ বেদের শব্দ যৌগিক এবং যোগারূঢ়, ধাতুর যতগুলি অর্থ হয় ততগুলি অর্থ ঐ সকল শব্দ সমূহের হয়ে যায়। রুঢ়ি শব্দ বেদে নেই, এই জন্য বেদে বিবিধ বিদ্যার বর্ণনা আছে।

(২) বেদে এক ঈশ্বরের পূজা, উপাসনার বর্ণনা আছে, অনেক গুণ পরমাত্মারও আছে, এই জন্য তাঁকে অগ্নি, বায়ু ইন্দ্রাদি অনেক নামে ডাকা হয়। যৌগিক প্রক্রিয়ায় আমি, বায়ু আদি শব্দের জীবাত্মা পরমাত্মা, শিক্ষক, নেতা, অগ্নি আদি অনেক অর্থ হয়ে থাকে।

(৩) বেদবর্ণিত দেবতা অভিমানী বা অধিষ্ঠাত্রী রূপে স্বর্গে বাস করেন। তাদের পরিবার আছে, হবিগ্রহণ করার জন্য স্বর্গ থেকে যজ্ঞ স্থলে নেমে আসেন ইত্যাদি মধ্যকালীন আচার্যগণের তা কেবল কল্পনামাত্র। প্রকৃত পক্ষে এমন নয়, কেননা পৃথিবীর উপর স্বর্গ নামের কোন লোক নেই, আজ পর্যন্ত অন্তরিক্ষের খোঁজে নিমগ্ন বৈজ্ঞানিকগণ এর কোন সংকেত পাননি। অতএব সুখ বিশেষকেই স্বর্গ বলা হয়।

(৪) বেদে দেশ, নদী-নগর বা রাজা মহারাজার ইতিহাস নেই। বেদে উল্লেখিত শব্দের রূঢ়ি (প্রসিদ্ধ) অর্থ স্বীকার করায় মধ্যকালীন আচার্যগণের ভ্রম হয়েছিল। মহর্ষি দয়ানন্দ স্পষ্ট করে দিয়েছেন বেদে রূঢ়ি শব্দ নেই বরং যৌগিক এবং যোগরূঢ় শব্দ আছে। কেননা বেদ জ্ঞান সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাপ্ত হয়েছে, ইতিহাস অনেক পরে লেখা হয়েছে।

(৬) মন্ত্রের অর্থের অনুকূল মন্ত্রের বিনিয়োগ হওয়া উচিত, মন্ত্রার্থ বিরোধী বিনিয়োগ হওয়া উচিত নয়।

(৭) বেদে পশুবলি, নরবলি, মাংস ভক্ষণ মদপানাদি তথা অশ্লীল চর্চাদি নিন্দনীয় কার্য সমূহের বর্ণনা নেই, তথা সৃষ্টির বিরূদ্ধও কোন বর্ণনা নেই।

(৮) বেদ কেবল কর্মকাণ্ডীয় গ্রন্থ নয়, বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদে ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিবিদ্যা, মুক্তি বিষয়, চিকিৎসা বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, পশু পালন বিদ্যা, গণিত বিদ্যা, রাজধর্ম, আদি ৩৫ বিদ্যার বর্ণনা আছে। যাহার উল্লেখ ঋষি দয়ানন্দ বেদভাষ্যের মধ্যে করেছেন।

(৯) বেদে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ আধিযাজ্ঞিকই নয়, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক অর্থও হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সকলকে পারমার্থিক তথা শেষ অর্থ সমূহকে ব্যাবহারিক প্রক্রিয়া দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে, যেখানে দুই প্রকার অর্থ সম্ভব সেখানে শ্লেষাঙ্কারের দ্বারা অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে- এই রূপ অনেক বিশেষতা সমূহের দ্বারা মহর্ষি দয়ানন্দ বেদ ভাষ্য প্রস্তুত করেছেন।

পবিত্র বেদের বৈজ্ঞানিকতা

অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভের্বদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরিপ্রদিক্ষণিদ্ বিশ্বায়বে নিশ্বিশ্নথঃ

[ঋগ্বেদ ১০।২২।১৪]

অর্থ: যদিও পৃথিবী হস্তপদহীন তবুও ইহা চলিতেছে। অবশ্যই জ্ঞাতব্য পরমাণু শক্তি দ্বারা সূর্যের চারদিকে ইহা প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে পরমাত্মন্! সমগ্র মানবের মধ্যে আস্তিক্যবোধ জাগাবার জন্যই তুমি এইরূপ রচনা করিয়াছো ।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরভ্নাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বমীবাধুক্ষদ্ধু-নিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমূদ্রম্

[ঋগ্বেদ ১০।১৪৯।১]

অর্থ: সূর্য রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নিরাধার আকাশে দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও ইহা সুদৃঢ় রাখিয়াছে। অচ্ছেদ্য আকর্ষণ রজ্জুতে আবদ্ধ, গর্জনশীল, গ্রহসমূহ নিরাধার আকাশে অশ্বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ।
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্

[ঋগ্বেদ ১।৩৫।২]

অর্থ: সূর্য আকর্ষনযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মাধ্যাকর্ষন স্বরূপ রথে চড়িয়া যেন সারা লোকান্তরকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছে।

দিশো নানাসূর্যাঃ [ঋগ্বেদ ৯।১১৪।৩]
অর্থ: সপ্ত দিকে অগণিত সূর্য রয়েছে।

দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধরা পরাবতঃ
দক্ষম্ তে অন্য আবাতু ব্যন্যো বাতু যদ্রপঃ
[অথর্ববেদ ৪।১৩।২]
অর্থ: এই দুই প্রাণ ও অপ্রাণ বায়ু (তোমার দেহে) প্রবাহিত হচ্ছে। এক আসছে সমূদ্র হতে, আরেক দূরের স্থান হতে । এক(প্রাণবায়ু) তোমার জন্য শক্তি নিয়ে আসে, আরেক (অপ্রাণবায়ু) তোমার দেহ হতে রোগ-পাপ বাহির করে।

যত্ ত্বা সূর্য স্বর্ভানু স্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ।।
[ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫]
অর্থ:- হে সূর্য যাকে তুমি তোমার নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করেছ (চাঁদ), তাঁর দ্বারা যখন তুমি আচ্ছাদিত হয়ে যাও, তখন আকস্মিক অন্ধকারে পৃথিবী ভীত হয়ে যায়।

সোমো ধধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তাসুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবুদদাত্।।
[ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৯]
অর্থ: সূর্য তাঁর কন্যা চন্দ্রকে নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করে।।
সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য।।
[যজুর্বেদ ১৮।৪০]
অর্থ:- চাঁদ সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়

এভাবেই পরমেশ্বর আমাদের এই অমূল্য বেদ নামক জ্ঞানের
ভাণ্ডার প্রদান করে উপকৃত করেছেন, যেভাবে একজন পিতা তার পুত্রদের জ্ঞান প্রদান করেন।

বেদ সর্বকালীন
অন্তি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥
[অথর্ববেদ ১০।৮।৩২]
অনুবাদঃ মানব নিকটবর্তী পরমাত্মাকে দেখেও না , তাকে ছাড়তেও পারে না । কিন্তু দেব পরমাত্মার বেদরূপ কাব্যকে দেখো । তা মরেও না , জীর্ণও হয় না ।
অর্থাৎ মানুষ সমীপবর্তী [অতি নিকটে, নিজ দেহে অবস্থিত] পরমাত্মাকে দেখেও না [ঈশ্বরকে দেখা যায় না], আবার সমীপবর্তী পরমাত্মাকে ছাড়েও না [পরমাত্মা হতে বহির্গামী হতেও পারে না, যেহেতু পরমাত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী], পরমাত্মা জীবের প্রত্যক্ষ না থেকেও যেমন সর্বসময়ে জীবের মধ্যে বিরাজমান এবং জীবের হৃদয়ে সদা বর্তমান থাকেন,

তেমনি পরমাত্মার কাব্য বেদ [ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা তথা পরাবিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা তথা জাগতিক জ্ঞান] কখনো মরে না [বিনাশ বা ধ্বংস হয় না], কখনো জীর্ণও হয় না [ক্ষয় হয় না, পুরাতন বা ত্যাজ্য বা অপ্রয়োজনীয় বা অনুপযোগীও হয় না], সদা বর্তমান থাকে ।

অনেকে এমন ধারণা রাখে যে বেদ কলিযুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। তা একদমই ভুল ধারণা। পরমাত্মার বাণী সব যুগের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কখনোই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বিধায় সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। যেমন, আলো বিষয়ে নিউটনের সময় ধারণা ছিল, আলো একটি কণা। হাইগেন পরবর্তীতে প্রমাণ করেন, আলো একটি সাধারণ তরঙ্গ। ম্যাক্সওয়েল আরো গবেষণার মাধ্যমে দেখান আলো তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ। শেষে প্ল্যাঙ্ক প্রমাণ করেন আলো কণা ও তরঙ্গ উভয়ই। এভাবে অল্পজ্ঞ মানুষের জ্ঞান ও ধারণা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়। কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না, তাহলে তাঁর সর্বজ্ঞতা নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলে থাকেন, সত্য যুগে মানুষের আয়ু এক লক্ষ বছর, ত্রেতায় দশ হাজার বছর। কলির জীব স্বল্পায়ু বলে তার পক্ষে বেদ পড়া সম্ভব না। এটিও একদমই ভ্রান্ত ধারণা। বেদেই [যজু ৪০।২ সহ অসংখ্য স্থলে] শত বছরকে আদর্শ আয়ু ধরে শতবছর আয়ুষ্কাল কামনা করা হয়েছে। কাজেই লক্ষ বছর, দশ হাজার বছর এই কথাগুলো কেবল গালগল্প যা মানুষকে বেদ থেকে দূরে সরানোর জন্য নানা অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

বেদ সর্বজনীন

আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে বৈদিক ধর্ম সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতি-নীতি, পরম্পরা আদি লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে। এর বিপরীতে কেবল ভোগবাদী এবং অর্থবাদী অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার পরম্পরার অত্যধিক প্রচার এবং প্রসার হচ্ছে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য না দিয়ে গুরুবাদ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার ফলে সময়ের বিবর্তনে, অজ্ঞানতার করালগ্রাসে, তথাকথিত ধর্মপ্রচারক তথা ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আজ মহান বেদের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছি এবং সিংহভাগ সনাতনীকেই কাল্পনিক মতবাদের দোহাই দিয়ে বেদ থেকে দূরে রাখতে চাইছি। যেখানে বেদ সবাইকে অধিকার দিয়েছে, বেদের বহু মন্ত্র উল্লেখ আছে বেদ মানবজাতির জন্য ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য, সেখানে আমরা পরবর্তীতে রচিত নানা প্রক্ষিপ্ত মতবাদী গ্রন্থের দ্বারা আমাদের সমাজের সিংহভাগ অর্থাৎ নারী-শূদ্র সহ সকলকেই বেদ থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছি। ফলশ্রুতিতে ধর্মব্যবসায়ীদের পক্ষে বেদের নামে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করা, কাল্পনিক মনগড়া কথা প্রচার করা সুবিধা হয়তো হচ্ছে; কিন্তু এতে বৃহত্তর সনাতন সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ইতোমধ্যেই। এখনই সময় সেই ক্ষতি সংশোধনের।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানিজনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজান্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ ।
প্রিয়ো দেবানংদক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভুয়াসময়ং মে কামংসমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।।
[যজু০ ২৬।২]

অর্থাৎ ঈশ্বর উপদেশ প্রদান করছেন "হে মানবগণ ! আমি যেভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ এবং অন্যান্য সমস্ত জনগণকে এই কল্যাণদায়িনী পবিত্র বেদবাণী উপদেশ করছি , তোমরাও তেমন করো। যেমন বেদবাণীর উপদেশ করে আমি বিদ্বানদের প্রিয় হয়েছি, তোমরাও সেরূপ হও। আমার ইচ্ছা বেদবিদ্যার প্রচার হোক। এর দ্বারা সকলে মোক্ষ এবং সুখ লাভ করুক ।"

বেদের এই মন্ত্রের 'শূদ্রায়' এবং 'স্বায়' পদ দ্বারা স্পষ্ট যে বেদপাঠে সবার তথা নারী পুরুষের অধিকার সমান। পরমেশ্বর আমাদের বেদবাণী দান করেছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য, বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের জন্য নয়। অথচ আজকাল কেউ কেউ বলে যে, নারী-শূদ্র এরা বেদই পাঠ করতে পারবে না!
যেখানে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা নারী ঋষিগণের মাঝে অদিতি, ইন্দ্রাণী, লোপামুদ্রা, অপালা, বিশ্ববারা, ঘোষা, বাক্‌, পৌলমি, যমী, সাবিত্রী, দেবযানী, নোধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখন প্রশ্ন আসে, নারীদের যদি বেদপাঠে অধিকারই না থাকে, তাহলে তাঁরা বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হলেন কী করে!

এরপরেও যার মানবে না তাদের জন্য কিছু প্রমাণ:
১| রামায়ণে যখন শ্রীরাম তাঁর বনবাসের খবর নিয়ে কৌশল্যার গৃহে গেলেন তখন কৌশল্যা "অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা" অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছিলেন।
[বাল্মীকি রামায়ণ ২।২০।২৪-২৫]

২| শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৬।২।১৩ তে দেখা যায় নারীগণ যজ্ঞে বেদের বিখ্যাত মহামৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র পাঠ করছে।

৩| আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ৩।৮।১০-১৪ তে বৈদিক উপনয়ন, গুরুকুল পাঠ শেষ করে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় নারীদের।

৪| "ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্‌" [অথর্ব ১১।৫।১৮] অর্থাৎ, ঠিক যেমন যুবক ব্রহ্মচর্য শেষ করে বিদুষী কন্যাকে বিয়ে করবে, ঠিক তেমনি একজন যুবতীও ব্রহ্মচর্য শেষ করে পছন্দমত বিদ্বান যুবককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে।

ঠিক একইভাবে আমরা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩১ তম সূক্তের ঋষি কবষের কথা পাই, যিনি দাসীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও নিজ যোগ্যতায় ও নিজ সাধনার বলে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা হয়েছেন। কাজেই নারী বা শূদ্র কখনোই বেদপাঠের অনধিকারী না। যে কেউ বেদ মন্ত্র পাঠ বা চর্চা করতে পারে এবং বেদের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি ও বেদভাষ্য পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে। কেবল গুরুকুলে গিয়ে স্বরসহিত বেদপাঠ করতে চাইলে পূর্বে গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে উপনয়ন গ্রহণ আবশ্যক। তাই যারা অপপ্রচার করে যে নারী ও শূদ্রদের বেদ পড়ার অধিকার নেই, সেই সকল ধূর্ত, ভণ্ড, পরম্পরার দোহাই দিয়ে মিথ্যাচারকারীদের জবাব দিন।

বেদে পশুহত্যা নিষেধ
বেদে বর্ণিত ঈশ্বর ন্যায়কর্তা। তিনি পক্ষপাত হতে রহিত। যেমন মানবহত্যা পাপ তেমনি পশুহত্যাও পাপ। বেদে অসংখ্য স্থানে পশুহত্যার নিষেধ ও পশুরক্ষার আদেশ পাওয়া যায়। যেমন:
যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিপূর্তির্ন ইন্বতু ॥
[ঋগ্বেদ ১।১৬২।১২]
অর্থঃ (যে) যে মনুষ্যগণ (বাজিনম) যাতে বিবিধ অন্নাদি পদার্থ বিদ্যমান সেই ভোজনকে (পক্বম) রান্না করার ফলে উত্তম হওয়া খাদ্যকে (পরিপশ্যন্তি) সর্বদিক থেকে দর্শন করে বা (যে) যে (ঈম) জল দ্বারা রন্ধনকৃত (আহুঃ) বলা হয়ে থাকে (যে, চ) এবং যারা (অর্বতঃ) প্রাপ্ত হওয়া প্রাণীর (মাংসভিক্ষাম্‌) **মাংস না প্রাপ্ত হওয়ার জন্য** (উতো) **তর্ক-বিতর্ক দ্বারা**

(উপাসতে) **সেবন করে** (তেষাম) তাদের (অভিগুর্ত্তিঃ) উদ্যম এবং (সুরভিঃ) সুগন্ধ (নঃ) আমাদের (ইস্বতু) ব্যাপ্ত বা প্রাপ্ত হোক। হে বিদ্বন্! তুমি (ইতি) এই রকমের অর্থাৎ **মাংসাদি অভক্ষ্যসমূহকে ত্যাগ করার মাধ্যমে রোগসমূহকে** (নির্হর) **নিরন্তর দূর করো।**

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুন্নমস্মে তে অস্ত্র।
মূলা চ নো অধি চ ক্রহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবহাঃ

[ঋগ্বেদ ১।১১৪।১০]

অনুবাদঃ হে (ক্ষয়দ্বীর) শূরবীরগণের নিবাসদাতা ও (দেব) দিব্য উত্তম কর্ম যিনি করান সেই বিদ্বান্ সভাপতি! (পুরুষঘ্নম) মনুষ্যগণকে হত্যা (চ) এবং (গোঘ্নম্) গো আদি উপকারী পশুসমূহের বিনাশকারী প্রাণীগণকে নির্মূল করে (তে) আপনার (চ) এবং (অস্মে) আমাদের জন্য (সুমম) সুখ (অস্ত্র) হোক, (অধা) এর পরবর্তীতে (নঃ) আমাদের (মৃড) সুখী করুন (চ) এবং আমি আপনাকে সুখ দান করি [যার ফলে], আপনি আমাদের (অধিক্রহি) অধিক উপদেশক দিন (চ) এবং আমক আপনাকে উপদেশ দেই (দ্বিবহাঃ) আচরণ ও পরমার্থ বৃদ্ধিকারী আপনি (নঃ) আমাদের জন্য (শর্ম্ম) গৃহের সুখ দান (যচ্ছ) করুন (চ) এবং আপমার জন্য আমি সুখ দান করি। আমরা সকলে ধর্মাত্মাগণের (আরে) নিকটে এবং দুরাচারীগণের থেকে দূরে থাকি।

য়দি নো গাং হংসি য়দ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
তং ত্বা সীমেন বিধ্যামো যথা নোৎসো অবীরহা।।

[অথর্ববেদ ১।১৬।৪]

ভাবার্থ:- যদি তুমি আমাদের গাভী, অশ্ব ও মনুষ্যদের হনন কর তাহলে আমরা তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করব।

যাতুধানান্ ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
সহম্রান্ অনু দহ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥

[অথর্ববেদ ৮।৩।১৮, ৫।২৯।১১]

অনুবাদঃ (অগ্নে) হে বিদ্বান্ রাজন! তুমি (যাতুধানান) পীড়াদানকারীকে [প্রাণীগণ বা রোগসমূহকে] (সনাৎ) নিত্য (মৃণসি) নষ্ট করো, (রক্ষাংসি) রাক্ষস তথা যাদের থেকে আমাদের রক্ষিত থাকা উচিৎ তাদের (ত্বা) তুমি (পৃতনাসু) সংগ্রামে (ন জিগুাঃ) জয় লাভ করতে দাও না। (ক্রব্যাদঃ) মাংস ভক্ষকগণকে (সহমূরান) তাদের মূল [অথবা মূঢ় মনুষ্যগণ] সহিত (অনু দহ) ভস্ম করে দাও, (তে) তোমার (দৈব্যায়াঃ) দিব্য গুণযুক্ত (হেত্যাঃ) বজ্র তথা ন্যায়বিচার ও শৌর্যবীর্য দ্বারা (মা মুক্ষত) তারা রক্ষা পায় না।

য আমং মাংসমদপ্তি পৌরুষেয়ং চ যে ক্রবিঃ।
গর্ভান্ খাদন্তি কেশবাস্তান ইতো নাশয়ামসি ॥

[অথর্ববেদ ৮।৬।২৩]

অনুবাদঃ যে কাঁচা মাংস খায় ও যে মনুষ্যের মাংস খায় এবং গর্ভকেও [ডিম্বাদি] খেয়ে ফেলে, সেই দুষ্ট প্রাণীগণকে এখান থেকে বিনষ্ট করা হোক।

অসাবিদেবং গোখজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হয়র্শ্ব য়জ্ঞৈবোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু॥

[সামবেদ ৩১৩]

সরলার্থঃ আহার সেটিই উত্তম যা কিনা উৎপাদন করা হয়েছে। আহার ভূমিমাতা থেকে উৎপন্ন শস্যাদিরই করা উচিত, সাথে গোদুগ্ধ। এই আহারই সাত্ত্বিক ও দৈবী সম্পত্তির জন্মদাতা। এই সাত্ত্বিক ভোজনে নিশ্চিতভাবেই, স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সমূহের শাসক হওয়া যায়, দাস নয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভোজন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করা যায়। পক্ষান্তরে রাজসিক ও তামসিক আহার ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের কারণ। প্রভু উপদেশ দিচ্ছেন শীঘ্রতাযুক্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বযুক্ত মানব! তোমাকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা জ্ঞানযুক্ত করি। ভক্ত বলছেন, সাত্ত্বিক আহারের আনন্দে বিহ্বলিত আমাদের স্তুতি সমূহকেও জ্ঞাত হও। অর্থাৎ, সাত্ত্বিক আহারী মানব প্রভুকে বিস্মৃত হয় না। বরং সর্বদা স্মরণ করে।

ব্রীহি মত্তং যবমত্তমথো তিলম্।

এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্ন ধেয়ায় দন্তৌ

মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ।।

[অথর্ববেদ ৬।১৪০।২]

বঙ্গানুবাদঃ চাউল, যব, মাষ এবং তিল ভক্ষণ কর। রমণীয়তার জন্য ইহাই তোমাদের জন্য বিহিত হইয়াছে! পালক ও রক্ষককে ভক্ষণ করিও না।

পুষ্টিং পশুনাং পরি জগ্রভাহং চতুষ্পদাং দ্বিপদাং য়চ্চ ধান্যম্।

পয়ঃ পশুনাংরসমোষ ধীনাং বৃহস্পতিঃ সবিতা মে নি য়চ্ছাৎ

[অথর্ববেদ ১৯।৩১|৫]

বঙ্গানুবাদঃ- চতুস্পদ পশু, দ্বিপদ পশু এবং ধান্য হইতে আমরা পুষ্টি গ্রহণ করি। এজন্য সৃষ্টি কর্তা পরমেশ্বর আমাদিগকে পশু দুগ্ধ ও ঔষধির রস প্রদান করিয়াছেন।

এখন দেখা যাক স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান **মনুসংহিতায়** মাংস ভক্ষণ ও প্রাণী রক্ষা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে:

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।

সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।।

[মনুস্মৃতি ১২।৫]

অর্থ: যে পশুকে মারার আদেশ দেয়, মাংস কাটে, পশুকে মারে, পশুকে মারার জন্য বিক্রি ও কেনে, রান্না করে, পরিবেশন করে এবং যে খায়, এইসকলেই হত্যাকারী ও পাপী হয়।

নাকৃত্বা প্রাণীনাং হিংসা মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিত্ ।

ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েত্ ।।

[মনুস্মৃতি ১০।৫]

অর্থ: প্রাণীদের হিংসা ব্যাতিত বিনা মাংস পাওয়া যায় না। আর জীবের হত্যা করা সুখদায়ক নয়। এইজন্য মাংস খাওয়া উচিত নয়।

য়োহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া ।

স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎসুখমেধতে।।

[মনুসংহিতা ৭।৫]

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজ সুখের ইচ্ছায় কোন অহিংসক, নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করে সে বেঁচে থেকেও বা মৃত্যুর পরেও কখনো সুখী হয় না।

য়ো বন্ধনবধক্লেশান্প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।

স সর্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ।।

[মনুস্মৃতি ৮।৫]

যে ব্যক্তি প্রাণীদেরকে বেঁধে রাখতে চায় না, বধ করতে চায় না এবং তাদের কোন ভাবে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে না, সেই সব প্রাণীদের হিতৈষী হয়ে অধিক সুখ পায়।

সমুৎত্তিং চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।

প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাত্।।

[মনুস্মৃতি ১১।৫]

যে প্রক্রিয়া দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, প্রাণীদের হত্যা ও বন্ধনের কষ্টকে দেখে সব প্রকারের মাংস খাওয়া থেকে দূর থাকুন বা খাওয়া ছেড়ে দিন।

যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।

তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ।।

[মনুসংহিতা-১১।৯৬]

অর্থঃ মদ, মাংস, ত্রিবিধ সুরা এবং আসব অর্থাৎ বিশেষ একধরণের মদ – এগুলি - যক্ষ, রাক্ষস এবং পিশাচ প্রভৃতি ঘৃণ্য জীবদের পেয় (কারণ, তাদের ভক্ষ্যাভ্য বিচার নেই)। দেবতার উদ্দেশ্যে চর-পুরোডাশ প্রভৃতি যে সমস্ত হবিদ্রব প্রদান করা হয়, ব্রাহ্মণ সেগুলি ভক্ষণ করার অধিকারী; সুতরাং পিশাচ প্রভৃতির খাদ্য যে মদমাংস প্রভৃতি, তা ভোজন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়।

এখন দেখা যাক যোগশাস্ত্র **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়** খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে কি বলা হয়েছে:

[গীতা ১৭।৭-১০]

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।

অর্থ: সকল মানুষের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হয়ে থাকে। তেমনই যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। এখন তাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

অর্থ: যে সমস্ত আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ

অর্থ: যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ম, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যষিতং চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্

অর্থ: আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা খাদ্য, যা নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক লোকদের প্রিয়।

বর্তমান যুগে বহুধাবিভক্ত সনাতনীসমাজ ও বেদের গুরুত্ব

দীর্ঘদিন সনাতনী সমাজে বেদচর্চার অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে অনেক অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, নানা গুরু বা নানা নিজ দাবিকৃত অবতার এসেছেন, যাদের কেন্দ্র করে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সম্প্রদায়গুলোর বেশিরভাগ নিজ গুরুর প্রতি অন্ধবিশ্বাসের জন্য গুরুকে ঈশ্বর মেনে থাকেন। নিজ গুরুকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন এবং শাস্ত্রের

বদলে গুরুর নির্দেশিত মতকেই গ্রহণ করেন। এসব গুরুদের অনেকেই আবার সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী। এভাবেই সনাতনী সমাজ ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। একেক গুরুর একেক মন্ত্র, একেক ঈশ্বর তত্ত্ব, একেক প্রথা ও সংস্কার দেখে ২% দীক্ষিত বাদে বাকি ৯৮% সাধারণ সনাতনী নিজ ধর্ম নিয়ে চরম বিভ্রান্ত। কোন উৎসব পালন করবে, কী খাবে, বলি কি বিহিত নাকি অবিহিত, বর্ণ জন্মগত না কর্মগত, কাকে ও কীভাবে উপাসনা করবে, ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন মন্ত্র জপ করবে সবাই এসব সাধারণ ব্যাপারেই তারা বিভ্রান্ত ও একক সিদ্ধান্তহীন। অথচ এসবই আমাদের মূল ভিত্তি। যারা কিনা এসব ভিত্তিতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে এড়িয়ে যায় বা সবই ঠিক বলে তারাই মূলত বিভ্রান্তকারী শাস্ত্রব্যবসায়ী। যারা ঐক্যের কথা বলে তারা এটাই ভুলে যায় যে যদি মূলটাই ভিন্ন হয় তবে আপাত মধুর ঐক্যের রব কেবল শুনতেই ভালো লাগবে ও কখনোই বাস্তব না। যদি দশজন সনাতনীকে ডেকে ঈশ্বরের নাম জিজ্ঞেস করা যায়, কেউ হয়তো বলবে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, কেউ বলবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব ঈশ্বর; কেউ আবার নিজস্ব মতবাদের গুরুদের নাম বলবে। অবশ্যই আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন, যারা নিজ নিজ মতে সাধনা করেছেন এবং সাধারণকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের মত যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এমনটা নয়। ঈশ্বর বাদে কোনো মানব শতভাগ অভ্রান্ত হতে পারে না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে একমাত্র অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ হলো বেদ। বেদ ব্যতীত বাকি সবাই পরতঃপ্রমাণ। তাই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী গুরুর শরণ আবশ্যক যিনি শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করবেন। সেই গুরুর কোনো কথা যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা তা বর্জন করব। গুরুকে ও গুরুর আদর্শকে বেদের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করব।

সনাতনধর্মে নানা গুরুবাদী সম্প্রদায় বা নানা দেবোপাসক সম্প্রদায় নিজস্ব গ্রন্থ বা নিজস্ব পুরাণ রচনা করেছে যাতে সর্বদাই নিজ উপাস্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য অন্য দেবতাকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এমন স্ববিরোধী গ্রন্থাদি বর্জন করে কেবল বেদের পথই অনুসরণ করা উচিত আমাদের। ধরি দুটো জায়গা, 'ক' এবং 'খ' বিন্দু। ক থেকে খ তে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ একটাই, যা তাদের সরলরৈখিক দূরত্ব [পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ভেক্টর দূরত্ব]। অন্য যেকোনো পথ সরল পথের তুলনায় জটিল এবং দুরূহ। আবার কোনো কোনো পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টোদিকেও নিয়ে যেতে পারে। কাজেই "যত মত তত পথ" নয়, "বেদের পথই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ"। কাজেই এক মানবজাতি আর্য; এক ধর্ম বৈদিক সনাতন; এক মূল গ্রন্থ বেদ; এক মূল মন্ত্র, গায়ত্রী; এক উপাস্য, নিরাকার পরমাত্মা [ওওম] হলেই বহুমতের ফাঁদে বিভক্ত সনাতনী সমাজের মাঝে একতা আসবে। পবিত্র ঋগ্বেদের সর্বশেষ সংগঠন সূক্তের [১০।১৯১] এটিই প্রতিপাদ্য।

পবিত্র সংগঠন সুক্তের মাধ্যমে একতার বাণী:

সং সমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ। ইডস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥১॥

হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান, নির্মাণ করেছ এই সৃষ্টিকে।
তব মহিমা গায় বেদাদিশাস্ত্র, সমৃদ্ধ করো এই ভূমিকে।।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবাভাগং যথাপূর্বে সং জানানা উপাসতে ।।২।।

হে মনুষ্য! তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে বলো, একসঙ্গে মিলে আলোচনা করো। তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। পূর্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেছেন তোমরাও সেইরূপ করো।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।৩।।

তোমাদের বিচার এক হোক, প্রাপ্তি অথবা কার্য প্রবৃত্তি এক হোক, এই প্রকার তোমাদের এক মন্ত্রের সাথে চিত্তও এক হোক, তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে যুক্ত করেছি, তোমাদের এক প্রার্থনা, এক উপাসনা কর্ম হোক, এক কর্ম দ্বারা সকলে আপন হোক।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি।।৪।।
তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হোক, তোমাদের হৃদয় সমান হোক, তোমাদের মন সমান হোক। এইভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক।

ষোড়শ সংস্কার

মানুষের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরে তথা আত্মার উন্নতিতে সংস্কারের মহত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।
জীবনের সাথে সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে এবং ভারতীয় জীবনব্যবস্থার সংস্কার বড়ই মহত্ত্বপূর্ণ। সংস্কার সংস্কৃত শব্দ। মন, বচন, কর্ম এবং শরীর কে পবিত্র করাই হলো সংস্কার । আমাদের সকল প্রবৃতি এবং চিত্তবৃত্ত পালনের জন্য আমাদের মনে সংস্কার রয়েছে । **সংস্কার শব্দ এর ব্যুৎপত্তি - 'সম্' উপসর্গ পূর্বক 'কৃ' ধাতু তে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে "সংস্কার" শব্দ হয়**। এর অর্থ শুদ্ধি, পরিষ্কার, সুধার । মন, রুচি, আচার-বিচার কে পরিশুদ্ধ তথা উন্নত করাই সংস্কার। বাস্তবে সংস্কৃতি শব্দ সংস্কার শব্দ এসেছে। এর অর্থ হলো পরিমার্জিত, পরিকৃত, সুধার। এই অর্থে মানবের মাঝে যা দোষ তার শোধন করার জন্য , সেগুলো কে সুসংস্কৃত করার জন্যই সংস্কারের প্রয়োজন করা হয়েছে ! সংস্কার দ্বারা মানবীয় মন কে এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা নির্মল, সন্তুলিত এবং সুসংস্কৃত করা হয় । জীবনে কার্যকরী হয় এমন সত্যবৃত্তির বীজারোপণ করাই এই সংস্কারের কাজ । যদি কোন বালকের সকল সংস্কার সঠিক রীতি দ্বারা সমুচিত বাতাবরণে করা হয়, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব সুবিকশিত হয় । সংস্কার পদ্ধতির দ্বারা তার মনোবিকারসমূহ নিরাকরণ হয় তার সৃজনাত্মক শক্তি কে বাড়িয়ে দেয়। অত:পর জীবনের বহুমূল্য বিশিষ্টতা, সম্পদ এবং চরিত্র নির্মাণের আধার হলো সংস্কার।
পাণিনির সূত্র অনুসার,
"সম্পর্যুপেভ্যঃ করোতৌ ভূষণে" "যার দ্বারা শরীরাদি সুভূষিত হয়, সেগুলোকেই সংস্কার বলা হয় ।"
"সংস্করণং গুণান্তরাধানম্ সংস্কারঃ" গুণের আধার কে সংস্কার বলা হয়।
ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী জীর মতানুসারে,
"সংস্কার পালন করে শরীর এবং আত্মা সুসংস্কৃত হলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় , এবং সন্তান অত্যন্ত যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে।" এইজন্য সকলের উচিত সংস্কার পালন করা।

সংস্কারের মহত্ত্ব: সংস্কার দ্বারাই আমাদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্ট হয় এবং আমাদের সভ্য বলা হয় । ব্যক্তিত্ব নির্মাণে সনাতনী সংস্কারের মহত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । সংস্কার বিরুদ্ধ আচরণ অসভ্যতার প্রতীক । সংস্কার মনুষ্যকে পাপ এবং অজ্ঞানতা থেকে দূরে রেখে আচার-বিচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে। মানব জীবনে সংস্কারের অত্যধিক মহত্ত্ব রয়েছে । সংস্কারের সর্বাধিক মহত্ত্ব মানবীয় চিত্ত শুদ্ধির জন্য। সংস্কার দ্বারাই মনুষের চরিত্র নির্মাণ হয় এবং বিচারের অনুরূপ সংস্কার; কারণ চরিত্রই সেই মূল্যবান সম্পদ, যার দ্বারা মানুষের জীবনের সুখ, শান্তি এবং মান-সম্মান প্রাপ্ত হয় । সংস্কারের দ্বারা মানব চরিত্রে সদগুণের সঞ্চার হয় , দোষ, দুর্গুণ দূর হয় । মানব জীবনেএ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্থক করার তথা সত্য-শোধনের অভিনব ব্যবস্থার নাম সংস্কার । সংস্কারের মূল প্রয়োজন আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক বিকাশে ও প্রয়োজন ; কারণ মানব জীবন কে পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট করার আধ্যাত্মিক উপচারের নাম হলো সংস্কার ।

সংস্কারের অভিপ্রায় সেই ধার্মিক কৃত্য যা কোন ব্যক্তি কে স্বীয় সমুদায়ের যোগ্য সদস্য করে তার শরীর, মন এবং মস্তিষ্ক কে পবিত্র করে।

শ্রেষ্ঠ সংস্কারবান মানব নির্মাণ করাই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সংস্কারের দ্বারাই মনুষের মধ্যে শিষ্টাচরণ এবং সভ্য আচরণের প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। এই অর্থে সর্বসাধারণের মানসিক, চারিত্রিক এবং ভাবনাত্মক বিকাশের সুন্দর বিধানই হলো সংস্কার।

সংস্কারের পালন করলে আয়ু-আরোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় সংস্কৃতি তে ষোল সংস্কারের উল্লেখ আছে। এই সংস্কারের অনুসারে জীবন-যাপন করলে সে মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। ওখানে আবার উপনয়ন সংস্কারের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এই সংস্কারের দ্বারাই বালক ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবেশ করে। ব্রহ্মচর্য নিয়ম কানুন দ্বারা পালন আয়ু-আরোগ্যতা এবং জীবনে সফলতা পাওয়া যায় । আজ অভিভাবকদের এই কথা স্মরণে রাখা উচিত যেন উপনয়ন সংস্কার নিয়মকানুন সঠিকভাবে পালন করে। প্রত্যেক মনুষ জন্মের সাথে কিছু গুণ এবং কিছু অবগুণ নিয়ে জন্মায়। সেখানে পূর্ব জন্মের সংস্কার ও থাকে । সনাতন ধর্ম এটাই মান্য করে । অত:পর আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন সংস্কার যুক্ত হয়।

সংস্কারের দুটো উদ্দেশ্য থাকে । এক উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতি বিরোধী শক্তির প্রভাব কে দূর করা এবং হিতকারী শক্তি কে নিজের দিকে আকর্ষিত করা, কারণ প্রাচীন সনাতনীদের এবং অন্য প্রাচীন জাতিদের ও কিছু ভ্রান্ত ধারণা যে মনুষ অধিমানবের প্রভাবে পরিবেষ্টিত । এইভাবে সে খারাপ প্রভাব কে দূর করে এবং ভালো প্রভাব কে আকর্ষিত করে দেবতাদের এবং এই অধিমানব শক্তির সহায়তা দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সুখী থাকবে । সংস্কারের দ্বারা সে পশু, সন্তান, দীর্ঘায়ু, সম্পত্তি এবং সমৃদ্ধির আশা করে । সংস্কারের দ্বারা মনুষ নিজের অপন হর্ষোল্লাস কে ও ব্যক্ত করে ।

দ্বিতীয় মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সাংস্কৃতিক। মনুর মতানুসারে মনুষ সংস্কারের দ্বারা এই সংসারের এবং পরলোক জীবন কে পবিত্র করে । এইরকম বিচার যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যক্ত করেছিলেন । প্রাচীন ভারতীদের বিশ্বাস ছিলো প্রত্যেক মনুষ শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং আর্য হওয়ার পূর্বে শুদ্ধি বা সংস্কারের আবশ্যকতা হয় । এই উদ্দেশ্যে উপনয়ন সংস্কার করা হতো । সংস্কারের উদ্দেশ্য মনুষের নৈতিক উত্থান এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য মোক্ষ পর্যন্ত পৌঁছানোর যোগ্য করে দেওয়া। মানুষের সম্পূর্ণ জীবনের সাথে সংস্কারের সম্পর্ক রয়েছে । সংস্কার জীবন ভর এই সংসারে এবং আত্মার দ্বারা পরলোকেও প্রভাব বিস্তার করে।

জীবনভর মানুষ সংযমের মাধ্যমে জীবন ব্যতীত করত এবং উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য অনুশাসন মেনে চলত । এইভাবে সমাজে সমান সংস্কৃতি এবং অধিক চরিত্রবান ব্যক্তির আবির্ভাব হতো । প্রাচীন সনাতনীদের যথাযথ ধারণা ছিলো যে সংস্কারের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় । এর দ্বারা মানুষের এই অনুভূতি হয় যে, সম্পূর্ণ জীবনই আধ্যাত্মিক সাধন। এভাবেই সংস্কারের দ্বারা সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সুন্দর সমন্বয় স্থাপিত করা যায়। শরীর এবং তার কার্য অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্তির সহায়ক মান্য করা হতো বাধক নয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য মনুষের পাশবিকতা পরিষ্কৃত করে মানবতায় পরিবর্তিত করা। প্রাচীন কাল মনুষের জীবনে ধর্মের বিশেষ মহত্ব ছিলো । সংস্কারের উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তিত্ব কে এইভাবে বিকশিত করা যাতে সে বিশ্বের মানব এবং অতিমানব শক্তির সাথে সমন্বয় স্থাপিত করতে পারে। এর উদ্দেশ্য মানুষ কে বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক রূপে সুসংস্কৃত করে গড়ে তোলা ।

সংস্কারে বর্ণ- ধর্ম এবং আশ্রম- ধর্ম দুয়ের অভিন্ন ভাগ রয়েছে । বর্ণ- ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তি কে কার্যকে সমাজের হিত হয় এই ধ্যান রেখে নিয়ন্ত্রিত করা । আশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য , কিন্তু এখানে প্রমুখ রূপে ব্যক্তির জন্য হিতকর হয় এই খেয়াল

রাখা হয়। এই দুই দৃষ্টিকোণ কে মেলানোর মাধ্যম হলো সংস্কার । সংস্কার দ্বারা ব্যক্তি প্রথম থেকেই অধিক সংগঠিত এবং অনুশাসিত হয়ে প্রথম চরণ থেকে দ্বিতীয় চরণে প্রবেশ করে। এইভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যক্তি কে সমাজের জন্য পূর্ণ উপয়োগী করে গড়ে তোলা হতো। গৃহস্থাশ্রমে যোগ্য সন্তান উৎপন্ন করে পতি- পত্নী সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্য পূরণ করতো, সাথে সাথে নিজের উন্নতির জন্যও । গৃহস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থের মতো এবং এইভাবে বানপ্রস্থ সন্যাসের পৃষ্ঠভূমি । সকল আশ্রম ব্যক্তি কে তার লক্ষ্য মোক্ষ এর দিকে নিয়ে যায় ।

সংস্কারের সময় যে ধার্মিক কাজ করা হয় , তা ব্যক্তি কে এই অনুভূতি করায় যে তার জীবনে এই সংস্কার জন্য কোন মহত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। উদাহরণের জন্য উপনয়ন সংস্কার তাকে অনুভূতি করায় যে সে এই সংস্কারের পর সেই সমুদায় সাংস্কৃতিক পরম্পরার অধ্যয়ন করবে, যেই সমুদায় বিশেষের ও সদস্য। এইভাবে বিবাহ সংস্কারের পর সন্তানোৎপত্তি করে অপন সমুদায়ের শক্তি বৃদ্ধির নিশ্চয় করে । গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়ে সে সমাজের প্রতি অপন কর্তব্য পূরণ করে ধর্ম- সঞ্চয় করে , যাতে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় , যা তাকে তার জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ মোক্ষ এর দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করে ।

সংস্কারের সময় যে ধার্মিক কার্য সম্পন্ন করা হয় তা ব্যক্তি কে এই অনুভূতি করায় যে তার উপর কিছু নতুন দায়িত্ব এসেছে যা সম্পন্ন করে সে নাম নিজের এবং সমাজের উন্নতি করতে সক্ষম। এইভাবে সংস্কার পূর্বজন্মের দোষ সমূহ দূর করে এবং গুণের বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের উন্নতিতে সহায়ক হয় , এইজন্যই প্রাচীন ভারতে সংস্কারের এত মহত্ব ছিলো

বিভিন্ন ধার্মিক সংস্কার এবং তার স্বরূপ: আমাদের ভারতীয় ধর্মের অনুসারে ষোল সংস্কার দ্বারাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করা হয় । গর্ভাধান থেকে জন্ম পর্যন্ত সংস্কারের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং বিদ্যারম্ভ থেকে সমাবর্তন পর্যন্ত সংস্কারের শৈক্ষিক মহত্ব রয়েছে । বিবাহ সংস্কারের সামাজিক মহত্ব রয়েছে । এই সংস্কারের দ্বারা মনুষ পারিবারিক জীবন সুখী হয় এবং সমাজে সুব্যবস্থা বজায় থাকে। অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের উদ্দেশ্য পারিবারিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা প্রদান করা ।

সনাতনীদের গর্ভধারণ থেকে শ্মশান পর্যন্ত বৈদিক সংস্কার ১৬ টি। এগুলোকে একত্রে ষোড়শ সংস্কার বলা হয়। একজন ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে এই ষোড়শ সংস্কার পালন করা উচিত উত্তম পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে। মহর্ষি মনু [মনুস্মৃতি ২।১৬] বেদ দ্বারা এই ১৬ সংস্কার [যজুর্বেদ ৮।৩৩] নির্দেশিত বলেছেন-

সরলার্থ- হে শত্রুদিগকে হত্যাকারী গৃহাশ্রমী! তুমি মেঘতুল্য সুখ বর্ষণকারী তোমার যে রমণীয় বিদ্যা প্রকাশময় গৃহাশ্রম বা রথে জল বা ধন দ্বারা ধারণ ও আকর্ষণ অর্থাৎ টানিবার সমান অশ্ব যুক্ত করা হয়, সেই গৃহাশ্রম করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, এই গৃহাশ্রমে তোমার যে মন অধোগামী হয় উহাকে বেদবাণী দ্বারা শান্ত করিয়া যদ্দ্বারা তুমি (উপয়ামগৃহীতঃ) গৃহাশ্রম করিবার সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছ । এই কারণে ষোল কলায় পরিপূর্ণ পরমৈশ্বর্য্য প্রদানকারী গৃহাশ্রম করিবার জন্য তোমাকে উপদেশ করি ।) পরমৈশ্বর্য্য হেতু তোমাকে উপদেশ করি । যে এই তোমার ঘর, এই ষোল কলায় পরিপূর্ণ পরমৈশ্বর্য্য প্রদানকারী গৃহাশ্রম করিবার জন্য তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি ॥
[যজুর্বেদ ৮।৩৩]

ভাবার্থঃ- গৃহাশ্রমের অধীন সব আশ্রম এবং বেদোক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যবহার দ্বারা যে গৃহাশ্রমের সেবা করা হয় তদ্দ্বারা এই লোক ও পরলোকের সুখ হওয়ায় পরমৈশ্বর্য্য পাইবার জন্য গৃহাশ্রমই সেবন করা উচিত ॥

ষোড়শ সংস্কার এর বেদোক্ত প্রমাণ ও পালনীয় বিধি

গর্ভাধান

পরিহস্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে।
মর্যাদে পুত্রমা ধেহি তং ত্বমা গময়াগমে।।
[অথর্ববেদ ৬।৮১।২]
পদার্থ :- (পরিহস্ত) হে শক্তির আশ্রয়দাতা পুরুষ! (গর্ভায় ধাতবে) গর্ভের পুষ্টির জন্য (যোনিম্) স্ত্রী যোনিকে (বি ধারয়) বিশেষরূপে রক্ষা করো, (মর্যাদে) হে মর্যাদাযুক্ত পত্নী! (পুত্রম্) গর্ভস্থ সন্তানকে (আ ধেহি) বিশ্বাস রূপে পুষ্ট করো (ত্বম্) তুমি (তম্) সেই সন্তানকে (আগমে) যোগ্য সময়ে (আ গময়) উৎপন্ন করো।
অর্থাৎ, হে শক্তিধর পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্য স্ত্রী যোনিকে বিশেষরূপে রক্ষা করো। হে মর্যাদাময়ী পত্নী! গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষভাবে পুষ্ট করো। তুমি সেই সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে প্রসব করো।

গর্ভধারণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বীর্যস্থাপন স্থিরীকরণ যে ক্রিয়া দ্বারা হয় তাহাকে গর্ভাধান বলে। যার বীজ ও ক্ষেত্র উত্তম তার যেমন উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়, তেমনই বলবান স্ত্রী - পুরুষের সন্তানও উত্তম হয়। এজন্য পূর্ণ যৌবন অবধি ব্রহ্মচর্য পালনের পর সমাবর্তনের মাধ্যমে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের বিধান রয়েছে।
পুরুষ ও নারীর বিবাহের নূন্যতম বয়স ২৫ এবং ১৬ বছর।বিবাহের পর এই সংস্কার পালিত হয়।

পুংসবন

যাসাং দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব।
তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ।।
[অথর্ববেদ ৩।২৩।৬]
পদার্থ :- হে স্ত্রী (যাসাম্) যে (বীরুধাম্) ওষধি সমূহের (দ্যৌঃ পিতা) দ্যুলোক পিতা (পৃথিবী মাতা) পৃথ্বীলোক মাতা এবং (সমুদ্রঃ মূলম্) সমুদ্র লোক মূল আধার (বভূব) হইয়াছে (তাঃ) সেই ওষধি সমূহকে আমি (ত্বা) তোমাকে (পুত্র-বিদ্যায়) সন্তান লাভের জন্য দান করিতেছি (দৈবীঃ) দিব্যগুণযুক্ত (ওষধয়ঃ) ওষধিসমূহ (প্র-অবন্তু) পর্যন্ত রক্ষা করুক।
অর্থাৎ, হে স্ত্রী। যে ওষধিসমূহের দ্যুলোক পিতা, পৃথ্বীলোক মাতা এবং সমুদ্রলোক মূল আধার সেই ওষধি সমূহ তোমাকে সন্তান লাভের জন্য দান করিতেছি। দিব্যগুণযুক্ত ওষধি সমূহ তোমাকে রক্ষা করুক।
পত্নী গর্ভবতী হয়েছেন জানার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে সুস্থ সন্তান কামনায় পুংসবন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যজ্ঞ করা হয়। এই অনুষ্ঠান মূলত গর্ভাবস্থায় প্রসূতির সুস্থতার জন্য এবং সন্তান ঠিকভাবে ভূমিষ্ঠ হবার জন্য করা হয়।

সীমন্তোন্নয়ন

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সুচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্।।
[ঋগ্বেদ ২।৩২।৪]
পদার্থ :- (অহম্) আমি (রা-কাম্) দাত্রী (সুহবাম্) ভালোভাবে আহ্বানযোগ্য স্ত্রীকে (সুষ্টুতী) উত্তম স্তুতি দ্বারা (হুবে) আহ্বান করিতেছি (সুভগা) সৌভাগ্যবতী স্ত্রী (নঃ শৃণোতু) আমার আহ্বানকে শ্রবণ করুক (ত্মনা) স্বীয় আত্মাদ্বারা (বোধতু) আমাকে

উপলব্ধি করুক (অপঃ) প্রজনন কর্মকে (অচ্ছিদ্য মানয়া সূচ্যা) সূক্ষ্ম সূচ দ্বারা সীবন করিবার ন্যায় (সীব্যতু) সীবন করুক (বীরম্) বলবান (শতদায়ম্) শত প্রকারের দান দাতা (উক্থ্যম্) প্রশংসনীয় পুত্র = সন্তান (দদাতু) দান করুক।
অর্থাৎ, আমি দানশীলা আহ্বানযোগ্য স্ত্রীকে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করিতেছি। সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আমার আবাহন শ্রবণ করিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করুক। সূক্ষ্ম সূচ দ্বারা সেলাই করিবার ন্যায় অতি সাবধানে সে প্রজনন কর্ম সম্পন্ন করুক। সে আমাকে দানবীর বলবান যশস্বী পুত্র = সন্তান দান করুক।
এই সংস্কার দ্বারা গর্ভধারিণী স্ত্রীর মন আনন্দিত হয় এবং শরীর আরোগ্য লাভ করে। গর্ভমাস হতে চতুর্থ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সংস্কার করতে হয়।

জাতকর্ম

দশ মাসাঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি।।
[ঋগ্বেদ ৫।৭৮।৯]
পদার্থ :- (দশ মাসান্) দশমাস পর্যন্ত (অধি মাতরি) মাতার গর্ভে (শশয়ানঃ) সুপ্ত (কুমারঃ জীবঃ) সুকুমার জীব (জীবঃ) প্রাণ ধারণ করিয়া (জীবন্ত্যা অধি) জীবিতা মাতা হইতে (অক্ষতঃ) বিনা ক্লেশে (নিরৈতু) বহির্গত হউক।
অর্থাৎ, হে পরমাত্মন্! দশ মাস পর্যন্ত মাতৃগর্ভে সুকুমার জীব সুপ্ত থাকিয়া যেন প্রাণ ধারণ করে এবং জীবিত মাতার গর্ভ হইতে যেন বিনা কষ্টে ভূমিষ্ঠ হয়।
সন্তান প্রসবের সময় মন্ত্র জপ; মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নাভিচ্ছেদন, শিশুর যত্ন বিষয়ক কর্মসমূহকে জাতকর্ম সংস্কার বলা হয়।

নামকরণ

কোঽসি কতমোঽসি কস্যাসি কো নামাসি।
যস্য তে নামামন্মহি যং ত্বা সোমেনা তীতৃপাম।
ভূর্ভুব স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ।।
[যজুর্বেদ ৭।২৯]
পদার্থ :- (কোঽসি) হে বালক! তুমি প্রকাশরূপ (কতমোঽসি) অত্যন্ত প্রকাশরূপ, (কস্যাসি) তুমি পরমাত্মার (কো নামাসি) তুমি আত্মনামযুক্ত (যস্য তে নাম) তোমার যে নামকে (অমন্মহি) আমরা জানি (যং ত্বা সোমেন) যে তোমাকে শান্তিময় পদার্থ দ্বারা (অতীতৃপাম) আমরা তৃপ্ত করিতেছি (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ, পরমাত্মার কৃপায় (প্রজাভিঃ) সন্তান দ্বারা (সুপ্রজাঃ) সুসন্তান যুক্ত (স্যাম্) হইব (বীরৈঃ) বীর সন্তান দ্বারা (সুবীরঃ) সুবীর হইব (পোষৈঃ) পুষ্টি দ্বারা (সুপোষঃ) সুপুষ্ট হইব।
অর্থাৎ, হে সন্তান! তুমি যে জ্যোতিঃ স্বরূপ, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মার সন্তান, তোমার নাম আত্মা, ইহা আমরা ভালোভাবে জানি। শান্তিদায়ক পদার্থ দ্বারা তোমাকে আমরা তৃপ্ত করিতেছি। প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখময় পরমাত্মার কৃপায় আমার সন্তানেরা সুসন্তান হউক, বীর সন্তান হউক। আমি বীরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইব। পুষ্টিকর পদার্থের দ্বারা আমি সুপুষ্ট হইব।
সন্তান জন্ম হওয়ার একাদশ তম দিনে আত্মীয় পরিজন ও পরিবারের ব্যক্তিদের সঙ্গে করে সন্তানের নাম রাখার সংস্কারকে নামকরণ সংস্কার বলে।

নামকরণের কাল- যেদিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সে দিন হইতে ১০ দিন বাদ দিয়া একাদশ দিনে বা ১০১ (একশত এক) দিনের দিন বা দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে যে দিনে জন্ম হইযাছে, সেই দিন নাম রাখিবে।

নিষ্ক্রমণ

শিবে তে স্তাং দ্যাবাপৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।।
শং তে সূর্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ।।
[অথর্ববেদ ৮।২।১৪]

পদার্থ :- (তে) তোমার নিষ্ক্রমণকালে (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (শিবে) কল্যাণকারী (অসন্তাপে) সন্তাপনাশক (অভিশ্রিয়ৌ) শোভা ও ঐশ্বর্যদাতা (স্তাম্) হউক (সূর্যঃ) সূর্য (তে) তোমার জন্য (শং আ তপতু) কল্যাণ প্রকাশ করুক (বাতঃ) বায়ু (তে হৃদে) তোমার হৃদয়ের জন্য (শং বাতু) কল্যাণকারী হউক (দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ আপঃ) দিব্য গুণযুক্ত স্বাদুজল (ত্বা) তোমার প্রতি (শিবাঃ) কল্যাণকারী হইয়া (অভি ক্ষরন্তু) প্রবাহিত হউক।

অর্থাৎ, হে বালক! তোমার নিষ্ক্রমণকালে দ্যুলোক ও ভূলোক কল্যাণকারী, সন্তাপহীন, শোভা ও ঐশ্বর্যদাতা হউক। সূর্য তোমার নিকট কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অনুকূল মঙ্গলদায়ক হউক। দিব্যগুণযুক্ত স্বাদুজল তোমার জন্য কল্যাণকারী হইয়া প্রবাহিত হউক।

ঘরের বাইরে শুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে সন্তানকে ভ্রমণ করানোর সংস্কারকে নিষ্ক্রমণ বলে। যে সময় ভাল মনে হবে, সে সময়েই ভ্রমণ করানো যাবে। চতুর্থ মাসে বা এর পরে ভ্রমণ করাতে হবে।

অন্নপ্রাশন

যদশ্নাসি যৎপিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্বং তে অন্নমবিষং কৃণোমি।।
[অথর্ববেদ ৮।২।১৯]

পদার্থ :- (যৎ কৃষ্যাঃ ধান্যম্) কৃষিদ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন (অশ্নাসি) তুমি ভক্ষণ করিতেছ (যৎ পয়ঃ পিবসি) যে সুপেয় পান করিতেছ (যৎ অদ্যম্) যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হেতু (যৎ অনাদ্যম্) অভক্ষ্য (সর্বং তে অন্নম্ অবিষম্ কৃণোমি) সে সব তোমার জন্য রোগনাশক অমৃত হউক।

অর্থাৎ, হে বালক! কৃষিদ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ করিতেছ, যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হওয়ায় অভক্ষ্য, সে সবই তোমার জন্য রোগরহিত ও অমৃতময় হউক।

যখন শিশু অন্ন জাতীয় খাদ্যাদি হজম করার উপযুক্ত শক্তি লাভ করবে, তখন মুখে অন্ন দেওয়াই অন্নপ্রাশন সংস্কার।

যখন শিশু অন্ন পরিপাক করিবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিবে, তখনই অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবে। এবিষয়ে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের (১।১৬ ১-৩) বিধান

পারস্কর গৃহ্যসূত্রাদিতে লিখিত আছে— ষষ্ঠ মাসে শিশুকে অন্নপ্রাশন করাইবে। শিশুকে তেজস্বী করিতে চাহিলে অন্নের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অথবা অন্নের সহিত দধি, মধু ও ঘৃত-এই তিনটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে অন্নপ্রাশন করাইবে ।

চূড়াকর্ম

যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান।
তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্।।
[অথর্ববেদ ৬।৬৮।৩]

পদার্থ :- (যেন ক্ষুরেণ) যেরূপ ক্ষুর দ্বারা (সোমস্য রাজ্ঞঃ) শান্তস্বভাব রাজা ও (বরুণস্য) শ্রেষ্ঠ পুরুষের (সবিতা বিদ্বান) অভিজ্ঞ বিদ্বান (অবপৎ) মুণ্ডন করেন (তেন) সেইরূপ ক্ষুর দ্বারা (ব্রহ্মাণঃ) হে ব্রাহ্মণগণ! (অস্য) এই বালকের (ইদম্) কেশ (বপত) কর্তন করো (অয়ম্) এই বালক (গোমান্ অশ্ববান্ প্রজাবান) গো, অশ্ব ও সন্তান যুক্ত (অস্তু) হউক।

অর্থাৎ, অভিজ্ঞ বিদ্বান যেরূপ ক্ষুর দ্বারা শান্তস্বভাব রাজা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে মুণ্ডন করেন সেইরূপ ক্ষুর দ্বারা হে ব্রাহ্মণগণ! এই বালকের কেশ কর্তন করো। এই বালক গো, অশ্ব ও সন্তান লাভ করুক।

শিশুর মস্তক মুণ্ডন অর্থাৎ মাথার চুল ফেলে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে চূড়াকর্ম সংস্কার। ১ বছর বা ৩ বছর বয়সে এই সংস্কার পালন করতে হয়।

কর্ণবেধ

লোহিতেন স্বধিতিনা মিথুনং কর্ণয়োঃ কৃধি।
অকর্তামশ্বিনা লক্ষ্ম তদস্তু প্রজয়া বহু।।
[অথর্ববেদ ৬।১৪১।২]

পদার্থ :- (লোহিতেন স্বধিতিনা) ধাতু নির্মিত অস্ত্র দ্বারা (কর্ণয়োঃ মিথুনং কৃধিএ) দুই কর্ণের ছেদ (অশ্বিনা) বৈদ্য (লক্ষ্ম) শোভাবর্দ্ধক কার্যকে (অকর্তাম্) করুক (তৎ) সে (প্রজয়া বহু অস্তু) প্রজার কল্যাণকারী হউক।

অর্থাৎ, ধাতু নির্মিত অস্ত্র দ্বারা দুই কর্ণের ছেদ করা বৈদ্য এই শোভাবর্ধক কার্য করুক। সে প্রজার কল্যাণকারী হউক।

শিশুর জন্মের তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে নাক ও কান ছিদ্র করাকে কর্ণবেধ বলা হয়। এই সংস্কার এখন প্রায় বিলুপ্ত বলা যায়। আমাদের এই সংস্কার গুলোর রক্ষা করা ও পালন করা উচিৎ।

উপনয়ন

আচার্যঽ উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তন্রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভি সংযন্তি দেবাঃ।।
অথর্ববেদ ১১/৫/৩

পদার্থ :- (ব্রহ্মচারিণম্) ব্রহ্মচারীকে (উপনয়মানঃ আচার্য) যজ্ঞোপবীতদাতা আচার্য (অন্তঃ গর্ভম্ কৃণুতে) নিজের মধ্যে রাখে (তিস্রঃ রাত্রীঃ বিভর্তি) তিন রাত্রি পর্যন্ত ধারণ করে (তম্) সেই ব্রহ্মচারীকে (উদরে) গর্ভে (জাতম্) দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিলে (তম্) তাহাকে (দ্রষ্টুম্) দর্শন করিবার জন্য (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অভিসংযন্তি) সব দিক হইতে একত্র হয়।

অর্থাৎ, আচার্য ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন দিয়া নিজের সাহচর্যে রাখেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন অবিদ্যা অন্ধকার দূর করিতে নিজের বিদ্যার বেষ্টনীর মধ্যে তাহাকে ধারণ করেন। যখন ব্রহ্মচারী বিদ্যালাভ করিয়া দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে তখন তাহাকে দেখিবার জন্য সব দিক হইতে বিদ্বানেরা আসিয়া সমবেত হন।

সংস্কার দ্বারা শিষ্যকে গুরুর সাহচর্যে শিক্ষাগ্রহণ করে বিদ্বান ব্যক্তিতে পরিণত হতে নিয়ে যাওয়া হয় তার নাম "উপনয়ন"। এই সংস্কারের মাধ্যমে গুরু তার শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিয়ে দীক্ষিত করেন। উপনয়ন বর্তমানে কেবল এক বর্ণের জন্য প্রচলিত থাকলেও বৈদিক কর্মগত বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী এটি আবশ্যিক সংস্কার যা নারী পুরুষ, বর্ণ নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক। উপনয়নের স্বীকৃতির মাধ্যমেই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে ও শাস্ত্রচর্চাদি কর্মে অধিকার লাভ করে।

বেদারম্ভ

ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্বিভর্তি তস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ।
প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্বানং বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্।।
[অথর্ববেদ ১১।৫।২৪]

পদার্থ :- (ভ্রাজদ্ ব্রহ্ম) উজ্জ্বল বৈদিক জ্ঞানকে (ব্রহ্মচারী বিভর্তি) ব্রহ্মচারী ধারণ করে (তস্মিন্) তাহাতে (বিশ্বে দেবাঃ) সব দিব্যগুণ (অধি সমোতাঃ) অবস্থান করে (প্রাণপানৌ ব্যানং বাচং মনঃ হৃদয়ম্) প্রাণ, অপান, ব্যান, বাক্য, মন, হৃদয় (ব্রহ্ম) জ্ঞান (আৎ) এবং (মেধাম্) মেধাকে সে (জনয়ন্) প্রকট করে।

অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় বৈদিক জ্ঞানকে ধারণ করে। এজন্য তাহার মধ্যে সব দিব্যগুণ অবস্থান করে। সে প্রাণ, অপান, ব্যান, বাক্য, মন, হৃদয়, জ্ঞান ও মেধাকে উৎকর্ষ দান করে।

গায়ত্রী মন্ত্র থেকে শুরু করে চারবেদ অধ্যয়নের জন্য যে নিয়ম-ধারণ করতে হয়, তাকে বেদারম্ভ সংস্কার বলে। যেদিন উপনয়ন হয় সেদিনই এই সংস্কার করতে পারে। অথবা ১ বছরের মধ্য করতে হয়।

সমাবর্তন

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎস উ শ্রেয়ান ভবতি
জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।।
[ঋগ্বেদ ৩।৮।৪]

পদার্থ :- (পরিবীতঃ) ব্রহ্মচর্যপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া (সুবাসাঃ) উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া (যুবা) যৌবন লাভ করিয়া (আগাৎ) গার্হস্থ্য আশ্রমে যিনি আসেন (স উ) তিনিই (জায়মানঃ) দ্বিজত্ব লাভে প্রসিদ্ধ হইয়া (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ (ভবতি) হন (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত (মনসা) মনন শক্তি দ্বারা (দেবয়ন্তঃ) বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশক (ধীরাসঃ) ধৈর্য্য যুক্ত (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) সেই পুরুষকে (উন্নয়প্তি) উন্নতিশীল করেন।

অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্যপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া, উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়া যৌবন কালে যিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে উপনীত হন তিনিই দ্বিজত্ব লাভে খ্যাতি অর্জন করিয়া মহৎ হন। ধ্যানপরায়ণ, মননশীল, জ্ঞানপ্রচারক, ধৈর্যবান বিদ্বানেরা সেই পুরুষকে উন্নতি লাভে সহায়তা প্রদান করেন।

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুগৃহ থেকে গৃহে ফিরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণের জন্য সমাবর্তন সংস্কার পালন করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এমন অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে।

বিবাহ

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেনাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি।।
[অথর্ববেদ ১১।৫।১৮]

পদার্থ :- (ব্রহ্মচর্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া (কন্যা) কুমারী (যুবানাং পতিং বিন্দতে) যুবা পতিকে লাভ করে (ব্রহ্মচর্যেণ) ব্রহ্মচর্য লাভ করিবার পর (অনড্বান অশ্বঃ) বৃষভ ও অশ্বসংজ্ঞক পুরুষ (ঘাসং জিগীর্ষতি) ভোগ্য পদার্থকে ভোগ করিতে পারে।

অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবার পর কুমারী কন্যা যুবা পতিকে লাভ করিবে। বলবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ভোগ্য পদার্থকে সম্যক ভোগ করিতে পারে।

সমাবর্তনের পর গৃহাশ্রমের জন্য শুভ গুণ কর্ম ও স্বভাবের দিক দিয়ে সকলদিক দিয়ে তুল্য ও প্রীতিযুক্ত হয়ে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনই বিবাহ সংস্কার। বিয়ের পর গৃহাশ্রমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ লাভের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরোপকার করা, ঈশ্বর উপাসনা ও গৃহকর্ম করা, সত্যধর্মে একনিষ্ঠ হওয়া এবং ধর্মানুসারে চলা কর্তব্য।

বানপ্রস্থ

ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে।।
[ঋগ্বেদ ১০।১৪৬।৫]

পদার্থ :- (ন বা অরণ্যানিঃ হন্তি) বন্যজন্তু এই বাণপ্রস্থীকে হনন করে না (অন্যশ্চ ইৎ ন অভিগচ্ছতি) এবং অন্যান্য প্রাণীও ইহার নিকট আসিয়া ইহাকে হনন করে না (স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায়) সুস্বাদু ফল খাইয়া (যথাকামম্) শান্তিময় (নিপদ্যতে) জীবন অতিবাহিত করে।

অর্থাৎ, বানপ্রস্থ গ্রহণকারীকে বন্য পশু হনন করে না, অন্যান্য প্রাণীও ইহাদিগকে হনন করে না। ইহারা সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেন।

বিবাহের পরে ধর্মানুসারে সন্তান প্রাপ্তি সহ সংসারের কাজ শেষ করে মহাত্মাগণের সহিত যোগাভ্যাস শাস্ত্র আলোচনা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভের প্রযত্ন করাকে বানপ্রস্থ সংস্কার বা গৃহাশ্রমসংস্কার বলে।

সন্ন্যাস

ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্তসত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্তসোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
[ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৪]

পদার্থ :- (ঋতদ্যুম্ন) সত্যকীর্তি (সত্যকর্মন) সত্যকর্মা (রাজন) জ্ঞানময় (ইন্দো) আনন্দ দাতা সন্ন্যাসী! (ঋতং, বদন) সত্য বাণী বলিয়া (সত্যং বদন্) ন্যায় বাক্য বলিয়া (শ্রদ্ধাম্ বদন্) সত্য ধারণের উপদেশ করিয়া (ধাত্রা) পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা (পরিষ্কৃতঃ) শুদ্ধ হইয়া (ইন্দ্রায়) যোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য (পরি,স্রব) প্রযত্ন করো।

অর্থাৎ, হে সত্যকীর্তি, সত্যকর্মা, জ্ঞানময়, আনন্দদাতা সন্ন্যাসী। সত্য বাণী ও ন্যায় বাক্য বলিয়া, সত্য ধারণের উপদেশ করিয়া এবং পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া যোগবলে সিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করো।

সংসারের মায়া মোহত্যাগ ও পক্ষপাত ত্যাগ করে, বৈরাগ্যবান হয়ে পরোপকারের জন্য ও সমাজের কল্যাণের জন্য পরিভ্রমণ করা সন্ন্যাস সংস্কার।

অন্ত্যেষ্টি

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওওম্ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর।।
[যজুর্বেদ ৪০।১৫]

পদার্থ :- (ক্রতো) হে কর্মকর্তা জীব (ওওম্) পরমাত্মার নাম (ক্লিবে) সামর্থ্যের জন্য (স্মর) স্মরণ করো (বায়ুঃ) আধ্যাত্মিক প্রাণ (অনিলম্) আধিদৈবিক প্রাণ (অমৃতম্) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও (অথ) তৎপর (ইদং শরীরম্) এই ভৌতিক শরীর (ভস্মান্তম্) ভস্মে শেষ হয়।

অর্থাৎ, হে কর্মশীল জীব! শরীর ত্যাগের সময় পরমাত্মার নাম ওওম্ স্মরণ করো আধ্যাত্মিক প্রাণ, আধিদৈবিক প্রাণ এবং পুনরায় সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও। তৎপর এই ভৌতিক শরীর ভস্মে পরিণত হউক।

মৃত্যুর পর দাহকার্য সম্পাদন করা অর্থাৎ অন্তিম সংস্কারকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলে। এর পর মানবের এই শরীরের জন্য আর কোনো সংস্কার নেই। অন্ত্যেষ্টিই শেষ সংস্কার। এরপর শরীরের জন্য অন্য কোনো সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে না। এর নাম নরমেধ, পুরুষমেধ, নর যাগ ও পুরুষ যাগ। শ্মশান ভূমিতে জ্বলন্ত চিতায় সমিধা, সুগন্ধি, রোগনাশক ওষধি এবং ঘৃত আহুতি দ্বারা মৃত শরীরকে ভস্মীভূত করাই অন্ত্যেষ্টি।

সমাজে সন্ন্যাসীদের কী প্রয়োজন? তারা কি সমাজের উপর বোঝা নয়?

শরীরে যেমন মাথার প্রয়োজন হয়, তেমনি সমাজের এর সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য, ধার্মিক, বিদ্বান, তপস্বী, সম্পদ, সম্মান এবং পুত্র/শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন এমন সন্ন্যাসীদের প্রয়োজন।

গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কোন সংস্কারগুলো করা হয়?

গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পুংসবন ও সীমান্তোন্নয়ন সংস্কার করা হয়।

বিভিন্ন সংস্কারে সম্পাদিত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বা অর্থ কী?

বিভিন্ন সংস্কারে সম্পাদিত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে অনেক সংকেত বা প্রতীক লুকিয়ে থাকে। কীভাবে জীবনে এগিয়ে যেতে হয় তার বোধ তৈরি হয়। কিছু ব্রত ও প্রতিজ্ঞাও লাভ হয়। এই আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালো সদাচার ও শিষ্টাচার শেখানো হয়।

পৃথিবীতে মৃত দেহের অন্তিম সংস্কারের জন্য কোন পদ্ধতি প্রচলিত আছে?

পৃথিবীতে মৃত দেহের অন্তিম সংস্কারের জন্য মৃতদেহকে মাটিতে পুঁতে ফেলা, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, বন-জঙ্গল, পাহাড় প্রভৃতি স্থানে খোলা রেখে দেয়া এবং পুড়িয়ে ফেলার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

এর মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কোনটি এবং কেন?

এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মৃতদেহকে দাহ করা। কারণ এতে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি পরিবেশের খুব কম ক্ষতি হয়। অল্প পরিমাণ ভূমিতে লক্ষ,কোটি মৃতদেহ দাহ করা যায়।

উপনয়ন

উপনয়ন কী?

উপনয়ন হলো ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে ৯ম সংস্কার যার মাধ্যমে একজন বালক/বালিকা গুরুকুলে প্রবেশ করে বেদ অধ্যায়নের জন্য।

উপনয়ন শব্দের অর্থ 'নিকটে নিয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুর (উপ) সমীপে (নী) নীত হওয়া যায় যে কর্ম দ্বারা তাই উপনয়ন সংস্কার। উপনয়ন শব্দের সহজ অর্থ **যজ্ঞপবীত** বা **পৈতা ধারণ**।

উপনয়নের পর উপনীত ব্যক্তিকে দ্বিজ বলা হয়, দ্বিজ শব্দের অর্থ দুইবার জাত বা দ্বিতীয়বার জন্ম। বৈদিক দর্শন অনুযায়ী, প্রথমবার ব্যক্তির জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে এবং দ্বিতীয়বার জন্ম হয় যজ্ঞপবীত ধারণ করে।

সাহি বিদ্যাতন্তং জনয়তি। তচ্ছেষ্ঠং জন্ম।শরীরমেব মাতাপিতরৌ জনয়তঃ।। [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১।১৫-১৭]

অর্থাৎ, সেই আচার্য ব্রহ্মচারীকে বিদ্যা হতে উৎপন্ন করেন। এটিই শ্রেষ্ঠ জন্ম। মাতাপিতা কেবল শরীরকেই উৎপন্ন করে থাকেন। এইরূপে আচার্য দ্বারা ব্রহ্মচারীর দ্বিজত্ব লাভ হয়।

এবিষয়ে মহর্ষি মনু স্পষ্ট করে বলছেন দ্বিজত্বই মুক্তির দ্বারস্বরূপ -

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।

সম্ভতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবভিজায়তে।।

আচার্যন্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।

উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাঽজরামরা।

[মনুস্মৃতি ২।১৪৭-১৪৮]

অর্থাৎ, মাতাপিতা পরস্পর সন্তান প্রাপ্তির কামনায় মিলিত হয়ে বালকের যে জন্ম দান করেন- মাতৃগর্ভ হতে জন্ম লাভ হয়, তার সেই জন্মমাত্রকেই মনুষ্যের সাধারণ জন্মমাত্র বলে বুঝতে হবে। পরন্তু বেদজ্ঞ আচার্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি অনুযায়ী গায়ত্রীমন্ত্রের দীক্ষাপূর্বক উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সেই বিদ্যার্থীকে যে জন্ম বা বর্ণ প্রদান করে, সেই জন্মই সত্য- সেই জন্মই অজর অমর।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে-

আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।

তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টমভি সংযন্তি দেবাঃ।। [অথর্ববেদ ১১।৫।৩]

অর্থাৎ, (১) (উপনয়মানঃ আচার্যঃ) উপনয়নদাতা আচার্য- গুরু (ব্রহ্মচারিণম) ব্রহ্মচারী- শিষ্যকে (অন্তঃ গর্ভম্ কৃণুতে) নিজের মধ্যে রাখেন।

(২) (তম) সেই ব্রহ্মচারীকে (উদরে) গর্ভে (তিস্রঃ রাত্রীঃ বিভর্তি) তিন রাত্রি পর্যন্ত ধারণ করেন।

(৩) যখন সেই ব্রহ্মচারী গর্ভে (জাতম্) দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে বাহিরে আসে, তখন (তম) তাকে (দ্রষ্টুম) দেখার জন্য (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অভিসংযন্তি) চতুর্দিক হতে সমবেত হন।

মন্ত্রটির প্রথমার্থে বলা হয়েছে যে আচার্য ব্রহ্মচারীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে রাখেন। এইরূপ বলার তাৎপর্য এই যে শিষ্যকে কেবল স্বীয় পরিবারভুক্ত বা স্বীয় কুলের অন্তর্ভুক্ত করে রাখেন নাই, উপরন্তু তাকে আপন হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়ে রাখেন। এস্থলে নিজের মধ্যে বা গর্ভের মধ্যে বলার তাৎপর্য এই যে স্বীয় কুলের অন্তর্ভুক্ত বা পরিবারভুক্ত

বিদ্যার্থীর নিকট গুরুদেবের কোন কথায় গোপন থাকে না। হৃদয়ের সমস্ত কথা শিষ্যকে স্পষ্টভাবে খুলে বলেন, ছল বা কপটতাদি দ্বারা কোন কিছুই গোপন রাখেন না। যে বিদ্যা স্বয়ং প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই বিদ্যা শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়ে থাকেন। এইরূপে গুরু-শিষ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিষ্যও গুরুদেবের উদরের মধ্যে থেকে তাকে কোন প্রকার ক্লেশ দেন না।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আচার্য ব্রহ্মচারীকে নিজের উদরের মধ্যে (তিস্রঃ রাত্রীঃ) তিন রাত্রি পর্যন্ত ধারণ করে থাকেন। উদরে ধারণ করার তাৎপর্য পূর্বে বলা হয়েছে। এস্থলে "তিন দিন' না বলে তিন রাত্রি বলা হয়েছে। "রাত্রি" শব্দ "অন্ধকার" বোধক। অন্ধকার বলতে "অজ্ঞানতা" বুঝায়। এই অজ্ঞানতা দূর করার জন্যই গুরুর নিকট তিন রাত্রি বাস করার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম- আত্মবিষয়ে অজ্ঞানতা,

দ্বিতীয়- স্থূল-সূক্ষ্ম সৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞানতা এবং তৃতীয়- আত্মার ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে অজ্ঞানতা;

এই তিন প্রকার অজ্ঞানতা নাশ করাই বিদ্যাধ্যয়নের উদ্দেশ্য। ত্রিবিধ অজ্ঞানতা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত শিষ্য গুরু গৃহে বাস করতে থাকে। গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারের রাত্রিতে জীব শয়ন করে থাকে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানসূর্য উদয় হলে প্রবুদ্ধ শিষ্য রাত্রিকাল অতিবাহিত করে স্বচ্ছ সুন্দর উজ্জ্বল প্রকাশ্য দিবালোকে এসে উপস্থিত হয়। গুরুগৃহে তিন রাত্রি বাসের তাৎপর্য কঠোপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। যম নচিকেতাকে বললেন-

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেহনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।

নমস্তেস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব।।

[কঠোপনিষদ ১।১।৯]

অর্থাৎ, যম বললেন- হে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নচিকেতা! তুমি অতিথি, অতএব তুমি নমস্কার-যোগ্য। তোমাকে নমস্কার করছি, তোমার কল্যাণ হোক। হে নচিকেতা! তুমি যে আমার ঘরে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করেছ, এক কারণে প্রত্যেক রাত্রির জন্য তিনটি বর প্রার্থনা করো।

এখানে উপাখ্যান রূপে যমকে আচার্য্য হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে কেননা যম এর ব্যুৎপত্তি- "য়ময়তি ব্যনস্থাপয়তি ধর্মাধর্ম য়ঃ সঃ য়মঃ" অর্থাৎ যার দ্বারা ধর্মের ব্যবস্থা হয়, তার নাম 'যম'।

আর উপনয়ন ব্যতিত সেই ব্যক্তি এক জন্মই লাভ করে ও শূদ্র রয়ে যায়-

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।।

[মনু ১০।৪]

অর্থাৎ, [আর্যদের মধ্যে] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিদ্যাধ্যয়নরূপী দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত করায় দ্বিজ বলা হয়। চতুর্থজন বিদ্যা অধ্যয়নরূপী দ্বিজন্ম না হওয়ায় একজাতি বা একজন্ম নেয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম থেকে রহিত শূদ্র বর্ণের অধিকারী হয়, তা ব্যতিত পঞ্চম কোনো বর্ণ নেই।

উপনয়ন কাদের ও কখন হয়?

উত্তর- উপনয়ন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ত্রিবর্ণে হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে শুধু তথাকথিত পদবিধারী ব্রাহ্মণদের উপনয়ন দেখে থাকলেও মূলত ত্রিবর্ণেরই উপনয়নের নিয়ম রয়েছে। যার প্রমাণ শাস্ত্রে তাদের উপনয়নের বয়সসীমা থেকেও পাওয়া যায়।

মনুসংহিতাতে-

গর্ভাষ্টমেছদে কুবীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্ । গর্ভাদে কাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ [মনু-২।৩৬]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণপুত্রের গর্ভাষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়পুত্রের গর্ভএকাদশ এবং বৈশ্যপুত্রের গর্ভদ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন সংস্কার করবে। সাধারণতঃ এটিই হলো দ্বিজ বালকের উপনয়নের মূখ্যকাল।

আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে।

আদ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ ।।

[মনু ২।৩৮]

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের ইচ্ছুক সন্তানের গর্ভাবধি **১**৬ বৎসর পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণের ইচ্ছুক সন্তানের ২২ বৎসর পর্যন্ত এবং বৈশ্য বর্ণে ইচ্ছুক সন্তানের ২৪ বৎসর পর্যন্ত উপনয়ন সংস্কার করানো সম্ভব।

তাছাড়াও

অত্র প্রমাণানি-অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।।১।।

গর্ভাষ্টমে বা।।২।।

একাদশে ক্ষত্রিয়ম্।।৩।।

দ্বাদশে বৈশ্যম্।।৪।।

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ।।৫।।

আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য, অত উর্ধ্বং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।।৬।।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের (**১**।**১**৯।**১**-৬) প্রমাণ। পারস্করাদি গৃহ্যসূত্রেও এইরূপ প্রমাণ আছে]

অর্থ :- যে দিন জন্ম হয়েছে অথবা যে দিন গর্ভ স্থিতিলাভ করেছিল, সেই দিন হতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণ শিশুর জন্ম বা গর্ভ হতে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয় শিশুর এবং জন্ম বা গর্ভ হতে দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্য শিশুর যজ্ঞোপবীত সংস্কার করবে। ব্রাহ্মণের **১**৬ (ষোল), ক্ষত্রিয়ের ২২ (বাইশ) এবং বৈশ্যের ২৪ (চব্বিশ) বৎসর বয়সের পূর্বে অবশ্যই যজ্ঞোপবীত হওয়া চাই। যদি পুর্বোক্ত কালে যজ্ঞোপবীত না হয়, তবে তারা পতিত বলে গণ্য হবে।

তবে যাদের মেধা প্রখর, তাদের বয়সসীমার পূর্বেই উপনয়ন করানো বিধান রয়েছে-

ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।

রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ।।

[মনু ২/৩৭]

অনুবাদঃ বিশেষভাবে ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও প্রকৃষ্টভাবে তার অর্থগ্রহণজনিত তেজ কামনা থাকলে ব্রাহ্মাণের উপনয়ন গর্ভ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৩ বৎসর ৩ মাস থেকে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) হওয়া কর্তব্য। (এখানে কামনাটি পিতার এবং তার দ্বারা পুত্রকে বিশেষিত করে বলা হচ্ছে 'ব্রহ্মবর্চস্' ইত্যাদি। পিতা কামনা করতে পারেন যে, পুত্রটি 'ব্রহ্মবর্চস্' যুক্ত হোক। পিতার এই কামনাটি পুত্রের উপর আরোপ করে বলা হচ্ছে- 'এইরকম কামনাযুক্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন হবে পঞ্চম বৎসরে'। প্রকৃত পক্ষে, পুত্র তখন একেবারেই বালক, তাই তার পক্ষে ব্রহ্মবর্চস্ যুক্ত হওয়ার কামনা করা সম্ভব নয়। এটি পিতারই কামনা)। বিপুল হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বলপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের (এটিও ক্ষত্রিয় পিতার প্রার্থনা, বালক পুত্রের নয়) উপনয়ন গর্ভসহ ৬ষ্ঠ বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৪ বৎসর ৩ মাস থেকে ৫ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) হওয়া উচিত; বাণিজ্যার্থী বৈশ্যের (এটিও বৈশ্য পিতার প্রার্থনা)

উপনয়ন গর্ভের অষ্টম বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৬ বৎসর ৩ মাস থেকে ৭ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) দেওয়া বিধেয়।। ৩৭।।

সুতরাং এটা নির্ণেয় যে উপনয়ন ত্রিবর্ণেই হয় এবং তা করা কর্তব্য।

তাছাড়াও আমরা যদি কয়েকশ বছর আগের ইতিহাসও দেখি তখনও এমন ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। যেমন=

72 specimens of castes in india বই যা ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়, সেই বইয়ে ইউরোপিয়ানদের দেখা ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার ছবি রয়েছে। সেখানেও আমরা বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের যজ্ঞোপবীত ধারণ দেখতে পাই।

তবে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে শূদ্রের কি উপনয়ন হয় না? না হলে তা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের বর্ণাশ্রমের ধারণা থাকতে হবে।

আমরা জানি বৈদিক বর্ণাশ্রম হলো গুণ ও কর্ম ভিত্তিক, জন্মভিত্তিক নয়।

ন কুলং বৃত্তহীনস্য প্রমাণমিতি মে মতিঃ ।

অন্তেষ্বপি হি জাতানাং বৃত্তমেব বিশিষ্যতে ॥

[বিদুরনীতি ২।৪১]

ভাবার্থ- আচারহীন মনুষ্যের উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করা তাঁর শ্রেষ্ঠতা বা তার কুলীন হওয়ার প্রমাণ নয় । এটি আমার দৃঢ় নিশ্চয় । শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়েও মানুষ আচারশীলতার গুণে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় (উন্নীত হয়) ।

মূলত জন্মগত ভাবে আমরা সকলেই শূদ্র হয়ে থাকি

'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ, সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে'-

[স্কন্দপুরাণ, নাগরখন্ড, ২৩৯।৩১]। কেননা আমরা তখন সকলেই মূর্খ বা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকি, অতঃপর গুরুকুলে জ্ঞানার্জনের ভিত্তিতে তার বর্ণ নির্ধারিত হয় বা উচ্চ বর্ণে তারা উন্নিত হয়। সেক্ষেত্রে যারা জ্ঞানার্জন বা জ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয় তারা আর অন্য বর্ণে উন্নীত হতে পারে না বিধায় শূদ্রই রয়ে যায়।

এখন কোনো পিতা-মাতাই তার সন্তানকে মূর্খ বানাতে চাবেন না বিধায় সেই ৩ বর্ণেই উপনয়ন তারা করিয়ে থাকেন। তবে মূল বর্ণ নির্ধারণ গুরুর মাধ্যমেই শিক্ষা চলাকালীন সময়েই নির্ধারিত হয়।

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে সকলের শৈশবে শূদ্র থাকাকালীনই উপনয়ন হয়ে থাকে আর তা হয়ে থাকে ত্রিবর্ণে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপনয়ন/যজ্ঞোপবীত না নিলে কি হবে?

যদি কেউ শাস্ত্রবিহিত কালের মধ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ না করে। অর্থাৎ বেদবিধি অমান্য করে গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করতে না যায়, তা হলে তজ্জনিত অপরাধের জন্য শাস্ত্রকার তাহাকে পাতিত্যদোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি কারো নির্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না হত, তা হলে তাকে মনু মহারাজের আইন অনুসারে সাবিত্রীপতিত, ব্রাত্য ও আর্যবিগর্হিত বলে ঘোষণা করা হতো। বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না করলে এই শ্রেণীর পতিত, ব্রাত্য ও নিন্দিত ব্যক্তিদিগকে কোন গুরুকুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।

আষোড়শাদ ক্ষিণস্যানতীত; কালঃ। আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্থ্য, আচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যশস্য, অত উর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি ||

[আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র ১।১৯।৫-৬]

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর ও ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্যন্ত উপনয়নকাল অতীত হয় না। ইহাই হলো উপনয়নের **গৌণকাল**। এই বিহিত কালের মধ্যে উপনয়ন না হলে দ্বিজপুত্রেরা সাবিত্রীপতিত অর্থাৎ বেদের গায়ত্রীমন্ত্র হতে ভ্রষ্ট বা ব্রহ্মযজ্ঞাদি কর্ম হতে রহিত হওয়ায় সমাজে দূষিত, অপবিত্র এবং ধর্মহীন অনার্য পুরুষ বলে পরিগণিত হয়। এবিষয়ে রাজর্ষি মনুর উক্তি আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন-

অত উর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ ॥ [মনু ২।৩৯]

অর্থাৎ যদি এই তিন বর্ণের পুত্রেরা যথাকালে সংস্কৃত না হয় অর্থাৎ পৈতা ধারণ না করে পবিত্র না হয়, তাহলে নির্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হলে তারা বিদ্যা অধ্যয়ন থেকে রহিত হয়ে ভ্রষ্ট, ব্রতহীন ও আর্যনিন্দিত হয়ে থাকে।

উপনয়নের গুরুত্ব কি?

উত্তরটি বিশাল। তবে তা সহজে জানতে হলে আমাদের উপনয়নের মূল উপাদান যজ্ঞোপবীত সম্পর্কে জানতে হবে। যজ্ঞোপবীত বা পৈতা যা উপনয়নে পরিধান করা হয় এবং সন্ন্যাসের পূর্ব অব্দি ধারণ করা হয়। এই যজ্ঞোপবীত এর বহু নাম। বঙ্গের চলতি কথায় "পৈতা বা পইতা" বলা হয়। এটি সংস্কৃত ভাষার "পবিতা বা পবিত্র" শব্দের অপভ্রংশ শব্দ। এটি ধারণ করলে মানুষ পবিত্র হয় বলে এর নাম "পবিত্র" হয়েছে। এটি স্বয়ং মন্ত্রপূত পবিত্র এবং অপরকেও পবিত্র করে তোলে। এর আরও বহু নাম আছে। যথা- দীক্ষাসূত্র, যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, সাবিত্রীসূত্র, উপবীত, পরিবীত, যজ্ঞোপবীত, ব্রতচিহ্ন, ব্রতবন্ধ, দ্বিজচিহ্ন, স্মৃতিচিহ্ন, বিদ্যাচিহ্ন, দ্বিজায়নী, ত্রিকী, ত্রিবৃত তন্তু, বাস্ (ব্রাহ্মণ গ্রন্থে) ও সুবাস।

দীক্ষাসূত্র- দীক্ষা গ্রহণকালে আচার্যদেব দীক্ষার চিহ্নস্বরূপ যে সূত্র যজমানের স্কন্ধে ঝুলিয়া দেন, তাই দীক্ষাসূত্র।

যজ্ঞসূত্র- বিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য আচার্যদেব যে সূত্র ধারণ করিয়ে থাকেন, তারই নাম যজ্ঞসূত্র।

ব্রহ্মসূত্র- ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের জন্য উপনয়ন সময়ে যে সূত্র ধারণ করান হয়, তাই ব্রহ্মসূত্র।

সাবিত্রীসূত্র- গুরুদেব সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করার সময় যে সূত্র ধারণ করিয়া থাকেন, তাহই সাবিত্রীসূত্র।

যজ্ঞোপবীত- **যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ** অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমাত্মার নাম যজ্ঞ। উপ সমীপে, বি- বিশেষ প্রকারে, ই (গমন করা) ক্ত করিলে উপবীত শব্দ সিদ্ধ হয়। যজ্ঞ নামক পরমাত্মার সামীপ্য লাভার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞের জন্য এবং তৎসহ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞাদি করার জন্য আচর্যদেব যে সূত্র ধারণ করান, তাই যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞ শব্দে "মিলন বা একতাবন্ধন" বুঝায়। যেমন ঈশ্বরে ও জীবে মিলন সাধিত হয়, তেমনই সমস্ত মনুষ্যকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করার জন্য তাদেরকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করে যে দীক্ষাসূত্র ধারণ করান হয়, তারই নাম যজ্ঞোপবীত বা মিলনসূত্র। বেদবিধি

অনুসারে সকলে এইরূপ মিলনসূত্র ধারণ করলে অস্পৃশ্যতা বর্জন সিদ্ধ হয়, সর্বনাশকর জাতিভেদ প্রথা বিদূরিত হয়, সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত হয় এবং প্রাদেশিক ভেদভাবও দূরে সরে যায়। যজ্ঞোপবীত শব্দটির মধ্যে বহু নিগূঢ় অর্থ নিহিত আছে।

সতত উদ্যত থেকে কর্তব্য পালনের প্রযত্ন করাকে ব্রত বলা হয়। এই ব্রতকে সর্বদা স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রাখার জন্য অধ্যাপক বালককে বিধিবৎ যে চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেন, তার নাম ব্রতবন্ধ, ব্রতচিহ্ন ও বিদ্যাচিহ্ন ইত্যাদি।

পরিবীত- পইতার প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম। ঋগ্বেদের ১।১২৮।১, ১।১৬৪।৩২, ৩।৮।৪, ৪।১।৭, ৪।৩।২, ১০।৬।১ এবং ১।১৩০।৩ মন্ত্রগুলিতে এটি দৃষ্ট হয়।

ত্রিবৃত তন্তু- বৈদিক নাম। ঋগ্বেদের ৯।৮৬।৩২ এবং ১০।৫৭।২ মন্ত্রে এটি দৃষ্ট হয়।

এই যজ্ঞোপবীতের ৩টি সুতো ও ৫টি গিঁট বা "ব্রহ্মগ্রন্থি" থাকে।

স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথাবিদে।
নয়ন্নৃতস্য প্রশিষো নবীয়সীঃ পতির্জনীনামুপ যাতি নিষ্কৃতম্।।
[ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৩২]

এই মন্ত্রে সেই যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মচারীর বর্ণনা রয়েছে, যিনি গুরুকুল হতে বাহির হয়ে বেদবিদ্যা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন- (স) সেই ব্রহ্মচারীকে (যথাবিদে) জ্ঞানপূর্বক (ত্রবৃতং তন্ত্রং তন্বানী তিন তার সুতার পৈতা ধারণ করে (সূর্যস্য রশ্মিভি পরিব্যত) যেন সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হন। (ঋতস্য প্রশিষঃ নবীয়সীঃ নয়ন) ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়মের প্রসংশাময়ী নূতন নূতন বাণী প্রচার করে (জনীনাম্ পতিঃ) জনসমূহের নেতা (নিষ্কৃতং উপযাতি) স্বাধীনভাবে বিতরণ করেন। এই মন্ত্রে স্পষ্টই বর্ণিত হয়েছে যে ব্রহ্মতেজধারী স্নাতক (Graduate) ত্রিবেষ্টন সূত্রের পৈতা ধারণ করেন। ত্রি (তিন) শব্দপূর্বক বৃ (আবৃত করা) ধাত-ক্লিপ্ প্রত্যয় করলে ত্রিবৃৎ শব্দ সিদ্ধ হয়, যার অর্থ তিনগাছা বুঝায় এবং তন্তু অর্থে সুতা বুঝায়।

যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষাততঃ।
তমাহুতং নশীমহি।। [ঋগ্বেদ ১০।৫৭।২]

এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীতের মহিমা বর্ণিত হয়েছে- (যঃ) যে (যজ্ঞস্য) যজ্ঞের (প্রসাধনঃ) অলঙ্করণ (তত্ত্বঃ) সূত্র (দেবেষু) বিদ্বানদের মধ্যে (আততঃ) প্রচলিত আছে (তম) সেই (আহুতম) পূজিত সূত্রকে (নশীমহি) আমরা প্রাপ্ত হই।

এই সূত্রত্রয় কর্তব্যপরায়ণ মানুষকে তিনটি ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কি সেই তিনটি ঋণ যা প্রত্যেকটি মানুষকে শোধ করতে হয়?

ওতম্ স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্রুথম তন্ত্র তন্বস্ত্রিব্রুথ ম যথাবিদে। প্রশিশো নবিয়সি পথিরজনীনমুপা যথি নিষ্কৃতম।। [ঋগ্বেদ ৯.৮৬.৩২]

অনুবাদ: এই তিনসূত্র পরিধান করতে হয় জীবনের প্রকৃত জানতে।

১) দেবঋণ- ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের বেঁচে থাকার অপরিহার্য এ পৃথিবী, পরিবেশ ও প্রানীকুলের প্রতি দায়িত্ব। পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলা, পরিবেশ শুদ্ধ করা ও জীবে সেবা করা দেবঋণের অন্তর্গত।

২) পিতৃঋণ- পিতামাতার প্রতি ঋণ। নিঃস্বার্থভাবে এই দুই জীবন্ত দেবতা আমাদের মানুষ করেন, তাদের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করা আমাদের কর্তব্য।

৩) ঋষিঋণ- প্রাচীন বৈদিক ঋষিগন থেকে শুরু করে নিজের গুরু-শিক্ষক, এরাই আমাদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলেন। এদের সেবা, অনুস্মরণ করাই ঋষিঋণ।

এই তিন সূত্রের আরো কিছু মহত্ত্ব রয়েছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ- তিন। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক- তিন। ব্রহ্মাচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ। এই তিন আশ্রমে থেকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়। [চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসে প্রবেশ করিলেই এটি নামিয়ে দেওয়া হয়]। যেহেতু এটি তিন আশ্রমে ধারণ করা হয়, অতএব এই অভিপ্রায়েও এতে তিনটি সূত্র।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র-প্রকৃতির তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রতীক। বাল্যাবস্থায় তমোগুণ প্রধান থাকে। বালক অন্ধকার রূপ অজ্ঞানে নিমগ্ন থাকে। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় গুরু সম্পর্কে আসিলে এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়, ব্রহ্মচর্য অবস্থার পর মনুষ্য গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে, সেসময় রজোগুণ প্রধান থাকে। শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে থেকে রজোগুণ হতে পৃথক্ থাকা গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম। পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করে বানপ্রস্থ অবস্থায় সত্ত্বগুণও ত্যাগ করা উচিত এবং সন্ন্যাস অবস্থায় ত্রিগুণাতীত হইয়া যাওয়া উচিত।

এই তিনটি সূত্র মনুষ্যকে ত্রিগুণাতীত হওয়ার দিব্য প্রেরণা দান করে। যখন মনুষ্য ত্রিগুণাতীত হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে যজ্ঞোপবীতের কোন প্রয়োজন থাকে না।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র- পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতি। এই তিন অস্তিত্বের সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত করায় ও সঙ্কেত প্রদান করে। পরমাত্মা কি? তাঁর স্বরূপ কী? তাঁর প্রাপ্তি কিভাবে হতে পারে, ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হয়ে থাকেন। এইরূপ-আমি কে? কোথা হতে এসেছি? আমাকে কোথায় যেতে হবে? আমার জীবনের লক্ষ্য কী? ইত্যাদি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান ও যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিগণ করে থাকেন। প্রকৃতি কী? একে কিভাবে কাজে লাগিয়া জীবনে সুখী হওয়া যেতে পারে? ইত্যাদি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করার চেষ্টা তিনি করে থাকেন। যে যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি আমাকে পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতির রহস্য অর্থাৎ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকেন। তাদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা সার্থক। যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র-সবিচার, সদ্বাণী ও সদ্ আচারের দিকেও নির্দেশ করে।

তাছাড়াও যজ্ঞোপবীতে থাকা ৫ গীট আমাদের পঞ্চমহাযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নিত্য অনুসরণ করলেই ত্রিঋণ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এভাবেই মূলত যজ্ঞোপবীত আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে থাকে এবং তা পরিধান অর্থ জীবনের প্রতি দশায় আমরা সেই ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েই চলছি যা আমাদের যেকোনো অপকর্ম বা পাপকর্ম করা থেকেও রক্ষা করবে।

মূলত উপনয়নের গুরুত্ব এখানেই যে প্রতিটা মানবকে কর্তব্যরত রাখা ও তার জীবন সুনিপুণ ভাবে সঠিক পথে চালনা করা। যার স্মরণে সর্বদা সেই তিন ঋণ থাকবে সে কখনো অধর্ম করতে পারবে না, সে কখনো নিজ ধর্ম-সংস্কৃতি ত্যাগ করতে পারবে না; সে কখনো তার গুরুজন পিতামাতা প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব পালন করতে পারবে না। সে দেব ঋণগ্রস্থ থাকায় পঞ্চমহাযজ্ঞ করতে সে তৎপর থাকবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞাধিকার অর্জনও এই উপনয়ন দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। আর উপনয়নের এই যজ্ঞপবীত আমাদের জন্য এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এর রক্ষার্থে সনাতনীরা প্রাণ অব্দি বলিদান করতো; আর তাইতো বর্বর শাসকদের অন্যতম লক্ষ্যও ছিল এই যজ্ঞোপবীত নষ্ট করে ধর্ম থেকে তাদের পৃথক করা। উদাহরণ স্বরূপ সম্রাট আকবরের নির্মমতা-

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর চিত্তোর দূর্গে হামলা করে প্রায় ৩০০০০ লোককে হত্যা করে। সেদিন প্রায় ৩০০ রাজপুত নারী জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দেন নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে। কত রাজপুত সেদিন মারা পড়েছিল তা জানতে সম্রাটের খুব

ইচ্ছা হয়। কিন্তু অত মৃতদেহ গুনবে কে ? শেষে সম্রাটের আদেশে সব মৃত দেহের পৈতা খুলে আনা হল এবং দাড়িপাল্লায় ওজন করা হলে মোট ওজন দাড়ালো সাড়ে চুয়াত্তর মণ।

ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন,

"The recorded amount was 74.50 mans of about eight ounce each. (V.A. Smith, ibid-91)"

এভাবেই আমাদের ধর্ম, মর্যাদার সর্বোচ্চ প্রতীক এই পৈতা ম্লেচ্ছদের ভয়ে ও পরবর্তীতে আমাদেরই লোভী ধর্ম ব্যবসায়ীদের জন্য এখন জনসাধারণের কাছে অপ্রতুল হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের পতনের তাই অন্যতম কারণও এই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা।

নারীর উপনয়ন -

আমরা উপনয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এবং মনুষ্য মাত্রের জন্য এ সংস্কার নির্ধারিত তাও বুঝলাম। তবুও আমাদের কে নারীর উপনয়ন নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে এটি লজ্জাজনক। কেননা অবৈদিক ও একইসাথে নারীবিদ্বেষী মতালম্বীদের জন্য বর্তমান সময়ে নারীর উপনয়নকে অবাস্তব কাণ্ড বলেই মনে করা হয়। তারা উপনয়ন তো দূর, নারীর বেদাধিকারকেও অস্বীকার করে। বিষয়টি লজ্জাজনক।

তবে বৈদিক মান্যতা ও নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা আমাদের শাস্ত্র দ্বারাই সিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।

অনডবান্ব্রহ্মচর্যণাশ্চো ঘাসং জিগীর্ষতি।।

পদার্থ :- (ব্রহ্মচর্যেণ) ব্রহ্মচর্য [বেদাধ্যয়ণ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ] করে (কন্যা) কন্যা [কামনাযোগ্য পুত্রী] (যুবানম্) যুবা [ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে বলবান] (পতিম্) পতি [পালনকর্তা বা ঐশ্বর্যবান ভর্তা] কে (বিন্দতে) পায়। (আনড্বান) [রথ পরিচালনাকারী] ষাঁড় অথবা (অশ্বঃ) অশ্ব (ব্রহ্মচর্যেণ) ব্রহ্মচর্যের দ্বারা [নিয়মের দ্বারা উর্ধ্বরেতা হয়ে] (ঘাসম = ঘাসেন্) ঘাসের দ্বারা (জিগীর্ষতি) সীংচন [গর্ভাধান] করতে চায়।

ভাবার্থ : কন্যার ব্রহ্মচর্যের দ্বারা পূর্ণ বিদুষী এবং যুবতী হয়ে পূর্ণ ব্রহ্মচারী যুবক পুরুষের সাথে বিবাহ করা উচিত। যেমন ভাবে বলবান্ ষাঁড় ও ঘোড়া ইত্যাদি শীঘ্রগামী পশু ঘাস ইত্যাদি খেয়ে ব্রহ্মচর্য নিয়মের মাধ্যমে সঠিক সময়ে বলবান সন্তান উৎপন্ন করে, ঠিক তেমন ভাবে বিদ্বান যুবক তার অনুরূপ বিদুষী কন্যা বিয়ে করে নিয়মপূর্বক বলবান ও সুশীল সন্তান করা উচিত। [অথর্ববেদ ১১/৫/১]

এখন আমরা এটি সকলেই জানি ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবেশের জন্য উপনয়ন সংস্কার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তবুও আমরা এর ব্যাখ্যা দেখলে-

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ৩।১।১০০ সূত্র অনুযায়ী ব্রহ্মচর্যম্ শব্দটির ব্যুৎপত্তি-

ব্রহ্মচর্যম্ = ব্রহ্ম +চর্ + যত্

এখানে ব্রহ্ম কী? **ব্রহ্মণে বেদলাভায় চর্যম্ চরণম্** অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে বেদকে লাভ করার জন্য আচরণীয় চর্যই ব্রহ্মচর্য। ভাষ্যকার আরো বলছেন **আত্মনিগ্রহবেদাধ্যায়নাদিতপঃ** বা আত্মনিগ্রহ করে বেদাধ্যায়নাদি তপের অনুশীলন করাই ব্রহ্মচর্য।

পূর্বো জাতে ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ধর্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ

তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্।।

পদার্থঃ (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মণঃ) বেদাভ্যাস [এর কারণ] দ্বারা (পূর্বঃ) প্রথম [গণনাতে প্রথম] (জাতঃ) প্রসিদ্ধ হয়ে (ধর্মম) প্রতাপ (বসানঃ) ধারণ করে (তপসা) [নিজের ব্রহ্মচর্যরূপ] তপস্যার মাধ্যমে উঁচু হয়ে আছেন। (তস্মাত্) তার [ব্রহ্মচারী] থেকে (জ্যেষ্ঠম্) সর্বোৎকৃষ্ট (ব্রাহ্মণম্) ব্রহ্মজ্ঞান এবং (ব্রহ্ম) বৃদ্ধিকারক ধন (জাতম্) প্রকট [হয়ে থাকে], (চ) এবং (সর্বে দেবাঃ) সকল বিদ্বানগণ (অমৃতেন সাকম্) অমরত্বের [মোক্ষ সুখ] সাথে [থাকেন]।। ৫।।

ভাবার্থঃ ব্রহ্মচারী বেদের অভ্যাস এবং জিতেন্দ্রিয়তা আদি তপোবলের কারণে উচ্চমানের সৎকার পেয়ে সকলকে ধর্ম এবং সম্পত্তির মার্গ তথা দিশা দেখিয়ে বিদ্বানদের কাছে পরমানন্দ পৌঁছে দেন।।

[অথর্ববেদ **১১**।৫।৫]

উপনয়নাং ক্রুত্ব পশ্চাদ বিবাহম করতি স ব্রহ্মবাদিনী।

তথৈব য প্রথমাত উপনয়নাং ক্রুত্ব সদ্য ইব বিবাহম ততঃ বেদমধিতে স সদ্যবধুঃ।।

[হরিত ধর্মসূত্র ৩০।২১-২২]

অর্থাৎ যে নারী উপনয়ন নিয়ে বেদশিক্ষা সম্পূর্ণ করে পরে বিয়ে করে তাঁকে ব্রহ্মবাদিনী বলে আর যে নারী তা না করে প্রথমে বিয়ে করে তাকে সদ্যবধূ বলে আর তারও উচিৎ বিয়ের পড় উপনয়ন ও বেদশিক্ষা করা।

অর্থাৎ উপনয়ন ও বেদশিক্ষার এতই তাৎপর্য যে বয়সকালে তা করা না গেলেও বিয়ের পর হলেও তা করতে হবে সে নারী হোক বা পুরুষ।

প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন জপেৎ। "সোমোহদদদ গন্ধর্বায়েতি ॥" [গোভিল গৃহ্যসূত্র ২।১।১৯]

অর্থাৎ, সুবস্ত্রশোভিতা (যজ্ঞোপবীতিনীম্) যজ্ঞোপবীত পরিহিতা কন্যাকে দান করেয়া "**সোমোহদদদ্**" 'আদি মন্ত্র জপ করবে।

দ্বিঃবিধা: স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিত্যঃ সদীবধ্বশ্চ তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নম্যোন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্শাচর্যা চেতি

[হরিত ধর্মসূত্র নামে নানা স্থানে উদ্ধৃত]

অর্থাৎ নারীরা উপনয়ন নেবে, বেদ পড়ে ব্রহ্মবাদিনী হবে, যজ্ঞ করবে এবং সন্ন্যাস গ্রহন করতে পারবে।

ইতিহাস থেকেও প্রমাণ দেখা যাক-

রামায়ণে যখন শ্রীরাম তাঁর বনবাসের খবর নিয়ে কৌশল্যার গৃহে গেলেন তখন মাতা কৌশল্যা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছিলেন-

"অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা"

অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছিলেন। [বাল্মীকি রামায়ণ ২।২০।২৪-২৫]

সপ্তম শতকে মহাকবি বানভট্ট দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কাদম্বরী ও হর্ষচরিত কাদম্বরী গ্রন্থে কাদম্বরীর উল্লেখ্য চরিত্র হল মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতার বর্ণনা দেখি-তিনি যখন তপশ্চর্যায় রত তখন ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করায় তাঁর শরীর পবিত্র হয়ে উঠেছিল। হর্ষচরিতে সরস্বতী সম্বন্ধে একইভাবে বলা আছে কাঁধ থেকে লম্বমান যে যজ্ঞ উপবীত, তার দ্বারা সরস্বতীর দেহ পবিত্র হয়ে উঠেছিল।

আমরা তামিলনাড়ুতে অবস্থিত বৃহদিশ্বর মন্দিরে দেবী সরস্বতীর প্রতিমাতেও যজ্ঞোপবীত পরিধান দেখতে পাই-

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পালিত কন্যা - মঙ্গলময়ী বন্দোপাধ্যায়, যাকে আমরা 'সংহিতা দেবী' এবং 'মামণি' নামে চিনি — উনার উপনয়ন সংস্কার করিয়েছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।
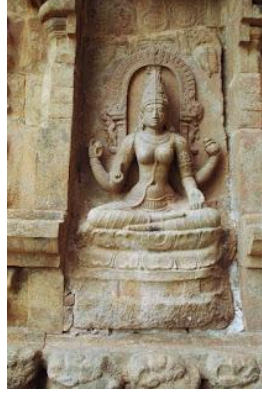
উপনয়নের পর ব্রহ্মচারিণী এবং পরে সন্ন্যাসিনীরূপে অখণ্ড আদর্শের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

যজ্ঞোপবীতধারিনী মঙ্গলময়ী বন্দোপাধ্যায়ের বাল্যকাল এর ছবি-

যজ্ঞোপবীত এর ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সার্বভৌমত্ব -

পারসীদের মধ্যে যজ্ঞোপবীত পারসীদিগের মধ্যে নবজাত সংস্কারে বালক ও বালিকাদিগকে **'কুস্তী'** নামক সূত্র পরিয়া দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে প্রো. ওয়াডিয়া লিখেছেন-

It corresponds to the Hindu Upanayan. It marks the initiation of a boy or girl into the religion and therefore the ceremony is called the Navjote which literally means new birth. (Zoroaster by Prof. A. R. Wadia. P-40) 1

অর্থাৎ ইহা হিন্দুদিগের উপনয়ন সংস্কারের অনুরূপ। ইহার দ্বারা বালক-বালিকার ধর্ম প্রবেশ চিহ্নিত হয়, সুতরাং এই সংস্কারকে 'নবজোত' বলা হয়, যার আক্ষরিক অর্থ নবজন্ম।

'খৃষ্টানদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত'।

রোমন ক্যাথলিকগণ যজ্ঞোপবীতের মত পশমের এক প্রকার বিশিষ্টসূত্র সর্বদা কমরে বেঁধে রাখে। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় এরও তিনটি গ্রন্থি হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান পাদ্রীদেরও ধার্মিক অনুষ্ঠানে কোমরে দড়ি বাঁধা হয়।'

মুসলমানদিগের মধ্যে সূত্ররূপ যজ্ঞোপবীতের মত মালার প্রচলন আছে। হজ যাত্রা করার সময় প্রত্যেক হাজীকে স্বীয় কণ্ঠে শ্বেত বস্ত্র খণ্ড ধারণ করতে হয়। সেটিও যজ্ঞোপবীতের প্রতীক।

শিখদের মধ্যে যজ্ঞোপবীত-

অসবিধি শ্রীনানক গতি দানী। উপদেশন কী উচরত বাণী।। বদন বদন বিপ্রন বরি আঙ্গ। যজ্ঞোপবীত দিয়ো পহরাঙ্গ।

[নানক প্রকাশ, পৃ. ৪২]

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ- "পন্থ প্রকাশ" পুস্তকে জ্ঞানীসিংহ, গোবিন্দ সিংহের বিবাহকালে তাঁর শরীর সৌন্দর্য বর্ণন করে লিখেছেন-

পীত পুনীত উপরনা ধোতী

জোতি নবি ছবি ছাজে।

পীত জনেউ মনোবদন

সসি পৈ বিজরী বিজরী ভ্রাজে। [পন্থ প্রকাশ, পৃ. ৫১০)]

(এখানে জনেউ শব্দটির অর্থ যজ্ঞোপবীত-অনুবাদক)

জৈনদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত।

জৈন তীর্থংকরগণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন, এই সম্বন্ধে ঋষভদেবের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো-

কণ্ঠহারে লতাং বিভ্রন কটিসূত্র কটাতটে। ব্রহ্ম সূত্রোপবীতাঙ্গম্ সংগাংগোপ্প মিবাদ্রি রাট ।।

[আদি পুরাণ, পৃ. ৪৮০]

এখানে ঋষভদেব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তাঁর কণ্ঠে দিব্যহার শোভা পাচ্ছিল, কটিতে কটিবদ্ধ এবং বক্ষঃস্থলে পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত ছিল। এই জন্য ঋষভদেব পর্বতোপরি গঙ্গাধারাবৎ শোভা পাচ্ছিল।

শিখা

উপনয়ন ও ব্রহ্মচারীদের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হলো শিখা। ছেলেদের জন্য শিখা ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যজুর্বেদ ১৯।৯২ এ কীর্তি ও লক্ষ্মী প্রাপ্তিহেতু শিখা ধারণের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং শিখার কেশের সাথে ব্যাঘ্রের অর্থাৎ সিংহের লোমের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

শিখিভ্যঃ স্বাহা [অথর্ব ১৯।২২।১৫] অর্থাৎ শিখাধারীদের কল্যাণ হউক।

মহর্ষি দয়ানন্দ একে আবশ্যক বলে অভিহিত করেছেন-

যজ্ঞোপবীত ও শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান দিগের ন্যায় হওয়া বৃথা। [সত্যার্থ প্রকাশ **১১** সমুল্লাস]

শিখা আমাদের মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দেয়। আমাদের দেহের কয়েকটি অত্যন্ত Sensitive অঙ্গের মধ্যে মাথার উক্ত স্থানটি অন্যতম। এবিষয়ে ঋষি সুশ্রুত বলছেন-

মস্তকাভ্যান্তরত উপরিষ্ঠাৎ শিরসন্ধি সন্নিপাতো।

রোমা বর্তোৎধি পতিঃ তত্রাপি সদ্য এব মরণম্।।

[সুশ্রুত সংহিতা ৬।২০]

মস্তিষ্কের মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে যেখানে কেশাবর্ত সেখানে শিরা ও সন্ধির সংযোগ হইয়াছে। উহা অধিপ নামক মর্মস্থল। তথায় আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

আমাদের মহর্ষিগণ উক্ত মর্মস্থলের রক্ষা হেতু শিখা ধারণের বিধান নির্দেশ করেছেন। এই স্থলে গোক্ষুর পরিমাণ শিখা ধারণ করলে শীতকালে শীত হইতে, গ্রীষ্মকালে ভয়ংকর তাপ হইতে এবং বর্ষাকালে জলধারা প্রযুক্ত আঘাত হতে রক্ষা হতে পারে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধিকতর মুন্ডন মাথা থাকায় উক্ত স্থানের সুরক্ষাতে শিখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার যাদের সারা মাথায় চুল আছে তাদেরটাও সুরক্ষিত হলেও শুধু গোক্ষুরে অধিক চুল বা শিখা রাখলে তা সুরক্ষা প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে ডা. হ্যমন এর মতামত-"আমি কয়েক বৎসর ভারতে থাকিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন করিয়াছি। এখানকার অধিবাসীগণ বহুকাল হইতে মস্তকে শিখা ধারণ করে, যার উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে অর্ধ শিরোপরি গোক্ষুর পরিমাণ শিখা রাখে। আমি তাহাদের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছি। বৌদ্ধিক উন্নতিতে শিখা অবশ্যই অত্যন্ত সাহায্য করে। শিরোপরি শিখা ধারণ করা লাভপ্রদ। ইউরোপে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে লোকেরা মস্তকে দীর্ঘকেশ ধারণ করে না। হিন্দুধর্মে আমি গভীর বিশ্বাস রাখি। আমি নিজেও শিখা রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।"

(গার্ড ম্যাগাজিন সংখ্যা ২৫৮, পৃ. ১২৩ ১৮৯৯ খ্রীঃ)

তাছাড়াও গত কয়েক বৎসর ধরে পাশ্চাত্য বিদ্বানগণও শিখা সম্বন্ধে অন্বেষণ করেছেন, এই বিষয়ে তারা সময়ে-সময়ে ভীষণ ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তাদের মত প্রকাশ করে থাকেন। তাদের সম্মতি এখানে উদ্ধৃত করা হলো-

স্যার চার্লস পার্লি ল্যুকস, ফিলাডেলফিয়া (আমেরিকা)- "শিখার সহিত শরীরের সেই প্রয়োজনীয় অঙ্গের অতিঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, যার দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চালন হয়। যখন থেকে আমি শিখার বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, তখন হতে আমি স্বয়ং শিখা রাখতে আরম্ভ করেছি।

-(সরস্বতী পত্রিকা ইং ১৯১৪ সং ৭)

Dr. I. E. Clark-MSD (ডা. আই. ই. ক্লার্ক, এম. এস. ডি.) "আমি যখন চীন দেশ ভ্রমণ করিতে গেলাম, তখন চীনাবাসীদেরও ভারতীয়দের মত অর্দ্ধ শিরোপরি শিখা ধারণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তখন হইতে আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াই, আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আর্যদের প্রত্যেক নিয়ম বা কর্ম বিজ্ঞান সম্মত, এবং শিখা ধারণ করা আর্যদের ধর্মমাত্র নহে, সুষুন্না কেন্দ্র রক্ষা-হেতু ঋষিমুনিদের অদ্ভুত আবিষ্কারও বটে"।

মি. আর্ল থামসেন- "সুষুন্না রক্ষাহেতু আর্যগণ শিখাধারণ এবং ইউরোপের অধিবাসীগণ দীর্ঘ কেশ ধারণ করেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই উভয়ের মধ্যে শিখা ধারণ করাকে আমি উপযুক্ত মনে করি, কেননা ইহা শরীরের ঠিক সেই স্থানের রক্ষা করে, মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে সার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি।" (অ্যালার্ম ম্যাগাজিন ১৯২১ খ্রীঃ সংখ্যা-৭১, পৃ. ১৯৬)

পাশ্চাত্যে জগতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিক্টর ঈ. ক্রোমর (Victor E. Cromer) সাহেব লিখিয়াছেন-

"ধ্যানের সময় ওজঃশক্তির আবির্ভাব ঘটে। কোন বস্তুর প্রতি চিন্তনশক্তি একাগ্র করিলে ওজঃশক্তি তৎপ্রতি ধাবিত হয়, যদি পরমাত্মার প্রতি চিত্ত একাগ্র করা হয়, তাহা হইলে মস্তকোপরি শিখা-পথে ওজঃশক্তি আবির্ভূত হয়। পরমাত্মার শক্তি সেই পথ দিয়া মনুষ্যের মধ্যে আসিতে থাকে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন যোগী পুরুষগণ এই উভয়শক্তির চমৎকার বর্ণেরও দর্শন করেন। যে শক্তি পরমাত্মার দিক দিয়া আমাদের মধ্যে আসে তাহার বর্ণন করা সম্ভব নহে।"

হিব্রু জাতির মান্যগ্রন্থ "ত্যুণ্ড"-এ এ সম্বন্ধিত কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়, যদ্বারা ওই জাতির মধ্যেও শিখা ধারণ করার প্রথা ও প্রচলিত ছিল- জানা যায়।

মুসলমানদিগের তুর্কি টুপির উপরে কালো সূতার গুচ্ছ শিখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইউরোপিয়ান সৈন্যগণের শিরোস্ত্রাণের উপর পিতলের শিখা থাকে।

তাই আমাদের সকলের উচিৎ আমাদের সংস্কৃতি ধারণ করা ও তার রক্ষা করা।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দেখানো পথই আর্যের পথ

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম ও যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সনাতনীদের প্রাণপুরুষ, আদর্শ। তাঁদের প্রাত্যহিক কর্ম আমাদের জন্য মাপকাঠির ন্যায়। কেননা তাঁদের সম্পূর্ণ জীবনযাপন ছিল বেদোক্ত, তাইতো তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর- **আর্যশ্রেষ্ঠ**। ইতিহাস গ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণেও তাঁদেরকে আর্য নামে সম্বোধন করতে দেখা যায়- বেদজ্ঞাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে, বেদকে ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন বলছেন এবং পরম প্রমাণ হিসেবে সেই শাস্ত্রকেই অনুসরণের কথা বলছেন। সেই ভগবানের মুখনিশ্রিত বাণীকে অনুসরণ করেই আর্যসমাজ বেদকে পরম প্রমাণ ও সকল মান্যতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। আর্যসমাজের দশ নিয়মের ৩য় নিয়মে বলা হয়েছে- বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সকল আর্যের পরম ধর্ম।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো মিথ্যা বলতেন না। এমনকি পরিহাস পর্যন্ত না। সত্য ও ধর্মই তার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। [মহাভারত, অশ্বমেধিকপর্ব ৬৩।১৮,১৯]

আর্যসমাজের ৪র্থ নিয়মও তাই বলে- "সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকবে।" রামায়ণে মাতা সীতার অপহরণ তথা অপমান হোক আর মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, উভয় ঘটনাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম নারী অবমানকারীদের শাস্তি দেন এবং নারী অধিকার স্থাপন করেন। সেই আদর্শেই আর্যরা নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান ও সমাধিকার নিশ্চিত করে। সমাজে তথা সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যেখানে নারীদের বেদাধিকার, বেদ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় সেখানে আর্যসমাজই সর্বোচ্চ নারী গুরুকুল পরিচালনা করেন ও বেদপাঠী চতুর্বেদী তৈরি করে। রামায়ণের রাবণ বধ হোক আর শ্রীকৃষ্ণের কংস সহ সকল অসুর বধ, সবেতেই আমরা ধর্মনাশক, ধর্মবিরোধীদের তাদের কর্মযজ্ঞের শিক্ষা পাই। সেই শিক্ষা ধারণ করেই আর্য তথা আর্যসমাজ জন্মলগ্ন থেকেই বিধর্মীদের অপ্রচার খন্ডন ও স্বধর্ম মন্ডন করে আসছে যা সনাতন ধর্মে সর্বোচ্চ। সনাতন ধর্মের মহান দুই প্রাণ পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম শ্রীরাম এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যাঁরা যুগের পর যুগ এই ভারতবর্ষ সহ সকল বিশ্বে বসববাসরত মানুষের জন্য প্রেরণার স্রোত হিসেবে দৃষ্টান্ত রাখার জন্য। কিন্তু, বাস্তবতার নিরিখে যদি বিবেচনা করার চেষ্টা করি তবে বাইরের মানুষের কথা বাদ দিলাম..... সনাতনী হিসেবে আমরা কতজনইবা শ্রীরাম আর শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করেছি?? আর কতজনই বা তাদের গুণ-কর্ম-স্বভার ধারণ করার চেষ্টা করেছি?? তাই আসুন সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাঁদের গুণ-কর্ম-স্বভাব জানার চেষ্টা কর এবং তা আমাদের নিজেদের জীবনে ধারণ করার চেষ্টা করি।

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম দেখতে কেমন ছিলেন?

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণে শ্রীরামের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমরা আদিকাণ্ডের ১ম সর্গেই পেয়ে থাকি।। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বাঙ্গীন দৈহিক বর্ণনা সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত । আসুন মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরাম সম্পর্কে কি বলেছেন তার রচনায় আমরা পর্যবেক্ষণ করি -

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্ ।

উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি ।।

[বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪।১]

অনুবাদঃ তখন, পদ্মপলাশনয়ন শ্যামল অতুলনীয় রাম সারথি সুমন্ত্রকে বললেন—'পিতার কাছে আমার বার্তা জানান '

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ।

গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ।।

[বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৩৫।১৫]

অনুবাদঃ (হনুমান বললেন) 'শ্রীরামচন্দ্র বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, শঙ্খগ্রীব এবং সুদর্শন মুখমণ্ডল সম্পন্ন পুরুষ। সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন, (অর্থাৎ গলার অস্থিযুগল মাংসপেশীতে আবৃত), রক্তিমাভাযুক্ত নেত্রবান। তিনি 'রাম' এই নামে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।

সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ ।।

[বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৩৫।১৬]

অনুবাদঃ (হনুমান বললেন) "তাঁর (শ্রীরামের) কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়, তাঁর গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল, তিনি বীর ; সুঠাম আকৃতি এবং সুসমঞ্জস ,অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন ও শ্যামকান্তি।

ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।

অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ ।।

স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ।

তাবুভৌ নরশার্দূলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ ।।

[বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৩৫।২২-২৩]

অনুবাদঃ তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণও অত্যন্ত শক্তিমান। অনুরাগ, সৌন্দর্য ও সদ্‌গুণের সমাহারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমান। তিনি (লক্ষ্মণ) সুবর্ণকান্তি ও রূপবান। শ্রীরামচন্দ্র শ্যামসুন্দর ও মহাযশস্বী ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র -

১। প্রশস্ত ও দৃঢ় কাঁধ , সুঠাম আকৃতি

২। সুদর্শন মুখমণ্ডল,

৩। দীর্ঘবাহু, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত

৪। রক্তিমাভ চোখ, কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়

৫। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ

ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিলেন । অতঃ শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র কেউ যদি অংকন করতে চায় বা চিন্তন করতে চায় তবে এই বিষয়গুলো অবশ্যই তাকে অনুসরণ করতে হবে ।

কেমন ছিলেন শ্রী রামচন্দ্র ও তাঁর পাণ্ডিত্য?

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ । [বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড-১।১৪]

অর্থঃ শ্রী রামচন্দ্র বেদবেদাঙ্গ তত্ত্ববেত্তা ছিলেন।

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ। [বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড-১।২০]

অর্থঃ শ্রী রামচন্দ্র সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতক তথা যথাবৎ বেদাঙ্গ জ্ঞাতা ছিলেন।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।

যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥

[বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড-১।১২]

অর্থঃ শ্রী রামচন্দ্র ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজা-কল্যাণব্রতী, যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং যোগসমাধিমান পুরুষ।

আস্তিকো ধর্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘবঃ[বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-২৭।৩৬৫]

অর্থঃ শ্রী রামচন্দ্র আস্তিক, ধার্মীক ও নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। রাম মর্যাদাবান ছিলেন।

লক্ষীশ্চন্দ্রাদপেযাদ্বা হিমবাণ্ বা হিমং ত্যজেত্। অতিযতসাগরো বেলাং না প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ।।"

[বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড-৭৯।১৩]

অর্থঃ চন্দ্রমা যদিও চন্দ্র কে ছেড়ে দেয়, হিমালয় হিমকে ছেড়ে দেয়, হতে পারে সমুদ্র নিজের মর্যাদাকে ছেড়ে সীমায় আটকে যায় কিন্তু আমি (শ্রীরামচন্দ্র) পিতার কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ছাড়তে পারবো না।

রামের সদ্গুণ

ক্ষমা যস্মিং স্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্ম কৃতজ্ঞতা।

অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতিমম ।।

[বা০ রা০, অযো০ ১২।৩৩]

অর্থ: দশরথ বললেন – হে কৈকেয়ী ! যে রামের মধ্যে ক্ষমা, তপ, ত্যাগ, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা এবং সর্বপ্রাণীদের জন্য দয়া বর্তমান সেই রাম সত্য, ব্যতি রেখে আমার কী গতি হবে ?

পিতার আজ্ঞাপালনশীলতা

এতাভ্যাং ধর্মশালাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।

মাতাপিতৃভ্যাসুক্তো্যহং কথমন্যৎ সমাচরে।।

[বা০ রা০ অযো০ ১০১।২২]

রাম বললেন, এই ধর্মশীল মাতাপিতা আমাকে বনবাসে যাওয়ার আজ্ঞা প্রদান করলেন আমি তা কী করে উল্লজ্ঘন করতে পারি।

রামের উদারতা

য়া প্রীতির্বহুমানশ্চ ময়্যযোধ্যানিবাসিনাম্ ।

মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেন ভরতে সা বিধীয়তে।।

[বা০ রা০ অযো০ ৪৩।৭]

অর্থ: বনবাস গমন করার সময় রাম বললেন- হে অযোধ্যা নিবাসীগণ! আপনারা আমার সঙ্গমে প্রীতি ও বহুমান্যতা বজায় রেখেছেন, আমাকে প্রসন্ন করার জন্য ভরতের সঙ্গেও সেইরূপ করবেন।

এটা রামের অত্যন্ত উদারতা যে রাজ্য ত্যাগ করা কালীন প্রজারা যাতে ভরতের সমাদরে ত্রুটি না করে সেইরূপ আদেশ দিলেন। সাধারণত দেখা যায় রাজ্য হস্তান্তরিত হলে উদারতা প্রদর্শন করা দূরের কথা লোকেরা প্রজাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে।

রামের গুণ ভরতের তুলনায় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভরতও একটি উত্তম আদর্শ কিন্তু রামের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণ বিদ্যমান যা ভরতের মধ্যে নেই এবং যা ভরতের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ –

তাং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমব্রবীৎ।

অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদা ক্ষম্যতামিতি।।

হন্যমানামিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্ট চারিনীম্।

যদি মাং ধর্মিকো রামো নাসুয়েন্মাতৃষাতকম্।।

ইমামপি হতাং কুবজাং যদি জানাতি রাঘবঃ।

ত্বাং চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভি ভাষিষ্যতে ধ্রুবম্।।

[বা০ রা০ অযো০ ৭৭।২১-২৩]

অর্থ: কুঁজো মন্থরাকে দেখে ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্নকে ভরত বললেন – স্ত্রীরা অবধ্য নতুবা পাপী দুষ্টাচারিণী কৈকেয়ীকে আমি বধ করতাম এবং যদি ধার্মিক রাম এই কর্মের নিন্দা না করতেন। রাম যদি এই কুঁজির হত্যার কথা শ্রবণ করেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিবেন।

এবং –

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সুক্ষ্মমপ্যরিসূদন ।
ন চাপি জননীং বাল্যাত্বং বিগর্হিতুমহসি।।

[বা০ রা০ অযো০ ১০১।১৭]

অর্থ: রাম বললেন, হে ভরত ! আমি তোমার দোষ দেখিনা, এবং তুমি মাতা কৈকেয়ীর কালোচিত স্বভাবের জন্য তাঁর নিন্দা করতে পারো না।

ভরতের ত্যাগ কম নয়। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রকূট গিয়েছিলেন এবং নন্দীগ্রামে বানপ্রস্থী হয়ে কাল কাটালেন; তবুও ভরত রামের মতো সুযোগ্য নেতা ছিলেন না। রাজসভা ও প্রজাবর্গ রামকে ভালবাসতো, তারা রামকে চাইতো যেমন রামের বচনে দর্শানো হয়েছে যে, আমার জন্য তোমাদের যে প্রীতি ও সম্মান আছে সেইরূপ ভরতের জন্যও প্রদর্শন করবে। ভরতের মুখ থেকেও রামের যোগ্যতার কথা শ্রবণ করুন।

চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধোহরেৎ।।

[বা০ রা০ অযো০ ৮২।১১]

অর্থ: ভরত বললেন যে, ব্রহ্মচর্যব্রতে পূর্ণ বিদ্যাস্নাতক বুদ্ধিমান ও ধর্মাচরণে যত্নশীল রামের রাজ্যকে কে আমার ন্যায় হরণ করতে পারে? এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, ভরত নিজেকে রাম অপেক্ষা রাজ্য পরিচালনায় যোগ্যহীন মনে করেন। শুধু তাই নয়, লঙ্কাবিজয় করার পর প্রত্যাগত রামকে রাজ্যভার সঞ্চালন করার জন্য নিজের অসামর্থ প্রকাশ করে ভরত বললেন -

ধ্রুবমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেন বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং নাহং বোঢুমুৎমহে।।
গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব বায়সঃ।
নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম।।

[বা০ রা০ অযো০ ১।২০]

অর্থ: হে রাম ! বলবান বৃষভ যদি শকটভার ছোট বৎসের উপর ন্যস্ত করে তাহলে সে যেমন তা বহনে অসমর্থ সেইরূপ আমিও রাজ্যভার বহন করতে অক্ষম। যেমন অশ্বের গতি গর্দভ এবং হংসের গতি কাক প্রাপ্ত করতে পারে না সেইরূপ আপনার সম্মুখে আমার পরিস্থিতি।

রামের গুণ লক্ষণের তুলনায় লক্ষ্মণের ত্যাগ ও তপস্যাও আদর্শ। তিনি গৃহ ও ধর্মপত্নী ঊর্মিলাকে ত্যাগ করে রামসহ বনবাসে যাত্রা করলেন। কিন্তু রামের মধ্যে লক্ষ্মণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ছিলো যে কারণে তিনি লক্ষ্মণেরও আদর্শ ছিলেন যা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হবে। প্রথমে লক্ষ্মণের ধারণা এবং পরে রামের ধারণার উল্লেখ করা হবে।

লক্ষ্মণের ধারণা

ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বষিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে।।
প্রোৎসাহিত্যেয়ং কৈকেয়্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা ।
অমিত্রভূতো নিঃ সঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি।।

[বা০ রা০ অযো০ ১১।১১,১২]

অর্থ: লক্ষ্মণ রামকে বললেন- যে ভরতের পক্ষ অবলম্বনে করতে চায় বা তাঁর হিত কামনা করে আমি তাঁদের সকলের বধ করবো। নরম হয়ে থাকা ঠিক নয়, নরমকে সকলে চাপতে থাকে। যদি আমাদের পিতা দশরথ কৈকেয়ীর দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে অসন্তুষ্ট তাহলে সেও বধযোগ্য হওয়ায় বধের পাত্র।

এইরূপ চিত্রকূটে রামকে নিয়ে যেতে ভরতের আগমন লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ বৃক্ষোপরি আরোহন করে বললেন – এই দুষ্ট ভরতকে আমি য়মালয়ে পৌঁছে দেবো কেননা সে বনে আপনাকে হত্যার জন্য আসছে। রাম তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে ভরত সাক্ষাৎ করতে আসেছ, তোমার ধারণা যথার্থ নয় । ভরত বা পিতাকে হত্যা করা অসৎ ও ঘৃণিত কর্ম।

পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে।

কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ।।

কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাংচিদাপদি।

ভ্রতো বা ভাতরং হন্যাৎসৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ ।।

[বা০ রা০ অযো০ ৯৭।৩,১৬]

অর্থ: হে লক্ষ্মণ ! পিতৃসত্য পালনার্থ যুদ্ধে ভরতকে হত্যা করে অপবাদগ্রস্ত রাজ্যের আমি কী করবো? কোনো অবস্থাতেই পুত্র দ্বারা পিতা ও প্রাণসদৃশ ভ্রাতার হনন কী করে সম্ভব?

রামের গুণ ও রাবণের গুণের তুলনা

রামের সঙ্গে রাবণের তুলনা কী করে হতে পারে ? রাবণ একজন ব্যক্তি যিনি রামের কুটি থেকে সীতাকে বলাৎ অপরহণ করেন এবং রাম সেই ব্যক্তি যিনি নিজস্থানে আগতা রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার দর্শন পর্যন্ত করতে চান না।

রামের বিশেষ গুণ

আস্তিকো ধর্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘবঃ।

[বা০ রা০, কিষি০ ২৭।৩৫]

রাম আস্তিক, ধার্মিক ও নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাম মর্যাদাবান ছিলেন -

রাম মর্যাদানাং চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ ।।

রামো বামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা।

[বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৫।১১]

অর্থ: হনুমান সীতাকে বললেন- রাম প্রজাগণ ও চাতুবর্ণের রক্ষক এবং লোক মর্যাদার স্বয়ং আচরণকারী এবং অন্যের দ্বারা আচরণ করিয়ে থাকেন।

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া বিভীষিনো বা সুগ্রীবো বা যদি বী রাবণঃ স্বয়ম্।।

শরণাগতকে অভয়দান সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ ব্রতং মম ।।

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যা ভয়ং ময়া।

বিভীষিনো বা সুগ্রীব বা যদি বী রাবণঃ স্বয়ম্।।

[বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৮।৩৪]

অর্থ: যখন বিভীষণ রামের শরণাগত হন তখন সুগ্রীবাদি তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন। রাম বললেন- আমি শরণাগত সকল প্রাণীকে অভয় দান দিয়ে থাকি। এইজন্য বিভীষণকে হত্যা না করে আমার নিকটে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে অভয় দান দিয়েছি। বিভীষণ কেন, যদি রাবণও স্বয়ং উপস্থিত হন, তাঁকে বধ না করে নিয়ে এসো।

রাম ধর্মপরায়ণ বেদবিৎ ও অস্ত্র বিশারদ ছিলেন

যস্মিন ন চলতে ধর্মো যো ধর্মে নাতিবর্ততে।

যো ব্রাহ্মস্ত্রং বেদ বেদান বেদবিদাংবরঃ।।

[বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২৮।১৯]

অর্থ: যে রামে ধর্ম চলায়মান নয়, যিনি ধর্মের অতিক্রমন করেন না, বেদবিশারদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মাস্ত্রকে জানেন।

স্বরাজ্যের সংস্থাপক

রাম লঙ্কাবিজয় করে সেখানে রাজ্য করেননি। সেখানকার নিবাসী রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করলেন কেননা প্রতিটি দেশে নিজের দেশের রাজা হওয়া উচিত। অন্য দেশকে পদাক্রান্ত করা সমীচীন নয়, মাতাই তার শিশুকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে পূর্ণসুখ প্রদান করতে পারে পরমাতা তা পারে না, সুতরাং রাম লঙ্কাকে স্বাধীন করে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাম রাজ্য ও আদর্শ শাসক

একজন শাসক হিসেবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম ছিলেন অনন্য। যুগের পর যুগ ধরে তার রাম রাজ্যকে সকলে আদর্শ রাজ্য হিসেবে উদাহরণ দিয়ে থাকে। এ যেন বর্তমান সময়ের বহুল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণ রাষ্ট্র।

তবে কেমন ছিলো মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এর রাম রাজ্য??

"ন পর্যদেবেন বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম।

ন ব্যধিজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি"।।

[বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।৯৮]

অর্থ: রামের শাসনকালে বিধবাদের ক্রন্দন শোনা যেত না, হিংস্র প্রাণীর ভয় ছিলো না, ব্যাধি থেকে উৎপন্ন ভয়ও ছিলো না অর্থাৎ রোগ কাউকে কষ্ট দিতো না।

নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ ।

ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যানি কুর্বতে।।

[বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।৯৯]

অর্থ: প্রজাগণ চোর-ডাকাতের ভয় থেকে রহিত, কেউ কারো প্রতি অনর্থ বা পাপ করতো না। বৃদ্ধদের সম্মুখে শিশুদের মৃত্যু হতো না।

সর্ব মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরো্যভবৎ।

রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্।।

[বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।১০০]

অর্থ: সকলেই সন্তুষ্ট ছিলো, সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলো, রামকে স্মরণে রেখে পরস্পর হিংসা করতো না।

"আসন্ বর্ষসহস্রানি ততা পুত্র সহশ্রিনঃ"

[বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।১০]

অর্থ: অনেক পুত্র-পৌত্র যুক্ত বংশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত চলত।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এমন রাজ্য পরিচালনা করতে যা একজন আদর্শ রাজা কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এর জীবন ছিলো বেদবিহিত ও ধর্মপরায়ণ। যার ফলে তিনি একজন আদর্শ শাসক হয়ে উঠেন।

"যস্মিন ন চলতে ধর্মো যো ধর্মে নাতিবর্ততে।

যো ব্রাহ্মস্ত্রং বেদ বেদান বেদবিদাংবরঃ"।।

[বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ২৮।১৯]

অর্থ: যে রামে ধর্ম চলায়মান নয়, যিনি ধর্মের অতিক্রমন করেন না, বেদবিশারদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মাস্ত্রকে জানেন। যেমন পবিত্র বেদ একজন উত্তম শাসকের গুণাবলি বর্ণন করে,

"তাহি শ্রেষ্ঠ বর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।

তা সৎ পতী ঋতাবৃধ ঋতাবানা জনে জনে"।।

[ঋগ্বেদ ৫।৬৫।২]

অর্থাৎ, শাসককে মহা তেজস্বী, অত্যন্ত জ্ঞানী, সুরক্ষক, সত্যের সহিত বর্ধ্বনশীল এবং প্রত্যেক সংঘে সত্যের প্রতিপালক হইতে হবে"।

"ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞ নিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বুরাণামভিশ্রিয়:।

অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোহপো অসৃজন্ননু বৃত্রতূর্যে"।।

[ঋগ্বেদ ১০।৬৬।৮]

অর্থাৎ, ব্রতনিষ্ঠ, যজ্ঞকর্তা, অত্যন্ত তেজস্বী, অহিংস কর্মা, অগ্নিহোত্রী, সত্যনিষ্ঠা, শঠতাহীন ক্ষত্রিয়রাই সম্মুখ সংগ্রামে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারে।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ শাসক। তিনি নিজেকে শাসক নয় একজন সেবক হিসেবে সকলের নিকট পৌঁছে যেতেন। আজকের আধুনিক যুগে সবাই সে কল্যাণকামী শাসক, কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রত্যাশা। সে কল্যাণকামী শাসকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। সে কল্যাণ রাষ্ট্রের সর্বোত্তম রাষ্ট্র হলো রাম রাজ্য।

আমাদের আদর্শ শ্রীরাম এর নিত্য দ্বিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ও উপাসনা

বৈদিক সভ্যতার প্রাণপুরুষ মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র রামায়ণে বেশ কয়েকটি স্থানে বৈদিক সন্ধ্যাপোসনা, যজ্ঞ,মহামন্ত্র গায়ত্রী জপ এবং ধ্যান করতে দেখা যায়।

যেমন আদিকাণ্ড ২৩|১-৩ এ ঋষি বিশ্বামিত্র ভোর বেলায় ঘাসের উপর ঘুমন্ত শ্রী রাম ও শ্রী লক্ষ্মণকে ডেকে দিচ্ছেন সান্ধ্যবন্দনা করার জন্য বলেছেন, অর্থাৎ মুনি ঘাসের উপর ঘুমিয়ে থাকা দুই ভাইকে ডেকে তুললেন এই বলে, হে কাকুৎস্থ [সূর্য বংশীয় প্রাচীন রাজা] এর বংশধর! ওঠো। কৌশল্যা সৌভাগ্যিনী তোমার মত পুত্র পেয়ে, ওঠো।

কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ - প্রাতঃকালীন কর্তব্যকর্ম সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে। তখন কি হলো?

স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ - ঋষির স্নেহপূর্বক কথা শুনে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব, নৃপতি রাম উঠলেন, আচমন করলেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রে জপ ও ধ্যান করলেন।

তাই আসুন আমাদের মহান পথ প্রদর্শক শ্রী রাম চন্দ্রের আদর্শে জীবন গড়ে তুলি, বৈদিক সন্ধ্যা পদ্ধতিতে নিজেদের সুশৃঙ্খল করে তুলে মহামন্ত্র গায়ত্রী জপ,যজ্ঞ,ধ্যানাদি করি।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

গীতাগায়ক শ্রীকৃষ্ণঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদাত্মক কাব্য। ভগবদ্গীতার অর্থ হলো " ভগবানের দ্বারা গীত গাওয়া হয়েছে"। এতে কৃষ্ণের বিচারগুলিকে বড় সুন্দর কাব্যাত্মক সংগ্রহ মহর্ষি ব্যাসের দ্বারা করা হয়েছে। গীতাতে জ্ঞান-কর্ম-উপাসনার অতি বিচিত্রতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন এবং বিচারের দ্বারা সংসার প্রভাবিত হয়। সংসার জীবনের অনুকরণ এবং বিচারের আচরণ-অনুসরণ করে থাকে। কৃষ্ণের জীবন দুই রূপে প্রাপ্ত হয়। একটি জীবনের রূপ মহাভারতে বর্ণিত রয়েছে এবং অন্যটি পুরাণগুলির মধ্যে। স্বামী দয়ানন্দ বলেছেন-

"শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস মহাভারতে অতি উত্তম। ওনার গুণ, কর্ম, স্বভাব এবং চরিত্র আপ্ত পুরুষদের সদৃশ। যাঁতে কোনো অধর্মের আচরণ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খারাপ কাজ কিছু করেছেন-এরকম লেখা নেই।"

গীতাতে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির উপদেশকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুইটির বাস্তবিক পরীক্ষা তো কর্মের দ্বারাই হয়। জ্ঞানী হোক কিম্বা ভক্ত যখন তাঁরা কর্ম কোলাহলময় সংসারে আসেন তখন তাঁদের বাস্তবিকতা প্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের মহিমা বলতে বলেছেন-

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" [গীতা ৪।৩৮]

এই সংসারে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কিন্তু যাত্রা তো এখনও অনেক আগে পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ, জ্ঞানাদধ্যানং বিশিষ্যতে।"

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্।"

[গীতা ১২।১২]

অর্থ: অভ্যাসের থেকে জ্ঞান বড়। জ্ঞানের থেকে ধ্যানের স্থান উপরে। ধ্যান থেকে বড় হলো কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ, কর্মফলকে পরমেশ্বরে অর্পন করে দেওয়া এঁর পরেই মনুষ্য শান্তি প্রাপ্ত করে। কর্মের মাপদন্ড, মাপ হচ্ছে-

"সর্বভূত হিতেরতাঃ" [গীতা ১২।৪]

- কর্ম এমন করো যাতে সমস্ত প্রাণীদের হিত সিদ্ধ হয়।

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণা এব চ।" [গীতা ১২।১৩]

প্রাণীমাত্রদের প্রতি অন্বেষ্টা, দ্বেষরহিত, প্রেম স্নেহপূর্বক থাকে। প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব এবং করুণার ভাবনা যেন থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করার শ্রেষ্ঠ মার্গ বলেছেন-

"স্বকর্মণাতমভ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" [গীতা ১৮।৪৬]

পরমেশ্বরের অর্চনা করার সামগ্রী, পূজা করার দ্রব্য হলো মনুষ্যের নিজের কর্ম। সেই কর্মের দ্বারা অর্চনা করলে মনুষ্য সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করে। শ্রীকৃষ্ণের মত মহামানবের জন্য অথবা অন্য কোনো শরীরধারী ঋষি, মুনি, গুরু, আচার্য্যের অর্চনা তো-

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি"

[গীতা ৯।২৬]

পত্রপুষ্প, ফলমূল, অন্নজলের দ্বারায় হয় কিন্তু পরমেশ্বরের ভক্তি, মানবজীবনের সফলতা, সিদ্ধি তো পরমেশ্বরকে নিজের কর্মকে অর্পিত করলে, নিষ্কাম কর্ম করলেই পাওয়া যায় -

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

[গীতা ১৮।৪৫]

গীতা গায়ক শ্রীকৃষ্ণের অতীব সম্মান রয়েছে সংসারের বিদ্বানদের কাছে। গীতার অনুবাদ সংসারের সমস্ত দেশের অনেক বিদ্বানেরা করেছেন। লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষদের জীবনে বেঁচে থাকার কলা শিখিয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ছিলো বহু আয়ামী। ছিলেন উনি বিদ্বান, বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রজ্ঞ এবং যোদ্ধাবীর। কেউ একটি অস্ত্র সম্বন্ধে জানে, অন্য কেউ অন্য অস্ত্রের মর্মকে জানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রধারী ছিলেনই- সাথে সাথে অসিধর, খড়গধর, ধনুর্ধর

এবং আরও অনেককিছু ছিলেন। চক্রধর তো উনি বেজোড় ছিলেনই, পরমনীতিবানও ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের "যোগেশ্বর" স্বরূপটিও অত্যন্ত মনমোহক ছিলো। গীতার শেষ শ্লোকটিতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে-

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।" [গীতা ১৮।৭৮]

- যেখানে, যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে পক্ষে ধনুর্ধর অর্জুন আছে, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং ধ্রুবনীতি রয়েছে- এটাই আমার সম্মতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আঠার অধ্যায়ের মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থের পুষ্পিকা পরম্পরা অনুসারে ছেপে চলে আসছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরকম কিছু লেখা থাকে-

"ওম্ তৎসদ্দিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে.... অমুক যোগীনাম..... অমুকো হ ধ্যায়ঃ।"

সঞ্জয় ওখানে আরও বলেন-

"ব্যাস প্রসাদাচ্ছুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।"

- মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপাতে আমি এই পরম রহস্যময় যোগকে বর্ণনা করার সময় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে স্বয়ং শুনেছি।

যোগের পরম্পরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই সনাতন যোগের পরম্পরার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে দিয়ে যাচ্ছেন - শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

"এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরং তপ।।
স এবায়ং ময়া তে হদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তো হসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।

[গীতা ৪।২-৩]

এই যোগ (রাজযোগ) পরম্পরা অনুসারে রাজর্ষিদের জ্ঞাত ছিলো, তাই মহাকালের মহান ব্যবধানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই যোগকে আজ তোমাকে শুনালাম। অর্জুন! তুমি আমার মিত্র এবং ভক্ত, সেইজন্যই এই উত্তম রহস্য তোমাকে বললাম।

এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -

"পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" -

আমার ঐশ্বর (ঈশ্বরের সাথে যুক্ত) যোগকে দেখো। শ্রীকৃষ্ণ যোগের এতখানি ভক্ত ছিলেন যে গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের বিধি, স্থান, আসন, ধ্যান সবকিছুর শিক্ষা উনি দিয়েছেন। সম্পূর্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ই যোগশিক্ষার গভীরে গিয়ে যোগের বর্ণনা করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধ্যা-বন্দনা :

মহাভারতের যুদ্ধের অবস্থা এক প্রকার আসন্ন। দুর্যোধন তাঁর নিজের কুনীতির উপর স্থির ছিল। ধৃতরাষ্ট্র ভিতরে ভিতরে হৃদয় থেকে দুর্যোধনের সাথে ছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এঁরা সব দুর্যোধনকে বোঝাতে অসমর্থ ছিলেন। অতঃ শ্রীকৃষ্ণ

পান্ডবদের পক্ষ থেকে সমঝোতা করার জন্য দূত হয়ে হস্তিনাপুর যাওয়ার নিশ্চয় করলেন। হস্তিনাপুরের রাস্তাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ রাস্তাতেই রাত কাটাবার নিশ্চয় করলেন। সেখানে উনি সন্ধ্যা করলেন

"অবতীর্য রথাৎ তূর্ণং, কৃত্বা শৌচং যথাবিধি। রথমোচনমাদিশ্য, সন্ধ্যামুপবিবেশ হ।।"

[মহাভারত, উদ্যোগ ৮২।২১]

অর্থ: শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে রথ খোলার আদেশ দিয়ে বিধিপূর্বক শৌচ আদি থেকে নিবৃত্ত হয়ে সন্ধ্যা করার জন্য বসে গেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১০ম স্কন্ধের উত্তরার্দ্ধের ৭০ অধ্যায় হতে -

"অর্থপুতো নির্মলস্য জলে যথাবিধি ক্রিয়া

কলাপং পরিধায় ব্যাসসী।

চকার সন্ধ্যাপগমাদি উত্তমো হুতানলো

ব্রহ্ম জজাপ বাগযতঃ।। (৬)

অর্থ: অতঃপর তিনি বিধি অনুসারে নির্মল ও পবিত্র জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করে যথাবিধি নিত্যকর্ম সন্ধ্যা বন্দনা করেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ করতে বসেন ও মৌন হয়ে **গায়ত্রী জপ** করেন।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ; এক আদর্শ অনুসরণীয় ব্যাক্তিত্বঃ

যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি ছিলেন একজন ধর্মাত্মা বা মুক্তাত্মা। মুক্তাত্মারা তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছায় ধর্ম রক্ষার্থে জন্ম নিতে পারেন।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় [শতপথ ব্রাহ্মণ কাং ১৪, বেদান্ত সূত্র ৪।৪।১১, ছান্দোগ্য ৭।২৬।২,ছান্দোগ্য ৮।২।১-১০]

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো মিথ্যা বলতেন না, এমনকি পরিহাসও না। সত্য ও ধর্মই তাঁর মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ধর্মযুদ্ধে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না।" [মহাভারত, অশ্বমেধিক পর্ব ৬৩।১৮,১৯,২২]

সুতরাং এটা বলাই যায় যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মারা ধর্ম রক্ষার্থে বার-বার জন্ম নেন। তেমনি শ্রীকৃষ্ণও ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাতে জন্মগ্রহণ করেন। কারাগারে হয় তাঁর জন্ম মাতা দেবকীর গর্ভে।

"কৃষ্ণ দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্যভূব কেশে যোসৌ বর্ণতঃকৃষ্ণ উক্ত"।। [মহাঃ, আদি পর্ব ১৯৬।৩৩]

শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতা:

মহামহিম ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথন করে বলে —

বেদ-বেদাঙ্গ, বিজ্ঞান এবং বল আদি সব গুণ শ্রীকৃষ্ণের ভিতর বিদ্যমান মনুষ্যলোকে কেশবের অতিরিক্ত আর কে অধিক গুণসম্পন্ন? [মহাঃ সভাপর্ব ৩৮।১৯-২০]

বীরশ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় অপর ক্ষত্রিয়কে জয় করে বশে এনে আবার ছেড়ে দেন, তিনি তার গুরু হয়ে থাকেন। রাজাদের এই সভায় আমি এমন একটি রাজাকেও দেখছি না, যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণে পরাক্রমে বিজিত হন নাই। এই কৃষ্ণ কেবল আমাদেরই পূজনীয় নহেন, এই মহাবাহু ত্রিভুবনের সমস্ত লোকেরই পূজনীয়। [মহাঃ সভাপর্ব ৩৭।৭-৯]

শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতার বলেই পান্ডবগণ যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলো। শ্রীকৃষ্ণ যদি না থাকতো তাহলে ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রোণ–জয়দ্রোথ–কর্ণ–দূর্যোধন বধের কি হতো? শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বেই পান্ডবরা জয়লাভ করেছিলো। যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ হলো। শত শত রাজবংশ একজন সম্রাটের অধীনে এসে গেলো। খন্ড খন্ড ভারত মহাভারত হয়ে গেলো এবং এগুলো সবকিছু কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো। রাজনৈতিক

দৃষ্টি থেকে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত নির্মাণ অথবা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ কেবল মাত্র সম্রাট হওয়ার ঘোষনামাত্র ছিলো না। শ্রীকৃষ্ণ একজন সম্রাটের পতাকার তলে এক সংঘ শাসনের স্থাপনা করে ফেলেছিলেন।
আর এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতার বলে ধর্ম স্থাপনা করলেন। খন্ড ভারত কে মহাভারত বানালেন।
এই রকম একজন তপস্বী ব্যক্তিকে গোপলীলা, রাসলীলা, চীরহরণের নায়ক করে দেয়া, চোর শিরোমনি লেখা কতটা যৌক্তিক আমাদের বোধগম্য নয়। এটা কি তাঁর প্রতি অন্যায় নয়? হ্যাঁ, অন্যায় তাঁর প্রতি, অন্যায় হচ্ছে ভারতীয় গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি।
এইজন্যই তো লালারাজপত রায় বলেছেন, **"পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন, অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তাদের বিরোধীরা তাদের উপরে অত্যাচার করেছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমন এক মহাপুরুষ যাকে তার ভক্ত দাবীদার ব্যক্তিরাই অত্যাচার করছে,করেছে।"** [লালা রাজপত রায় রচনাবলী]

তাই আর নয় এই হীন অন্যায়। এইরকম একজন মহান পুরুষ আমাদের গর্ব। তিনি মহান ছিলেন, আছেন এবং সর্বদা থাকবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ-

যাদবদের সংঘরাজ্যের স্থাপনা শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সংঘের মূখ্য লোক চাইতো কিন্তু সৈনিক যুদ্ধে কংস ভারী পরে ছিলো। দ্বন্দ্ব যুদ্ধই একমাত্র উপায় ছিলো। তখন শ্রীকৃষ্ণ উঠতি কিশোর ছিলো। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ - কে কংস মল্লযুদ্ধে আহবান করলো। তারপর শ্রীকৃষ্ণ হাতে কংসের মৃত্যু ঘটলো।
মহাভারতের দ্রোণ পর্বে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন —
মহাবলবান তেজস্বী জরাসন্ধের দ্বারা পালিত কংসকে তার সাথী সহিত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মেরে ফেললেন। [মহাঃ দ্রোণ পর্ব ১১।৬]
সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন —
দুষ্টমতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করে তার শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জাতিদের উপর পিড়ন করেছিলো তাই আমি এবং বলরাম কংসকে বধ করি। [মহাঃ সভা পর্ব ১৪।৩৪]

জরাসন্ধ বধ

কংস বধের সমানই জরাসন্ধের বধও প্রয়োজন ছিলো। ধর্মের রক্ষা এবং ধার্মিকদের রক্ষা জরাসন্ধকে বধ করা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এধারে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উদ্‌ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিলো-
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"
[গীতা ৪।৮]

ওপাশে জরাসন্ধ অন্যায় অত্যাচার বেড়েই চলছিল। ওতো কংসকে অন্যায় করার জন্য উৎসাহ দিয়েই রেখেছিল, স্বয়ংও অন্যায়ের পরাকাষ্ঠার উপর পৌঁছেছিল ও ৮৬ জন রাজাদেরকে কারাগারে ফেলে রেখেছিল। একশত সংখ্যা পূর্ণ হলে পর তাঁদের বলি দেওয়ার প্রস্তুতিও ছিল। জরাসন্ধ ছিলো তো সম্রাট। তাঁর সেনাও বিশাল ছিল। যুদ্ধভূমিতে তাঁর সাথে যুঝবার ক্ষমতা কারও ছিলো না। শ্রীকৃষ্ণ এই তথ্যকে নিজেও স্বীকার করেছেন-
"অনারভন্তো নিঘ্নন্তো মহাস্ত্রৈঃ শত্রুঘাতিভিঃ।
ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বলম্।।" [সভা ১৪।৩৬]

- কৃষ্ণ বলছেন যে একটানা, না আরাম করে; না অন্য কোন বাধা বিঘ্ন করে মহাশত্রুঘাতী অস্ত্রের দ্বারা যদি আমরা জরাসন্ধের সৈনিকদের মারতে থাকি, তবুও তিনশত বছরেও তাঁর সৈনিকদের নাশ করতে পারবো না।

সেই সময় দুষ্ট রাজাদের একটি দল হয়ে গিয়েছিল। মথুরাতে কংস, মগধে জরাসন্ধ, অসমে নরকাসুর, হস্তিনাপুরে দুর্যোধন, সিন্ধ প্রান্তে জয়দ্রথ, পশ্চিমে শিশুপাল সবাই মিলে অত্যাচারীদের একটি বিশাল দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জরাসন্ধকে মারতে পারলে এই দল অবশ্যই দুর্বল হয়ে যেতে পারতো। তাই কৃষ্ণ সর্বপ্রথম জরাসন্ধকেই সমাপ্ত করার যোজনা তৈরি করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জরাসন্ধই একটি বড় কাঁটা ছিলো। যুধিষ্ঠিরও তাঁকে ভয় করতেন। শ্রীকৃষ্ণের যোজনা ছিলো দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা। ভীম ও অর্জুন একমত ছিলো। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে মারার জন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সফল প্রয়োগ করে নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই নীতিই নির্ধারণ করতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন-

"ময়িনীতির্বলং ভীমে, রক্ষিতা চাবযোর্জয়ঃ।
মাগধং সাধয়িষ্যামঃ ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।।"

[সভা ১৫।৩২]

- অর্থাৎ আমার মধ্যে নীতি আছে, ভীমের মধ্যে বল আছে, অর্জুন হলো আমাদের রক্ষক। আমরা জরাসন্ধকে অবশ্যই জিতে নেব।

যুধিষ্ঠির হ্যাঁ করেন বা না করেন, তাঁর আগেই নীতিনিপুণ বাকপটু, সভাচতুর কৃষ্ণ দ্বিতীয় তীর আর একটি জোর করে মারলেন...

"যদি মে হৃদয়ং বেৎসি, যদি তে প্রত্যয়ো ময়ি। ভীমসেনার্জনৌ শীঘ্রং ন্যাসভূতং প্রযচ্ছ মে।।" [সভা ১৫।৩৬]

অর্থ: যদি আপনি আমার হৃদয়কে জানেন, যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস আছে তাহলে শীঘ্রই আপনি আমাকে ভীম এবং অর্জুনকে বিশ্বাসপাত্ররূপে দিয়ে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ কথাটিকে এত দূর নিয়ে গেলেন যে যুধিষ্ঠিরের বাণী অবরুদ্ধ হয়ে গেল। বিশ্বাস এবং নির্ভরতার কথাই এমন ছিল যে যুধিষ্ঠিরও জরাসন্ধের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নীতিতে সহমতি প্রদান করলেন। জরাসন্ধের ভরাসভাতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরক্ষিত ছিলো না। তাই অন্য কোনো উপায় খোঁজার ছিল যে যাতে করে জরাসন্ধ বিনা সৈনিক, বিনা অঙ্গরক্ষক মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন তিনজনে মগধের রাজধানী গিরিব্রজে (রাজগৃহ) গিয়ে পৌঁছালেন। তিনজনেই স্নাতকের বেশে জরাসন্ধের দরবারে উপস্থিত হলেন। ভীম এবং অর্জুন মৌনব্রত ধারণ করার বাহানা করে চুপ রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিচয় দিলেন যে আমরা স্নাতক এবং ঐ দুজন মৌন অবস্থাতে আছেন। আজ অর্দ্ধরাত্রে এই দুইজন মৌনব্রত ভেঙ্গে দেবেন-সেই সময় কথার্বাতা হবে। জরাসন্ধ অতিথিদের যজ্ঞশালাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাত্রি ১২টার সময় যখন জরাসন্ধ মিলতে এলো তখন শ্রীকৃষ্ণ তিনজনের পরিচয় দিলেন এবং জরাসন্ধকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধকে স্বীকার করে নিল। সে কৃষ্ণকে এবং অর্জুনকে মল্লযুদ্ধের জন্য অত্যন্ত হীন ভাবতো। আগের দিন কার্ত্তিক প্রতিপদাতে সমস্ত নগরের জনতার উপস্থিতিতে দুইজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। ১৩ দিন একটানা কুস্তী হয়ে চলল। চতুর্দশীর দিনে জরাসন্ধের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং ভীম জরাসন্ধকে ভূমিতে ফেলে তাঁর ঠ্যাং চিরে দিলেন। জরাসন্ধ মারা গেল। শ্রীকৃষ্ণের নীতি ছিলো যে বিনা রক্তপাতে মগধের সাম্রাজ্য সেনা কোষাগার সবকিছু যুধিষ্ঠিরের অধীনে হয়ে যায়। তাই হলো। কৃষ্ণ বন্দী রাখা ৮৬ জন রাজাদের স্বতন্ত্র করে দিলেন এবং মগধের সিংহাসনে জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করে দিলেন। এইভাবে মগধও কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের অনুকূল হয়ে গেল।

বোঝায় যাচ্ছে ওই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জ্ঞানী আর কেউই ছিলো না।তিনি একাধারে যেমন বেদ শাস্ত্র,জ্ঞান-বিজ্ঞান এ জ্ঞানী ছিলেন তেমনি তার ছিলো প্রগাঢ় রাজনৈতিক দক্ষতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে আরো বহু বহু উজ্জ্বলময় ঘটনা পাওয়া যায়।তবে এখানে এই পর্যন্ত লিখেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীর ইতি টানছি।

যতঃ সত্যং যতো ধর্ম্ম যতো হ্রীরার্জ্জবং যতঃ।

ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।।

[মহাঃ উদ্যোগ পর্ব ৬৬।১৯]

যেখানে সত্য,যেখানে ধর্ম, যেখানে লজ্জা এবং যেখানে সরলতা থাকে, সেইখানে কৃষ্ণ থাকেন। আর যেখানে কৃষ্ণ থাকেন সেখানেই জয় হয়।

ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর: উত্তম কর্মের আচরণকে ধর্ম বলে। যার কারণে মানুষের উন্নতি হয়। ধর্মের দ্বারা মানবসমাজ সহনীয় এবং সুরক্ষিত থাকে। ধর্মীয় আচরণ করলে সর্বদা সত্য সুখ প্রাপ্ত করতে মনুষ্য সক্ষম হয় ।

প্রশ্ন. প্রাচীন ঋষি-মুনিরা ধর্ম শব্দের অর্থ কি বলেছেন?

উত্তর: মহাভারত রচনাকারী বিখ্যাত ঋষি বেদব্যাস ধর্ম শব্দের অর্থ এটা বলেছেন যে,

ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ ।

যৎ স্যাৎ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

এর অর্থ, আমরা উপরে বলেছি যা ধারণ করলে সবার কল্যাণ হবে যার মাধ্যমে সবার উন্নতি হবে তথা যা সকলকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাকে ধর্ম বলা হয়ে থাকে। যেসকল নিয়ম নীতির কারনে সমাজের ক্ষতি সাধন হয়, মানুষের মধ্যে শত্রুতা, বিরোধিতা ও বৈষম্য বাড়ায়, ওটাকে ধর্ম মনে করা আমাদের ভুল।

প্রশ্ন. ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা কারী কণাদ মুনি ধর্মের লক্ষ্মণ সম্পর্কে বলেছেন

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ ।

(য়তী:) যার দ্বারা **(অভ্যুদয়)** এই সংসারের উন্নতি এবং **(নিঃ শ্রেয়সিদ্ধি:)** মুক্তি বা চিরন্তন আনন্দের প্রাপ্তি হয় **(স ধর্ম:)** তাকে ধর্ম বলে। সে সমস্ত উপায় যার দ্বারা এই জগতের উন্নতির সাথে শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হয় তাকে ধর্ম বলে। ধর্ম আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। দেহ, মন, আত্মা, সমাজ, দেশ ও জগতের উন্নতির সকল উপায়কে ধর্ম বলে। কিন্তু মতানুযায়ী কিছু নীতির আভাস আছে, যা কিছু ব্যক্তি জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং তা অনুসরণে সাম্প্রদায়িকতার দোষ আছে।

প্রশ্ন. ধর্মের লক্ষ্মণ গুলো কি কি যা সমস্ত মানুষের ধারণ করা উচিত?

উত্তর: মনুস্মৃতির রচয়িতা মনু মহারাজ ধর্মের দশটি বৈশিষ্ট্য তথা লক্ষ্মণের কথা বলেছেন যার দ্বারা মানুষের উন্নতি হয় এবং সকলের প্রিয় হয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল ধর্মের এই দশ লক্ষণকে নিজের জীবনে ধারণ করার সর্বদা চেষ্টা করা।

প্রশ্ন. ধর্ম কয় প্রকার?

উত্তর: ধর্ম অনেক প্রকার:- ১)ব্যাক্তিগত ধর্ম ২) পারিবারিক ধর্ম ৩)সামাজিক ধর্ম ৪)রাষ্ট্রীয় ধর্ম

প্রশ্ন. ব্যাক্তিগত ধর্ম ও পারিবারিক ধর্ম কি?

উত্তর: ব্যাক্তিগত ধর্ম- যাদের প্রতিটি মানুষের সাথে সম্পর্ক রয়েছে বা যা অনুসরণ করে একজন মানুষ সব দিক দিয়ে উন্নতি করতে পারে। উপরে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন যে দশটি লক্ষ্মণের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে ব্যাক্তিগত ধর্মের মধ্যে গণনা করা যেতে পারে।

পারিবারিক ধর্ম- মাতা -পিতা, পত্নী - পুত্র, ভাই - বোন তথা পরিবারের অন্য লোকেদের সাথে যে ধর্মের সম্পর্ক আছে তাকে পারিবারিক ধর্ম বলে।শুধুমাত্র তাদের জানা এবং পালন করার মাধ্যমে প্রেম বজায় থাকে এবং সুখ প্রাপ্ত করা যায়।যেখানে পরিবারের সকল সদস্য গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে ও আনুগত্য প্রকাশ করে, একে অপরকে ভালবাসে এবং সুখে রাখার চেষ্টা করে, একে অপরকে সাহায্য করে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে, সেখানেই পারিবারিক ধর্মের চর্চা হয়। এরকম পরিবারই সুখী থাকে।

প্রশ্ন. সামাজিক ধর্ম কী?

উত্তর: মানুষ একা থাকতে পছন্দ করে না। সারাক্ষণ একা থেকে সে কোনো উন্নতি করতে পারে না, তাই সে সমাজে থেকে বেড়ে ওঠে।যে সমাজে সে বসবাস করে সে সমাজের প্রতি তার অনেক কর্তব্য আছে, সেগুলোকে সমাজিক ধর্ম বলা হয়।প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে সে যেন তার ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করে।সবার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে । এমন কোন কাজ না করা যাতে সমাজের ক্ষতি হয়।সবাইকে নিজের ভাই ও বন্ধু মনে করা উচিত।সবার ভালো কে নিজের ভালো মনে করা।সমাজে যে সব খারাপ প্রথা আছে তা দূর করার চেষ্টা করা।নিজের মন ও শরীর সমাজের উন্নতির জন্য ব্যাবহার করা।

প্রশ্ন. রাষ্ট্রীয় ধর্ম কি?

উত্তর: যে যে দেশে জন্মগ্রহন করেছে তার সে দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে। সেগুলোকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে। যাতে সবদিক দিয়ে নিজের দেশের উন্নতি হয় সেজন্য নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করা উচিত। দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য আনতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। কিছু মতভেদের কারনে একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করা উচিত নয়। দেশের অগ্রগতির জন্য শুদ্ধ ভাষা চর্চা জরুরী । প্রত্যেককে এটা অবশ্যই শিখতে হবে। যতদূর সম্ভব শুধুমাত্র দেশীয় জিনিস ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা খাঁটি দেশীয় কাপড় (খদ্দর) পরার শপথ নিতে হবে কারণ বিদেশী কাপড় পরলেই আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলে যাবে। এতে দিন দিন আমাদের দেশ দরিদ্র হয়ে যাবে। দেশে ভিতরে শিল্প ও কারিগরী বাড়াতেও সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ মাতৃভূমির সর্বতোভাবে সেবা করা এবং তাকে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন রাখার চেষ্টা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। প্রত্যক ছেলে এবং মেয়ের উচিত তাদের পিতামাতার মতো মাতৃভূমিকে ভালবাসা এবং তার সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। এর জন্য মহারানা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, লোকমান্য তিলক, ঋষি দয়ানন্দ, নেতাজী সুভাষের মতো দেশ প্রেমিকদের জীবনী পড়তে হবে।

বৈদিক ধর্মের প্রধান শিক্ষা

প্রশ্ন. বৈদিক ধর্মে ঈশ্বর বিষয়ক কি শিক্ষা রয়েছে?

উত্তর: বৈদিক ধর্মে ঈশ্বরের যে স্বরুপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেটাকে আমরা প্রথম পাঠে লিখেছি। সর্বব্যাপক,সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর বিনা অন্য কারো উপাসনা করা উচিত নয়, এটাই বৈদিক ধর্মের প্রধান শিক্ষা। এই পরমেশ্বর কে নিয়ে বেদে বলা হয়েছে ।

"য এক এব নমস্যো বিক্ষীড্যঃ ।"

[অর্থববেদ ২।২।১] অর্থাৎ এক ঈশ্বরই উপাসনার যোগ্য।

প্রশ্ন. বেদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সহ আরো অনেক দেবতার পূজার বিধান পাওয়া যায় এরকম অনেক বিদ্বান বলে থাকেন। সেসকল বিদ্বানের বিচার কি সঠিক?

উত্তর: না, এধরনের বিচার অশুদ্ধ। বেদে উপস্থিত ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, শিব, ব্রহ্মা ইত্যাদি শব্দ ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণবাচক নাম। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ।

[ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬]

ঐ এক পরমেশ্বর কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। যেমন একজন মানুষকে তার ভাই, ভাই নামে, পিতা পুত্র নামে, পুত্র পিতা নামে, ভাতিজা কাকা নামে, ভাগ্নে মামা নামে অভিহিত করে ঠিক তেমনি পরমেশ্বরের হাজারো গুন থাকার কারণে বিদ্বানগন পরমেশ্বর কে হাজারো নামে অভিহিত করে থাকেন।

প্রশ্ন. বেদে কি মূর্তি পূজার বিধান আছে?

উত্তর: বেদে এক সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে, যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি একেবারে নিরাকার (অকায়ম্, অব্রণম্ অস্ত্রাবরিম্ - যজু ০, ৪০/৮) তাঁর কোন প্রকার দেহ নেই।যার শরীর আছে সে কখনো সর্বব্যাপক এবং পূর্ণ হতে পারে না।যেখানে পরমেশ্বরের শরীরই নেই সেখানে পরমেশ্বরের মূর্তি কি করে হতে পারে।এজন্য বেদে বলা আছে :-

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ"

[যজুর্বেদ ৩২।৩]

অর্থাৎ যে ঈশ্বরের মহিমা আছে, সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মূর্তি থাকতে পারে না।

প্রশ্ন. ভগবান নিরাকার, তথাপি তিনি ধর্ম রক্ষা করতে এবং অধর্মকে ধ্বংস করার জন্য অবতার ধারণ করেন, এটাকে অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন।এই কথাটি কি সঠিক এবং বেদানুকুল?

উত্তর: এই কথাটি সঠিক নয় এবং বেদানুকুল নয়।

প্রশ্ন. যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সেহেতু তিনি শরীর ধারণ না করে ধর্মের রক্ষা এবং অধর্মের বিনাশ করতে কি পারেন না?

উত্তর: ঈশ্বর না জন্মগ্রহন করেন না মৃত্যু বরণ করেন, উনি সর্বদা একই অবস্থায় থাকেন। বেদে উনাকে 'অজ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ হল 'জন্মরহিত'। এই বিষয়ে বেদে বলা আছে:-

"স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ" [অর্থববেদ ১০।৮।১]

অর্থাৎ, আমরা সেই পরমেশ্বর কে নমস্কার করি যার মধ্যে কেবল সুখ আর সুখ রয়েছে, কোনো দুংখ নেই । এই কথাটি অন্য কোনো পুরুষের সম্পর্কে বলা যাবে না, সে যতই ভালো হউক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের কৃপায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী ধার্মিক ব্যাক্তি যাঁরা মানুষের সামনে উত্তম আদর্শ স্থাপন করেন, ভক্তির কারণে মানুষ তাঁদেরকে 'অবতার' নামে ডাকতে থাকে। ঈশ্বর কখনো শরীর ধারণ করেন না।শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মা পুরুষ ছিলেন।

প্রশ্ন. কোথায় এবং কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত?

উত্তর: তাকে কেবল হৃদয়ে উপলব্ধির দ্বারা উপাসনা করা যায় কারণ তিনি হৃদয়ে ব্যাপক। ঈশ্বরকে পিতা মাতা মনে করে প্রেমের সহিত ধ্যান করাই ঈশ্বরের উপাসনা। এর সাথে ঈশ্বরের সৃষ্টিকৃত সকল প্রাণীর সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ

হওয়া উচিত। গরীব, অনাথ দের সকল প্রকার সহায়তা করা - এটাই পরমেশ্বর এর সঠিক উপাসনা। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদভগবদগীতায় বলেছেন :-

"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

[গীতা ১৮।৪৬]

অর্থাৎ নিজের ভালো কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করে মনুষ্য মুক্তি তথা পরম আনন্দ লাভ করে।

প্রশ্ন. বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় শিক্ষা কি?

উত্তর: বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় শিক্ষা হল :- সকল মানুষকে ভাই এবং ঈশ্বরকে পিতা মাতা মনে করে সকলের কল্যাণের জন্য প্রেমের সহিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।জন্মগতভাবে উঁচু-নিচু নিয়ে গর্ব করা এবং কাউকে অস্পৃশ্য ও অচ্ছুত মনে করা বৈদিক ধর্মের শিক্ষার পরিপন্থী।

প্রশ্ন. বৈদিক ধর্মের তৃতীয় শিক্ষা কি?

উত্তর: বৈদিক ধর্মের তৃতীয় শিক্ষা হল কর্মের নিয়ম, এর অর্থ হল আমরা যেরকম কাজ করি আমাদের সেরকম ফল প্রাপ্ত হয়।খারাপ কাজ করার কারণে আমাদের পরবর্তীতে আফসোস হয়, আর এর পরিনাম হয় দুঃখ, শোক, অশান্তি। ভালো কাজ করায় সুখ, শান্তি এবং আনন্দ প্রাপ্ত হয়।আমাদের এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর ন্যায়কারী, আর মিথ্যা এবং ধোঁকা বাজী বেশিদিন চলতে পারে না।অবশেষে তার সত্যতা প্রকাশ পায়।বিজয় অবশ্যই সত্যের হয়।এজন্য ঋষিরা বলেছিলেন :-

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ । (মুণ্ডকোপনিষৎ)

এজন্য আমাদের কখনো সত্য এবং ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসা উচিত নয়, সে যতই কষ্ট হউক না কেন। ঈশ্বরের কৃপায় ন্যায়কারী অবশ্যই ভালো ফল লাভ করে।

প্রশ্ন. বৈদিক ধর্মের চতুর্থ শিক্ষা কি?

উত্তর: বৈদিক ধর্মের চতুর্থ শিক্ষা হল সাম-বিকাশ বা আপনার শরীর, মন, আত্মা ইত্যাদির শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা।সঠিকভাবে ব্যায়াম করলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভালো বই পড়া ও চিন্তা করলে মনের শক্তি বাড়ে।ঈশ্বরের ধ্যান এবং যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়।শ্রী রাম, শ্রীকৃষ্ণ –**এর** মত মহাপুরুষেরা আমাদের আত্মবিকাশের আদর্শ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন. বৈদিকধর্মের পঞ্চম শিক্ষা কি?

উত্তর: বৈদিক ধর্মের পঞ্চম শিক্ষা হল যজ্ঞের চেতনা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা। **'যজ্ঞ'** এর অর্থ দরিদ্র পশুদের আগুনে ফেলা নয় - যেমনটি অনেকে অজ্ঞতা থেকে বোঝে, তবে সেবা এবং আত্মত্যাগের মনোভাব গ্রহণ করা উচিত ।বেদে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ একটি মহান ধর্ম। তার মাধ্যমে জ্ঞানী ও ধার্মিকরা ঈশ্বরকে লাভ করে।

"যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ" [যজুর্বেদ ৩২/১৬]

প্রশ্ন. যজ্ঞ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: যজ্ঞ শব্দটি মূল যজ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার তিনটি অর্থ রয়েছে:-

১) দেবপূজা ২) সংগতিকরণ ৩) দান

দেবপূজার অর্থ- ধার্মিক, সত্যবাদী পণ্ডিতদের সম্মান করা এবং একই সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করা।

সংগতিকরণের **অর্থ** হলো মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা বা একসঙ্গে ভালো কাজ করা, যাতে সবার উন্নতি হতে পারে।

দান অর্থ দরিদ্র, এতিম এবং দুঃখী ও ভাল প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা।

এইভাবে, অন্যের মঙ্গলের জন্য করা সমস্ত ভাল কাজগুলি যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. ঈশ্বর কাকে বলে?

উত্তর: যা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান, চেতন, নিরাকার, অনন্তজ্ঞান, অনন্তবল, অনন্ত আনন্দ, ন্যায়, দয়া আদি গুণযুক্ত তার নাম ঈশ্বর।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের কোন রূপ, রং , ভার, আকার, আদি কি নেই?

উত্তর: ঈশ্বরের গুণ না থাকার কারণে ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয়।

প্রশ্ন. সংসার কি ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন নাকি জীব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর: ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। জীবের মধ্যে এই জ্ঞান এবং সামর্থ্য নেই যে সংসার সৃষ্টি করবে। প্রকৃতি জ্ঞানরহিত তথা স্বয়ং ক্রিয়া রহিত হওয়ায় সে স্বয়ং সংসার রূপে নেই।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের সাথে আমার কেমন সম্বন্ধ রয়েছে?

উত্তর: ঈশ্বর আমার মাতা, পিতা, গুরু, রাজা, স্বামী, উপাস্য আদি। এবং আমি তাঁর পুত্র, শিষ্য, প্রজা, সেবক, উপাসক আদি।

প্রশ্ন. ঈশ্বর জীব থেকে কী আশা করেন?

উত্তর: ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন জীব তার বেদরূপে দেওয়া জ্ঞান ধারণ তথা পালন করে সংসারে সুখী থাকে এবং মুক্তি প্রাপ্ত করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের আজ্ঞা কী, যা কোন পথে চলার নির্দেশক?

উত্তর: বেদ পড়া এবং ঈশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাব কে জানার মাধ্যমে তাঁর আজ্ঞার পথ সম্পর্কে জানা যায়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর এবং আত্মার মিল কোথায়?

উত্তর: ঈশ্বর এবং আত্মার মিল হলো উভয়ই চেতন, পবিত্র, অবিনাশী, অনাদি, নিরাকার।

প্রশ্ন. ঈশ্বর এবং আত্মা বিভেদ কী?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বজ্ঞ , আত্মা অল্পজ্ঞ। ঈশ্বরের মধ্যে নিজের উৎকৃষ্ট সুখ বিদ্যমান আত্মার সুখ নেই সে সুখ প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট শরণাপন্ন হন যা সংসারের পদার্থের মধ্যে রয়েছে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের মুখ্য বা নিজ নাম কী?
উত্তর: 'ওতম্' পরমাত্মার প্রধান মূখ্য নাম। যা বেদে বলা হয়েছে "ওতম্ ক্রতো স্মর"।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের মুখ্য কার্য কী কী?
উত্তর: ঈশ্বরের মুখ্য রূপে ৫ কার্য। যথা- (১) সৃষ্টি রচনা, (২) পালন করা, (৩) সংহার করা, (৪) জীবের কর্ম ফল দেওয়া, (৫) বেদ জ্ঞান প্রদান করা।

প্রশ্ন. প্রলয়কালে ঈশ্বর কী করেন?
উত্তর: প্রলয়ের সময়ে ঈশ্বর মুক্তাত্মাতে আনন্দ ভোগ করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের জ্ঞান সদা একই নাকি কোন কারনে বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: ঈশ্বরের জ্ঞান সদা একই থাকে অর্থাৎ কোন কারনে বৃদ্ধি পায় না তথা সেখানে অসত্য থাকে না।

প্রশ্ন. সংসারকে কীভাবে ধারণ করেছেন?
উত্তর: ঈশ্বর নিজ সামর্থ্য দ্বারা সব লোক-লোকান্তর (সংসারকে) ধারণ করে রেখেছেন।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের সুখ এবং সাংসারিক পদার্থের সুখের পার্থক্য কী?
উত্তর: ঈশ্বরের সুখ এবং সাংসারিক পদার্থের সুখের পার্থক্য কয়েছে। ঈশ্বরের আনন্দ স্থায়ী এবং পূর্ণ তৃপ্তি দানকারী অন্যদিকে সাংসারিক পদার্থের সুখ ক্ষণিক বা দুঃখমিশ্রিত।

প্রশ্ন. ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্ক কী ব্যবধান রয়েছে ?
উত্তর: কাল এবং স্থানর দৃষ্টিতে জীব, ঈশ্বর থেকে দূর নয়। ঈশ্বর সবসময়, সকল স্থানে তার সাথে বিদ্যমান। পরন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে জীব ঈশ্বর থেকে দূরে। যে ঈশ্বরকে জানে না , মানে না, এবং তাঁকে ভক্তি করেনা সেই জীব, ঈশ্বর থেকে দূরে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের কী কোন বিশেষতা রয়েছে?
উত্তর: ঈশ্বর সদা নিজ আনন্দে মগ্ন থাকে। ঈশ্বরের কোন ন্যূনতা, কোন দোষ নেই। তার কোন ভৌতিক পদার্থের আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কার কার স্বামী?
উত্তর: ঈশ্বর প্রকৃতি, জীব, সংসার এবং মোক্ষের স্বামী।

প্রশ্ন. কীভাবে জীব নিজ কর্মের ফল পূর্ণ রূপে স্বয়ং প্রাপ্ত করে?
উত্তর: না, কর্মের ফল ঈশ্বরের অধীন। তিনি নিজ ব্যবস্থায় কর্মফল দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন. কীভাবে ভক্ত নিজ সামর্থ্য অনুসারে ঈশ্বর কে (অনুভূতি) প্রাপ্ত করে?

উত্তর: না, যতক্ষন ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান জানবে না এবং ঈশ্বরের কৃপা হবে না ততক্ষণ ভক্ত তাঁর দর্শন (অনুভূতি) পাবেন না।

প্রশ্ন. যদি পরমেশ্বর জন্ম না নেয় তবে নির্গুণ এবং যখন জন্ম নেয় তখন সগুণ বলা হয়। এই কথা কি সঠিক?
উত্তর: না, সগুণ এবং নির্গুণ অর্থ ভিন্ন। সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপকত্ব আদি গুণযুক্ত হলে সে সগুণ এবং জড়ত্ব, মূর্খত্ব, রাগ-দ্বেষ আদি গুণযুক্ত রহিত হলে সে ঈশ্বর কে নির্গুণ বলা হয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কে জানার পরে যোগীর কী কী অনুভূতি হয় ?
উত্তর: ঈশ্বরকে জানতে পেরে যোগীর অনুভূতি হলো তিনি যা জানার ইচ্ছুক ছিলেন তা জানতে পেরেছেন, যা পেতে চেয়েছেন তাই পেয়েছেন, এখন তার আর জানার ও পাওয়ার প্রয়োজন নেই।।

প্রশ্ন. মনুষ্য জন্ম লাভ করার যোগ্য সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ কী?
উত্তর: ঈশ্বর কে বুঝতে এবং তাকে অনুভূতি করতে (প্রত্যক্ষ করতে) সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ কাজ।

প্রশ্ন. কখনো ঈশ্বর বিরক্ত হয়?
উত্তর: না, প্রাপ্ত হওয়া পদার্থ কে ত্যাগ করাকে তাকে বিরক্ত বলা হয় ঈশ্বর সর্বব্যাপক হওয়ায় কোন পদার্থকে ছাড়ে না এই দৃষ্টিতে তিনি বিরক্ত হয় না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী জীব এবং সাংসারিক পদার্থে রুষ্ট হন?
উত্তর: না, রাগ নিজ থেকে ভিন্ন উত্তম পদার্থের প্রতি হয়। ঈশ্বর থেকে কোন জীব যা সাংসারিক পদার্থ উত্তম নয়। অতঃ ঈশ্বর কোন কিছুতে রাগ হয় না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী এই সংসারের বাইরেও বিদ্যমান রয়েছে?
উত্তর: হ্যাঁ , রয়েছে । ঈশ্বর এমন মহান যে সকল সৃষ্টি তার সামনে পরমাণু তুল্যও নয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী আমাদের প্রতিদিন শিক্ষা দেন?
উত্তর: হ্যাঁ। জীব যখন ভুল বা ভালো কাজ করতে ইচ্ছুক হয় তখন মনের মধ্যে ভয়, লজ্জা, শঙ্কা যা আনন্দ, উৎসাহ, নির্ভয়তা প্রাপ্ত হয়। এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের শিক্ষা যেভাবে জীব খারাপ এবং ভালো কর্মকে জানতে পারে।

প্রশ্ন. সংসারে কখনো ঈশ্বরের অভাব হয়?
উত্তর: না, প্রলয়কালে তো সংসার বিনষ্ট হয় কিন্তু এই সময়েও ঈশ্বর এবং জীব এবং প্রকৃতি স্থিত থাকে যাথ তিন কালেই অস্তিত্ব বিদ্যমান।

প্রশ্ন. মনুষ্য যেভাবে সংসারের হানি করে তা দেখে কী ঈশ্বর দুঃখী হয়?
উত্তর: না। বরং পাপীকে ভালো না মেনে তাঁকে ভয় শঙ্কা লজ্জা আদি রূপে দণ্ড দেয় এবং পুণ্যাত্মাকে ভালো মানের করে তাকে উৎসাহ, প্রেরণা দেয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের দর্শন কে করে?

উত্তর: বেদ আদি শাস্ত্রের বিদ্বান, ধর্মাত্মা এবং যোগী মনুষ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে।

প্রশ্ন. কেন ঈশ্বর শরীর ধারণ করে যা রোগী, বৃদ্ধ হয়?

উত্তর: না, ঈশ্বর কখনো শরীর ধারণ করে না। না তো রোগী যা বৃদ্ধ হয় তিনি তো বিনা শরীরে নিজ সব কার্য নিজ সামর্থ্যে করেন।

প্রশ্ন. ঈশ্বর জীব কে কি পাপ করতে প্রেরণা দেন?

উত্তর: না, তিনি পবিত্র অতঃপর না স্বয়ং পাপ করেন না পাপ করার প্রেরণা দেন।

প্রশ্ন. কিছু ব্যক্তির জীবন ঈশ্বরকে মান্য করা ছাড়াও উপাসনা ছাড়াও ভালোভাবে চলছেন তাহলে আবার ঈশ্বর কে মানা এবং তার উপাসনা করার আবশ্যকতা কী?

উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনা করলে বিশেষ আনন্দ জ্ঞান, বল, , শান্তি আদি গুণের প্রাপ্তি হয়। এইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য করা উচিৎ।

প্রশ্ন. কীভাবে ঈশ্বর নিজ ভক্তের পাপ, খারাপ কাজের দুঃখ রূপ ফলের ক্ষমা করে যদি না করে তাহলে আবার তাকে ভক্তি করার কী কী লাভ রয়েছে?

উত্তর: ঈশ্বর পাপের ফল দান করে কখনো ক্ষমা করেনা ঈশ্বরকে ভক্তি করলে সে ভবিষ্যতে খারাপ কাজ না করার প্রেরণা ঈশ্বর থেকে পায়। তথা ঘোর দুঃখ, কষ্ট, বিপত্তি আসলে তা সহ্য করার শক্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. সংসারের সৃজন, তা পরিচলানা করে ঈশ্বরের কী লাভ হয়? যদি কোন লাভ না হয় তাহলে আবার কেন সৃজন, এবং পরিচালনা করেন?

উত্তর: ঈশ্বর দ্বারা সংসারের সৃজন এবং পরিচালনায় তাঁর স্বয়ং কোন লাভ হয় না আবার ঈশ্বর পরোপকারী, জীবকে সুখ প্রদান করতে সংসারের সৃজন এবং পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন. ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান তথা জীবের হিতৈষী তাহলে আবার তিনি পাপীদের (খারাপ ব্যক্তিদের) পাপ করা থেকে কেন বিরত করেনা?

উত্তর: জীব কর্ম করায় স্বতন্ত্র এইজন্য ঈশ্বর তাকে পাপ করার সময় বিরত করেন না কিন্তু মনে ভয়, শঙ্কা, লজ্জা আদি উৎপন্ন করে সঙ্কেত অবশ্য করে যা তাকে বিরক্ত করা বলা হয়, যা তার সীমা।

প্রশ্ন. ঈশ্বর ন্যায়কারী তাহলে সংসারে কেন অন্ধ, পঙ্গু , কুরূপ, নির্ধন, নির্বল, নির্বুদ্ধি রয়েছে? এবং কেউ সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ, ধনবান, বলবান, বিদ্বান্ কেন রয়েছে?

উত্তর: ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় কাউকে ভালো মন্দ ফল দেয় না কিন্তু জীবের কর্ম অনুরূপ ফল দান করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বর ন্যায়কারী তথা দয়ালু উভয় গুণযুক্ত বলা হয় যেখানে এই দুই গুণ এক অপরের বিরুদ্ধ। যদি ন্যায় করে তো দণ্ড মিলে, যদি দয়া করে তো অন্যায়ী তৈরি হয়, এর সমাধান কী?

উত্তর: ন্যায় তথা দয়া শব্দে কোন বিরোধ নেই। খারাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়ে ঈশ্বর ন্যায়কারী হয় এবং বন্ধনে আবদ্ধ করে ভবিষ্যতে পাপ করা থেকে বিরত করে অতঃপর তিনি দয়ালু।

প্রশ্ন. এমন কোন গুণ রয়েছে যা ঈশ্বর মাঝে নেই?
উত্তর: হ্যাঁ, যেভাবে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ভার আদি যে গুণ প্রকৃতিতে রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের নেই এবং জীবের মাঝেও নেই।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কি কোন বস্তু/দ্রব্য/পদার্থ ?
উত্তর: হ্যাঁ, ঈশ্বর এক দ্রব্য, পদার্থ, বস্তু কারণ তার মাঝে অনেক গুণ রয়েছে এবং তিনি কর্মও করে। বৈদিক সিদ্ধান্তে বস্তু তাকে বলে যার মাঝে গুণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন. ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক বলা হয়েছে তাহলে কাগজ জ্বলতে, কাপড় পরিধানে, রুটি চিবাতে, লাকড়ি ছীলতে, লোহাকে পিটানো হয় তাহলে তাকে জ্বালানো, পরিধান, চিবানো, ছীলনো, পীটানো হয়?
উত্তর: না, কারণ ঈশ্বর জ্বলা, পরিধান, কাটার উপযুক্ত জড় বস্তু থেকে পৃথক। তাকে জ্বালানো, পরিধান, কাটার মাধ্যমে তার উপর কোন প্রভাব পড়ে না কারণ তিনি জড় নন কিন্তু চেতন।

প্রশ্ন. ঈশ্বর পাপের ক্ষমা করেন? যদি না করে তাহলে কেন? ক্ষমা করলে কী হানি হয়?
উত্তর: যদি ঈশ্বর মনুষ্যের পাপকে ক্ষমা করে তাহলে তিনি অন্যায়কারী হবেন, সাথে সংসারে পাপ কর্ম বৃদ্ধি পাবে, এইজন্য তিনি পাপের ক্ষমা করে না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কর্মের ফল তৎকাল কেন দেয় না? আবার দেরীতে দেওয়ায় মনুষ্যের মনে কর্মফল বিষয়ে শঙ্কা/অনাস্থা/অশ্রদ্ধা/ অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়?
উত্তর: ঈশ্বর নিজ নিয়মানুসারে সময়মতো কর্ম ফল প্রাপ্ত হয়, পূর্বে নয়, যেভাবে ফল, ফূল, অন্ন আদি সময় পর পর উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের উপাসনা কারী আস্তিক ব্যক্তি সংসারে দুঃখী দীন, হীন, নির্বল, নির্ধন, পরাধীন দেখা যায়, যেখানে নাস্তিক ব্যক্তি সুখী, সম্পন্ন, বলবান, স্বতন্ত্র দেখা যায়, এমন কেনো?
উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে আস্তিক ব্যক্তি ধন, বল, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত করার সঙ্কল্প, পুরুষার্থ, তপস্যা করা উচিৎ, যে তা না করে সে আস্তিক দুঃখী হয়, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর চেতন তাহলে ইট, পথর, সোনা, আদি জড় পদার্থে চেতনতা (চলনা, পরিধান, হেলানো, ইচ্ছা, প্রয়ত্ন) আদি কেন দেখা যায়?
উত্তর: ইট পথর আদি জড় পদার্থে চেতন ঈশ্বর থাকে কিন্তু ইট, পথর আদিতে জীবাত্মা না থাকায় চলতে-ফিরতে পারে না, ঈশ্বর নিজ চেতনায় নিজ অধিকারে রাখে এইজন্য জড় পদার্থ চলা ফিরা আদি গতি হয় না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর স্বয়ং কম্পমান না হয়েও অন্যকে (সংসারের পদার্থ সমূহ কে) কীভাবে কম্পমান করে?
উত্তর: ঈশ্বরের চুম্বকীয় শক্তি রয়েছে, এই শক্তিতে তিনি স্বয়ং কম্পমান না হয়ে সংসারের জড় পদার্থকে কম্পমান রাখে।

প্রশ্ন. ঈশ্বর সংসারের কোন স্থান বিশেষে, কোন কাল বিশেষে, কোন সমুদায় বিশেষে, কোন জীব বিশেষে কল্যাণ করতে এবং দুষ্টের নাশ করতে অবতীর্ণ হোন?

উত্তর: না, ঈশ্বর কো স্থান, কাল, সমুদায় বিশেষে কোন জীব বিশেষে অবতীর্ণ হোন না। ইহা দ্বারা তিনি সেই সর্বহিতকারী থাকে না, পক্ষপাতী, অন্যায়কারী হয়ে যায়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী জীবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন তিনি কবে, কোথায়, কার সাথে কী করবেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর জীবের ভবিষ্যতের সব কিছু জানেন না। হ্যাঁ, তিনি জীবের মনের সকল সংকল্প / ইচ্ছা আদি উৎপন্ন হলে তা তিনি জানতে পারেন।

প্রশ্ন. ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, আনন্দ স্বরূপ তথা সর্বব্যাপক এইজন্য তিনি সকল জীবের মধ্যে রয়েছে আবার সকল জীব ঈশ্বরীয় সম্পর্কের কারণে সর্বজ্ঞ, আনন্দের অনুভূতি কেন করতে পারে না?

উত্তর: ঈশ্বরের আনন্দ নিজ অধীন। তিনি যাকে যোগ্য/পাত্র মনে করবেন, তাকে নিজ আনন্দ প্রদান করবেন। অযোগ্য কে প্রদান করবেন না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর সর্বব্যাপক হওয়ায় শৌচালয়ে বিদ্যমান মলমূত্রে উপস্থিত আবার সেখানে বিদ্যমান দুর্গন্ধের অনুভূতি হয় কেন?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি মল আদি দুর্গন্ধের বিষয়ে দুঃখী যা বিচলিত হয় না। কিন্তু নিজ সামর্থ্যে তিনি এসব থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন. কীভাবে ঈশ্বর সব কিছু করেন? কারণ তাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় ?

উত্তর: ঈশ্বর সব কিছু করেন না, নিজেকে বিনষ্ট করে না অথবা দ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃজন করেনা। সর্বশক্তিমান এর অর্থ হলো , সম্ভবপর কাজকে ঈশ্বর নিজ শক্তিদ্বারা পূর্ণতা দেয়, তিনি অসম্ভব কাজ করেন না। প্রকৃতির সহায়তায় সম্ভবপর কাজ করে, অসম্ভব কাজ নয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কীভাবে নিজ ভক্ত উপাসকের বশীভূত হয়? অর্থাৎ যেভাবে ভক্ত চায় সেভাবে ঈশ্বর করে, তাই কি সংগঠিত হয়?

উত্তর: না, ঈশ্বর ভক্তের বশীভূত হয় না। বরং ভক্ত ঈশ্বরের বশীভূত থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন. কেন ঈশ্বরের ভক্তি, প্রার্থনা, ধ্যান, উপাসনা কোন বিশেষ মন্ত্র, সূত্র, শ্লোক দ্বারা হয়ে থাকে, নিজ ভাষায় ইচ্ছানুসারে কেন করা যায় না ?

উত্তর: নিজ ভাষায় ও করা যায়, কিন্তু মন্ত্র আদির মাধ্যমে সংক্ষেপে, সরলতা, উত্তম রীতিতে হয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর এক কিন্তু তার রূপ অনেক ইহা কি সত্য? অর্থাৎ এক ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, দেবী আদি অনেক রূপে বিদ্যমান ?

উত্তর: ঈশ্বরের রূপ (দেবী দেবতার রূপ) অনেক নয়। তিনি তো অরূপ, উনি নিরাকার, কিন্তু গুণ কর্ম স্বভাব অনুসারে নাম অনেক।

প্রশ্ন. অনেক ঈশ্বরকে কেন মানবো না? এমন করলে তো সকল মত পন্থা সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হয়।
উত্তর: যেখানে ঈশ্বর এক তাহলে অনেক মানা তো মিথ্যা। সাথে এই অনেক ঈশ্বর বলে পরস্পর ঝগড়া হয় যে আমার ঈশ্বর বড়, তোমার ছোট।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের প্রার্থনা উপাসনা করলে কী কী লাভ হয়?
উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনা করার মাধ্যমে সমাধি অবস্থায় বিশেষ জ্ঞান, বল, আনন্দ, ধৈর্য, সহনশক্তি, উৎসাহ, পরাক্রম, নিষ্কামতা আদি গুণের প্রাপ্তি হয়। সাথে মনুষ্য, আত্মার সাক্ষাৎকার করে তথা তার অবিদ্যা আদি দোষ নষ্ট হয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কর্মফল দেওয়ার জন্য কী অন্য জীবের সহায়তার প্রয়োজন হয়?
উত্তর: না, ঈশ্বর কর্ম ফল প্রদানের জন্য অন্য জীবের সহায়তার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন. উপাসনারত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বাস্তবে কী দেখা দেয়?
উত্তর: দেখা দেয় অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরকে অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করেন। যেভাবে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, আনন্দ স্বরূপ, ন্যায়কারী, সর্বব্যাপক আদি গুণ যুক্ত সেভাবে তাকে অনুভব দ্বারা সাক্ষাৎ করতে হয়, সাথে ঈশ্বরের আনন্দের অনুভূতি প্রাপ্ত করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বর নিজ উপাসককে কীভাবে রক্ষা করেন? তাঁর রক্ষা করার পদ্ধতি , বিধি, কীরকম?
উত্তর: ঈশ্বর নিজ উপাসকের আপত্তি, কঠিনতা, বিরোধ বাধা আদি প্রতিকূলতা উপস্থিত হলে উৎসাহ, বল, জ্ঞান, পরাক্রম, ধৈর্য, সহনশক্তি আদি গুণ কে প্রদান করে সমস্যার থেকে দুঃখী হওয়া থেকে রক্ষা করে। যা তাকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী নিজ ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি বিশেষ কে ধন, বল, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, সফলতা, সুখ দেয়?
উত্তর: ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি বিশেষ কে ধন, বল, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, সফলতা, সুখ দেয়না। এরকম করলে তো তিনি অন্যায়কারী হয়ে যায়।

প্রশ্ন. কোন ব্যক্তি কী ঈশ্বর কে প্রত্যক্ষ করেছেন, এর বিশ্বাসযোগ্যতা কী?
উত্তর: যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে তার জীবন, বাণী, ব্যবহারে ঈশ্বরীয় গুণ অর্থাৎ আনন্দ, শান্তি, নির্ভীকতা, স্বচ্ছতা, পরোপকার, নিষ্পক্ষতা, নিষ্কামতা আদি প্রতীত হয়। তিনি দুঃখী, চিন্তিত, রাগী, দ্বেষী, পক্ষপাতী হয় না।

প্রশ্ন. কীভাবে ঈশ্বর তাঁর ভক্ত উপাসকের সাথে বার্তালাপ করে? শঙ্কা- সমাধান করে? নির্দেশ দেয়? প্রেরণা দেয়?
উত্তর: হাঁ, ঈশ্বর সমাধি অবস্থায় নিজ উপাসকের সাথে বার্তালাপ করে তথা উপাসকের শঙ্কা সমাধান করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কী মাখন, রুটি আদি তৈরি করে?
উত্তর: হ্যাঁ, বরং ঈশ্বর বস্তুর নির্মাণের সীমা নির্ধারিত করে রেখেছেন এইজন্য তিনি এই পদার্থকে সৃজন করে না। এই কাজ জীবের কর্ম সীমার অন্তর্গত।

প্রশ্ন. যদি ঈশ্বর অনন্ত হয়, তাঁকে সম্পূর্ণ তো আমি জানতে পারবো না, তাহলে তাঁকে জানার প্রচেষ্টা কেন করবো ?

উত্তর: যেভাবে নদীর সকল পানি আমরা পান করতে পারি না আবার নিজ আবশ্যকতানুসার অল্প পানি আমরা নদী থেকে নিয়ে পান করি। ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরকে যতটুকু জানলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ততটুকু অবশ্য জানা উচিৎ।

প্রশ্ন. ঈশ্বর দয়ালু কীভাবে?
উত্তর: দয়ালু এর অর্থ দয়ার স্বভাব যুক্ত। দয়ার অর্থ অপরের হিত, উন্নতি, কল্যাণ এবং সুখ চাওয়া। ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় দয়া হলো তিনি জীবের উন্নতি, সুখের জন্য সৃষ্টির উত্তম পদার্থ তৈরি করে দান করেছেন। ঈশ্বরের দয়ার এক স্বরূপ হলো তিনি সহায়তা প্রার্থী পুরুষার্থী মনুষ্যকে সহায়তা করে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের নিজের কর্মফল কি লাভ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ঈশ্বরের কর্মফল হলো তাঁর কার্য পূর্ণ করা, আটকানো নয়।

প্রশ্ন. সংসারে হিংসা, ছল, কপট, ভূকম্প আদি যা হয় সব কি ঈশ্বর করেন?
উত্তর: না, জীব স্বতন্ত্র, তাদের কারণেই অনেক অব্যবস্থা, দুঃখ সৃষ্টিতে সংগঠিত হয়। পৃথিবী আদি পদার্থের স্বভাবই পরিবর্তন হয়ে থাকে। যা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয়।

প্রশ্ন. বালকের শরীর মাতা-পিতা দ্বারা সৃষ্ট, ঈশ্বরের নয়। এই বাক্য কী সঠিক?
উত্তর: না, যদি বালকের শরীর মাতা-পিতা দ্বারা সৃজন হয় তাহলে তাদের শরীরের রচনার সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত মনুষ্য শরীরের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর শরীর ধারণ করেন না, এই বিষয়ে বেদের প্রমাণ কী?
উত্তর: যজুর্বেদের ৪০/৮ মন্ত্রে ঈশ্বর কে 'অকায়ম্' অর্থাৎ শরীর রহিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন. বলা হয় যে ব্রহ্মা সৃষ্টি উৎপন্ন করেছেন, বিষ্ণু সৃষ্টি পালন করেন এবং মহেশ্বর সৃষ্টি সংহার করেন। এই বাক্য কী সঠিক?
উত্তর: না, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এক ঈশ্বরের নাম এবং তিনিই সৃষ্টির উৎপত্তি, পালন এবং সংহার করেন।

জীবাত্মা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. জীবাত্মা কাকে বলে?
উত্তর: যে বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র, এক স্থানে অবস্থান করে, যার জ্ঞানের অর্থাৎ অনুভূতির গুণ আছে, যার কোনো রূপ, বর্ণ, গন্ধ, ওজন নেই, যা কখনো বিনষ্ট হয় না, যা সর্বদা আছে এবং সর্বদা থাকবে। যা মানব, পশু, পাখি ইত্যাদির দেহ ধারণ করে এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য স্বাধীন তাকে জীবাত্মা বলে।

প্রশ্ন. আত্মার কষ্টের কারণ কি?
উত্তর: আত্মার কষ্টের কারণ মিথ্যা জ্ঞান।

প্রশ্ন. আত্মা কি স্থান দখল করে?
উত্তর: না, আত্মা স্থান দখল করে না। পৃথিবীর সব জীবাত্মা একটি সুঁচের ডগায় আসতে পারে।

প্রশ্ন. প্রলয় কালে জীবাত্মার কি অবস্থা হয়? সে সময় কি তার জ্ঞান থাকে?
উত্তর: প্রলয়কালে বদ্ধ জীবাত্মারা অচেতন অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে জ্ঞান থাকে কিন্তু শরীর, মন ইত্যাদি সাধনার অভাবে প্রকাশ পায় না।

প্রশ্ন. প্রলয়কালে মুক্ত আত্মারা কোন অবস্থায় থাকে?
উত্তর: প্রলয়কালে মুক্ত আত্মারা সচেতন অবস্থায় থাকে এবং ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন থাকে।

প্রশ্ন. আত্মার প্রতিশব্দ কি কি?
উত্তর: বেদের মত শাস্ত্রে আত্মা, জীব, ইন্দ্র, পুরুষ, দেহী, উপেন্দ্র, বৈশ্বনর প্রভৃতি বহু নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন. একটি আত্মা কি নিজের ইচ্ছায় অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে?
উত্তর: আত্মা তার নিজের ইচ্ছায় অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

প্রশ্ন. আত্মা কি নারী, পুরুষ নাকি পুরুষত্বহীন?
উত্তর: আত্মার কোন লিঙ্গ নেই।

প্রশ্ন. জীবাত্মা কি ঈশ্বরের অংশ?
উত্তর: না,জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ নয়। ঈশ্বর অখণ্ড এবং কোন অংশ নেই।

প্রশ্ন. জীবাত্মার কি কোন ওজন,রূপ, আকার ইত্যাদি আছে?
উত্তর: জীবাত্মার কোন ওজন,রূপ,আকার ইত্যাদি গুণ নেই।

প্রশ্ন. জীবাত্মার মুক্তি কি এক জন্মে হয় নাকি বহু জন্মে?
উত্তর: জীত্মার মুক্তি এক জন্মে নয় বহু জন্মে হয়।

প্রশ্ন. জীবাত্মা কি মুক্তি লাভের পর পৃথিবীতে ফিরে আসে?
উত্তর: হ্যাঁ, মুক্তি লাভের পর আত্মা আবার দেহ গ্রহণ করতে ফিরে আসে।

প্রশ্ন. জীবাত্মার লক্ষণ কি?
উত্তর: আত্মার লক্ষণ হলো কামনা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ।

প্রশ্ন. আমার মন একমত না, এই বক্তব্য কি সঠিক?
উত্তর: আমার মন একমত নয়, এই বক্তব্য সঠিক নয়। এটি সচেতন আত্মা যা জড় মনকে পরিচালনা করে।

প্রশ্ন. আত্মা নিজেই কি তার কর্মের ফল পেতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ, আত্মা নিজেই কিছু কাজের ফল ভোগ করতে পারে, যেমন চুরির শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু আত্মা নিজেই তার সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করতে পারে না।

প্রশ্ন কাজ করতে করতে আত্মা কি ক্লান্ত হয়ে যায়?
উত্তর: না,কাজ করতে গিয়ে আত্মা ক্লান্ত হয় না, বরং শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি কমে যায়।

প্রশ্ন: জীবাত্মার কতটুকু স্বাভাবিক শক্তি আছে?
উত্তর: জীবাত্মার মধ্যে ২৪টি স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে।

প্রশ্ন: শাস্ত্রে কেন আত্মাকে জানা আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছে?
উত্তর: আত্মার স্বরূপ জানার মাধ্যমে দেহ, ইন্দ্রিয়ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত খারাপ কাজ পরিহার করে কেবল সৎকর্ম করে।

প্রশ্ন.জীবাত্মার স্বরুপ (গুণ, কর্ম, স্বভাব, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,পরিমাণ) কি?
উত্তর: জীবাত্মা অণু স্বরুপ, নিরাকার, অল্প জ্ঞানী,অল্প শক্তিশালী,এটি সচেতন এবং কর্মে স্বতন্ত্র, এটি একটি চুলের ডগা থেকে দশ হাজার ভাগের চেয়েও সূক্ষ্ম ।

প্রশ্ন: জীবাত্মা শরীরে কোথায় থাকে?
উত্তর: জীবাত্মা মূখ্যরূপে শরীরের একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করে যার নাম হৃদয়। কিন্তু গৌণরূপে এটি চোখ,কণ্ঠ ইত্যাদিতেও অবস্থান করে।

প্রশ্ন. মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির দেহে জীবাত্মা কি আলাদা নাকি একই ধরনের?
উত্তর: মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির দেহে আলাদা কোন জীবাত্মা নেই, তবে তা একই প্রকার আত্মা, দেহে পার্থক্য রয়েছে, জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন. জীবাত্মা কেন শরীর ধারণ করে? কখন থেকে করছে এবং কতদিন করবে?
উত্তর: জীবাত্মা তার কর্মের ফল ভোগ করার জন্য এবং মোক্ষলাভের জন্য শরীর ধারণ করে।সৃষ্টির শুরু থেকে শরীর ধারণ করে আসছে এবং যতক্ষণ মোক্ষলাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর ধারণ করে চলেছে।

প্রশ্ন. মৃত্যুর পর কোন জীব কি ভূত, প্রেত,ডাকিনি ইত্যাদি রূপে বিচরণ করে?
উত্তর: মৃত্যুর পর আত্মা কখনো ভূত,প্রেত হয় না এবং বিচরণও করে না। এটি মানুষের অজ্ঞতার কারণে তৈরি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস।

প্রশ্ন: জীবাত্মা কখন শরীরে প্রবেশ করে?
উত্তর: জীবাত্মা তখনই শরীরে আসে যখন গর্ভধারণ হয়, অর্থাৎ যখন রজঃবীর্য মিলিত হয় তখন।

প্রশ্ন. জীব এবং ব্রহ্মা (ঈশ্বর) কি একই? নাকি 'আত্মা ঈশ্বর' এই বিশ্বাস সঠিক?
উত্তরঃ জীব ও ব্রহ্ম এক নয়।উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ যার গুণ ও কর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। তাই এ বিশ্বাস সঠিক নয়।

প্রশ্ন. জীব কি ঈশ্বর হতে পারে?
উত্তরঃ জীব কখনো ঈশ্বর হতে পারে না।

প্রশ্ন.জীবাত্মা কি একটা বস্তু?
উত্তর: হ্যাঁ, জীবাত্মা একটি প্রাণবন্ত বস্তু, বৈদিক দর্শনে বস্তুকে বলা হয় যেটির কিছু গুণ, ক্রিয়া ও প্রকৃতি আছে।

প্রশ্ন. জীবাত্মা কি স্বাধীন শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করতে পারে?
উত্তর: জীবাত্মা একটি নতুন শরীর গ্রহণ করার জন্য স্বাধীন নয় বরং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন। যখন ঈশ্বরের এক দেহে আত্মার ভোগ সম্পূর্ণ হয়, তখন তিনি আত্মাকে বের করে নতুন দেহে দান করেন।

প্রশ্ন.জীবাত্মা নিরাকার অণু রূপ কীভাবে এত বড় দেহকে নড়াচড়া করে?
উত্তরঃ বিদ্যুৎ যেমন বড় বড় যন্ত্র চালায়, তেমনি আত্মা নিরাকার হয়েও তার প্রচেষ্টার চৌম্বক শক্তি দিয়ে দেহ চালায়।

প্রশ্ন.জীবাত্মা কি নিজের ইচ্ছায় অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে?
উত্তর: জীবাত্মা নিজের ইচ্ছায় অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে না, এই কাজটি তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে।

প্রশ্ন. দেহ ত্যাগের পর (মৃত্যুর পর) জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করতে কত সময় নেয়?
উত্তরঃ দেহ ত্যাগ করার পর (মৃত্যুর পরে) ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, আত্মা শীঘ্রই কিছু মুহুর্তের মধ্যে অন্য দেহ গ্রহণ করে। এটাই সাধারণ নিয়ম।

প্রশ্ন. এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?
উত্তর: হ্যাঁ, এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। মৃত্যুর পর, আত্মা যখন একটি দেহ ত্যাগ করে কিন্তু তার কর্ম অনুসারে, মাতৃগর্ভ পরবর্তী দেহ লাভের জন্য পাওয়া যায় না, তখন তা কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থায় থাকে। পরে অনুকূল পিতামাতার কাছে ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন.জীবাত্মার মুক্তি কি এবং কিভাবে তা প্রাপ্ত হয়?
উত্তর: প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের পরম আনন্দ লাভ করাকে মুক্তি বলে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত যোগ সাধনার মাধ্যমে সমাধি প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানতার সমস্ত সংস্কার বিনষ্ট করলেই এই মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন.মুক্তিতে আত্মার কী অবস্থা, কোথায় থাকে?শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয় কিভাবে চলে, খাওয়া-দাওয়া কিভাবে করে?
উত্তর: মুক্তিতে জীবাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবাধে ভ্রমণ করে এবং ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত থাকে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে একটি প্রাকৃতিক শক্তিতে চলাফেরার কাজ করে। মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মাকে দেহধারী জীবের মতো খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন. জীবাত্মার সাংসারিক ইচ্ছা কখন শেষ হয়?
উত্তরঃ যখন ভগবান লাভ হয় এবং পার্থিব ভোগবিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন আত্মার পার্থিব সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন. জীবাত্মা বাস্তবে কি চায়?
উত্তর: জীবাত্মা পূর্ণ ও স্থায়ী সুখ, শান্তি, নির্ভীকতা ও স্বতন্ত্রতা চায়।

প্রশ্ন. কে ভোজন গ্রহণ করে, শরীর না জীবাত্মা?
উত্তরঃ শুধুমাত্র জড় দেহ ভোজন গ্রহণ করতে পারে না এবং শুধুমাত্র জীবাত্মার ও খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।শরীরে থাকা জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্য ভোজন গ্রহণ করে।

প্রশ্ন. একটি শরীরে কি একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে নাকি বহু জীবাত্মা থাকে?
উত্তর: একটি শরীরে কর্তা এবং ভোক্তা একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে,বহু জীবাত্মা থাকেনা। হ্যাঁ, অন্য শরীরে যুক্ত অন্য জীবাত্মা কোনও শরীরে বাস করতে পারে, যেমন মাতৃগর্ভে তার সন্তান।

প্রশ্ন. জীবাত্মা কি শরীরে বিস্তৃত নাকি এক স্থানীয়?
উত্তর: দেহে আত্মা একাকী এবং বিস্তৃত নয়, যদি তা ব্যাপক হয় তবে দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণে তা চিরন্তন থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন. জীবের পরম উন্নতি ও সফলতা কী?
উত্তর: জীবাত্মার চূড়ান্ত উন্নতি হল জীবাত্মা পরমাত্মার উপলব্ধি করে পরম শান্তি ও মোক্ষ লাভ করা।

প্রশ্ন. জীবাত্মার প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ কি তার নিজের কর্মের ফল? নাকি কোন কর্ম না করে অন্যের কর্মের ফলে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করি?
উত্তরঃ আত্মার প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ নিজের কর্মের ফল, কিন্তু অনেক সময় অন্যের কর্মের ফলে পরিণাম প্রভাবের কারণে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়(ফলে নয়)।

প্রশ্ন. কোন লক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে কোন একজন ব্যক্তি জীবাত্মা উপলব্ধি করেছেন?
উত্তরঃ মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে,ন্যায় আচরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র সৎকর্ম করা এবং মিথ্যা ও অধার্মিক কাজ না করা এবং সর্বদা শান্ত,প্রসন্ন ও সুখী থাকাই এই ব্যক্তির আত্মাকে উপলব্ধি করার লক্ষণ।

প্রকৃতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. প্রকৃতি কাকে বলে?
উত্তর : সত্ত্ব গুণ,রজঃ গুণ এবং তমঃ গুণ,এই তিন উপাদানের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলে।

প্রশ্ন. প্রকৃতির প্রয়োজন কি ?
উত্তর: জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসেবে এর প্রয়োজন। যেমন ঘড়া বানানোর জন্য মাটির প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন. প্রকৃতির কি কখনো সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়?
উত্তর: প্রকৃতির কখনো সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়না।

প্রশ্ন. সত্ত্বগুণ, রজঃগুণ এবং তমঃগুণের স্বরুপ ব্যাখ্যা কর?
উত্তর: সত্ত্ব গুণ, আকর্ষণ ও প্রকাশ, রজঃ গুণ, চঞ্চলতা ও দুঃখের জন্ম দেয় এবং তমঃ গুণ মূঢ়তা (মোহ) ও স্থিরতার জন্ম দেয়।

প্রশ্ন. প্রকৃতির কি জীবাত্মার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে?
উত্তর: জীবাত্মা সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই।

প্রশ্ন. প্রকৃতি কি জীবের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে?
উত্তরঃ প্রকৃতি জীবের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে না।

প্রশ্ন. পৃথিবীতে কত প্রকার দুঃখ আছে?
উত্তর: পৃথিবীতে দুঃখ - তিন প্রকার- (১) আধ্যাত্মিক(২) আধিভৌতিক (৩) আধিদৈবিক।

প্রশ্ন. আধ্যাত্মিক দুঃখ কাকে বলে?
উত্তর: নিজের ভুলের (মূর্খতা) কারণে প্রাপ্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন. আধিদৈবিক দুঃখ কি?
উত্তর: বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে থেকে প্রাপ্ত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন. আধিভৌতিক দুঃখ কাকে বলে?
উত্তর: অন্যান্য পশু, পাখি, মানুষ ইত্যাদির কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন. পৃথিবী কি প্রকৃতির দ্বারা নিজেই সৃষ্টি করা যায়?
উত্তর: না, সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও সাহায্য ছাড়া প্রকৃতির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করা যায় না।

প্রশ্ন. প্রকৃতি কি কখনো সচেতন হতে পারে?
উত্তর: না, প্রকৃতি কখনোই সচেতন হতে পারে না।

প্রশ্ন. প্রকৃতির কি ব্রহ্ম থেকে স্বাধীন অস্তিত্ব আছে নাকি ব্রহ্মই জগৎ রূপে পরিবর্তিত হয়?
উত্তর: প্রকৃতির অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে পৃথক ও স্বাধীন। ব্রহ্ম কখনো জগৎ রুপে পরিবর্তিত হতে পারেনা।

প্রশ্ন. সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কি আসলে গুণ নাকি পদার্থ?
উত্তর: সত্ব, রজঃ, তমঃ আসলে পদার্থ কিন্তু সত্ত্বগুণ ও রজঃগুণ, তমঃগুন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন. প্রকৃতির সব পরমাণু কি একই রূপের?
উত্তর: না, প্রকৃতির পরমাণুর বিভিন্ন রূপ আছে,ভিন্ন-ভিন্ন গুণ, কর্ম,স্বভাব,রঙ,রূপ,আকার ও ওজন আছে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই কি পঞ্চ মহাভূত থেকে রজঃ বীর্য থেকে স্বতঃ শরীর গঠন করা যায়?
উত্তর: না,ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত পঞ্চ মহাভূত থেকে রজঃ বীর্য থেকে স্বতঃ শরীর গঠন করা যায় না?

প্রশ্ন. প্রকৃতি কি সর্বত্র বিস্তৃত?
উত্তর: প্রকৃতি সর্বত্র বিস্তৃত নয় বরং এককেন্দ্রিক, অর্থাৎ এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিস্তৃত, কিন্তু ঈশ্বর এর বাইরেও বিরাজমান।

প্রশ্ন. প্রলয়ের অবস্থা কেমন হয়?
উত্তর: প্রলয়ের অবস্থা ঘোর অন্ধকার হয়।এই সময়কালে না থাকে কোন সূর্য,না চাঁদ,না পৃথিবী,না কোন শরীরধারী জীব।সেখানে রয়েছে সম্পূর্ণ নির্জনতা, আলোহীন অন্ধকার।

প্রশ্ন. প্রলয়কালের সময়কাল কতদিন?
উত্তর: প্রলয়কালের সময়কাল ৪ বিলিয়ন ৩২ কোটি বছর স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন. প্রলয়কালের গণনা (হিসাব)কে করেন?
উত্তর:ঈশ্বর প্রলয়কালের সময় গণনা করেন।

প্রশ্ন. কেন একটি জীব প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয় এবং কখন সংযুক্ত হয়?
উত্তর: জীব তার অজ্ঞতার কারণে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় এবং সৃষ্টির শুরুতে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় এবং মুক্তি থেকে প্রত্যাবর্তনকারী জীব সৃষ্টির মাঝখানেও প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন.আত্মা কখন প্রকৃতির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে?
উত্তর: যখন কেউ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জিনিসের প্রতি আসক্তি শেষ করে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সমস্ত কলুষতাকে ধ্বংস করে, তখন সে প্রকৃতির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

প্রশ্ন. মানুষের জীবনকে সফল করার চারটি লক্ষ্য কী কী?
উত্তর: (১) ধর্ম (২) অর্থ (৩) কাম (৪) মোক্ষ। এই চারটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই মানুষের জীবনকে সফল করার উপায়।

প্রশ্ন. সুখ যেমন প্রকৃতির গুণ, তেমনি জ্ঞানের গুণও কি প্রকৃতির?
উত্তর: না, জ্ঞান প্রকৃতির গুণ নয়, সচেতনতার গুণ।

প্রশ্ন. মন কি রাবারের মত প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়?
উত্তরঃ না, মন রাবারের মত প্রসারিত বা সংকুচিত হয় না।

প্রশ্ন. সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি ব্যতীত কেবল দুটি গুণ নিয়ে কি কোনো পদার্থ গঠিত হতে পারে? সব পদার্থেরই তিনটি গুণ আছে, সে কম হোক বা বেশি।
উত্তর: না, মাত্র দুটি গুণ দিয়ে কোনো পদার্থ গঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন. অন্ন(খাদ্য) কত প্রকার?
উত্তরঃ অন্ন(খাদ্য) তিন প্রকার (১) সাত্বিক (২) রাজসিক (৩) তামসিক।

প্রশ্ন.খাবার কি মনকে প্রভাবিত করে?
উত্তর: হ্যাঁ, সাত্তিক খাবার খেলে মন শুদ্ধ হয়, রাজসিক খাবার মনের চঞ্চলতা সৃষ্টি করে এবং তামসিক খাবারে আসক্তি, অলসতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. মানব জীবন সুস্থ রাখার মৌলিক স্তম্ভ কি কি?
উত্তর: মানবজীবনকে সুস্থ রাখার জন্য মৌলিক স্তম্ভ হল খাদ্য, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য সর্বোত্তম উপায়ে গ্রহণ করা।

শরীরের ইন্দ্রিয়

প্রশ্ন. মানবদেহ অর্জনের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: মানবদেহ লাভের উদ্দেশ্য হল নিজের কর্মের ফল ভোগ করা এবং মোক্ষ (দুঃখ থেকে মুক্তি) লাভ করা।

প্রশ্ন. আত্মার কর্ম সম্পাদনের জন্য কয়টি উপায় আছে এবং সেগুলো কি কি?
উত্তর: আত্মার কাজ করার জন্য দুই প্রকারের মাধ্যম রয়েছে- (১) অভ্যন্তরীণ উপায় (২) বাহ্যিক উপায়।
(১) অভ্যন্তরীণ অর্থ = মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি
(২) বাহ্যিক অর্থ = হাত, পা, নাক, কান, মুখ ইত্যাদি।

প্রশ্ন. শরীরের কয়টি ইন্দ্রিয় আছে? তাদের নাম বলুন।
উত্তর: শরীরে মোট এগারোটি ইন্দ্রিয় আছে (১) পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় (২) পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় (৩) মন।

প্রশ্ন. মনের প্রধান কাজ কি?
উত্তর: সিদ্ধান্ত এবং পছন্দ করা মনের প্রধান কাজ।

প্রশ্ন. পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজ বলুন।
উত্তর:

ইন্দ্রিয়	কাজ
ঘ্রাণ	গন্ধ নেয়া

রসনা	স্বাদ নেয়া
চক্ষু	দেখা
কান	শোনা
ত্বক	স্পর্শ অনুভব করা

প্রশ্ন. পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজ লিখুন।

উত্তর:

ইন্দ্রিয়	**কাজ**
হাত	আদান-প্রদান(দেয়া-নেয়া)
পা	চলাচল
জিহবা	বলা, ভোজন করা
উপস্থ	মূত্র ত্যাগ
পায়ু	মল ত্যাগ

প্রশ্ন. মনের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়?

উত্তর: অহংকার নামক তত্ত্ব থেকে মনের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন. মনের কয়টি অবস্থা আছে?

উত্তর: পাঁচটি। (১) ক্ষিপ্ততা (২) বিক্ষিপ্ততা (৩) বুদ্ধিহীনতা (৪) একাগ্রতা (৫) সংযত

প্রশ্ন. মনে জেগে উঠা চিন্তার প্রবৃত্তি কত প্রকার?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। (১) প্রমাণ বৃত্তি (২) বিপর্যয় বৃত্তি (৩) বিকল্প বৃত্তি (৪) নিদ্রা বৃত্তি (৫) স্মৃতি বৃত্তি

প্রশ্ন. মনের দোষ কতটি?

উত্তর: তিনটি (১) রাগ (২) দ্বেষ (৩) মোহ ।

প্রশ্ন. মনকে শুদ্ধ করার কি কি উপায় আছে ?

উত্তর: (১) শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা (২) ধর্মীয় কাজ করা (৩) ঈশ্বরের উপাসনা করা ।

প্রশ্ন. মন জড় নাকি চেতন নাকি উভয়ই?

উত্তর: মন একটি জড় পদার্থ, চেতন নয় ।

প্রশ্ন. মনকে শুদ্ধ করলে কি লাভ হয়?

উত্তর: মনকে শুদ্ধ করলে শান্তি এবং স্থিরতার প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন. মনকে একাগ্র করা সম্ভব নাকি অসম্ভব ?
উত্তর: মনকে একাগ্র করা সম্ভব।

প্রশ্ন. মনকে একাগ্র করার কি উপায়?
উত্তর: ঈশ্বরের চিন্তা করা, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা তথা গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করা।

প্রশ্ন. মন কীভাবে অশুদ্ধ হয় ?
উত্তর: মাংসাহার, নেশা এবং অশ্লীল সাহিত্য পড়লে মন অশুদ্ধ হয় এবং বেদ-বিরোধী, মিথ্যা বললেও মন অশুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন. মানসিক অশান্তি কীভাবে দূর করা যায়?
উত্তর: নিজের দিনযাপনকে যথাযথ করে, অনেকগুলো কাজ একসাথে শুরু না করে, নিজের ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কাজ না করে, নিজের ইচ্ছা কমিয়ে এবং ঈশ্বরের ধ্যান করে মানসিক অশান্তি দূর করা যায়।

প্রশ্ন. মানব জীবনের এমন কোন বিশেষত্ব আছে যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই?
উত্তর: (১) বিকশিত বাণী (২) উত্তম বুদ্ধি (৩) হাত (৪) কর্ম করার স্বতন্ত্রতা ।

প্রশ্ন. মানুষ কি ধারণ করলে পশু-পাখি ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ হয়?
উত্তর: ধর্মকে ধারণ করলে মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রশ্ন. জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কিসের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে?
উত্তর: জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় মনের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন. কার সাথে যুক্ত হয়ে মন কাজ করে?
উত্তর: মন আত্মার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন. বুদ্ধির প্রধান কাজ কি?
উত্তর: বুদ্ধির প্রধান কাজ হলো সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রশ্ন. অহংকারের কাজ কি?
উত্তর: অহংকারের এর কাজ হল 'আমি' অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করা, 'আমি আছি' নিজের সত্তাকে অনুভব করা।

প্রশ্ন. মূখ্যরূপে শরীর কত প্রকার?
উত্তর: চার প্রকার (১) অণ্ডজ (২) জরায়ুজ (৩) স্বেদজ (৪) উদ্ভিজ্জ।

প্রশ্ন. শরীর কয় প্রকার?
উত্তর: শরীর তিন প্রকার। (১) স্থুল শরীর (২) সূক্ষ্ম শরীর (৩) কারণ শরীর।

প্রশ্ন. দেহ ও জগৎ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া কী?
উত্তর: মহতত্ত্ব নামক একটি উপাদান প্রথমে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। মহতত্ত্ব থেকে অহংকার নামক একটি উপাদান উৎপন্ন হয়। অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়। তন্মাত্রা থেকে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয় এবং পঞ্চমহাভূত থেকে দেহ ও জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. অন্তঃকরণ (বিবেক) কাকে বলে?
উত্তর: আত্মার নিকটতম সাধন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারকে অন্তঃকরণ (বিবেক) বলে।

প্রশ্ন. সূক্ষ্ম দেহে কয়টি উপাদান রয়েছে তার নাম লেখ।
উত্তর: সূক্ষ্ম দেহে মোট **১৮**টি উপাদান, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটি তন্মাত্রা এবং মন, বুদ্ধি এবং অহংকার রয়েছে।

প্রশ্ন. স্থূল শরীরের বিনাশের সাথে সাথে কি সূক্ষ্ম শরীরেরও বিনাশ হয়?
উত্তর: না, দৈহিক দেহের বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম শরীর বিনাশ হয় না, মূলত আত্মার মুক্তি না করা পর্যন্ত বা ধ্বংসের সময় বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা (সূক্ষ্ম শরীর) বহু জন্ম পর্যন্ত আত্মার সাথে চলতে থাকে।

প্রশ্ন. কারণ শরীর কাকে বলে?
উত্তর: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি উপাদানকে কারণ শরীর বলে।

প্রশ্ন. সকল জীবের কারণ শরীর ভিন্ন ভিন্ন নাকি অভিন্ন হয়?
উত্তর: সমস্ত জীবের দেহের কারণ শরীর ভিন্ন নয় বরং একই হয়।

প্রশ্ন. কার্যকারণ দেহের সমান, সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থুল দেহ সকল জীবের জন্য একই হয়?
উত্তর: না, সব জীবেরই স্থুল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ ভিন্ন ভিন্ন হয়।

বেদ **বিষয়ক প্রশ্নোত্তর**

প্রশ্ন. বেদ কাকে বলে?
উত্তর: বেদ শাস্ত্রের অর্থ জ্ঞান।

প্রশ্ন. বেদ কয়টি এবং সেখানে কি কি বলা হয়েছে?
উত্তর: বেদ চারটি।সেগুলো হল -ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অর্থববেদ।মানুষের কিরকম কাজ করা উচিত,পরিবার সমাজ দেশ এবং বিশ্বের উন্নতি কিভাবে হতে পারে,তথা কিভাবে বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা যায়,কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় ইত্যাদি বেদে বলা হয়েছে।বেদ হতে সবাই উপকৃত হতে পারে।

প্রশ্ন. বেদের জ্ঞান কে দিয়েছে এবং কেন দিয়েছেন?

উত্তর: বেদের জ্ঞান ঈশ্বর দিয়েছেন যিনি সর্বঙ্গ অর্থাৎ সব কিছু জানেন।উনি এই জ্ঞান এইজন্য দিয়েছেন যাতে সকলে সুখ শান্তি এবং আনন্দ প্রাপ্ত হয়।ঈশ্বর পিতা মাতার মতো আমাদের সকলের প্রতি সদয়। মাতা - পিতা যেমন সন্তানের ভালোর জন্য তাদের ভালো জিনিস শেখায়,ঠিক তেমনি পরমপিতা ও দয়ালু ঈশ্বর আমাদের কল্যানের জন্য বেদের জ্ঞান দিয়েছেন কারণ ঈশ্বর আমাদের সবার ভালো চান।

প্রশ্ন. ঈশ্বর বেদের জ্ঞান কখন দিয়েছেন?
উত্তর: ঈশ্বর বেদের জ্ঞান মনুষ্য সৃষ্টির শুরুতে দিয়েছিলেন।যদি পরে দিত তাহলে পূর্বের সৃষ্টি এই জ্ঞান লাভ হতে বঞ্চিত হত।

প্রশ্ন. ঈশ্বর বেদের জ্ঞান কাকে এবং কেন দিয়েছেন?
উত্তর: ঈশ্বর বেদের জ্ঞান মনুষ্য সৃষ্টির শুরুতে ঋষিদের দিয়েছিলে,কারণ এই জ্ঞান ছাড়া ওনারা কিছুই শিখতে পারত না এবং বুঝতে পারত না কি কাজ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিখানোর কেউ না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লিখতে পড়তে শিখতে পারব না।

প্রশ্ন. সৃষ্টির শুরুতে মানুষকে ঈশ্বর বাদে কে উপদেশ দিত?
উত্তর: যাদেরকে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টির শুরুতে বেদের জ্ঞান দিয়েছেন তাদের নাম হল অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা।

প্রশ্ন. ঈশ্বর কি কাগজে কলমে লিখে দিয়েছেন অথবা উনি বেদের জ্ঞান ওনাদের কিভাবে দিয়েছেন?
উত্তর: ঈশ্বর সকলের ভিতরে অবস্থিত।ঋষিদের অন্তর পবিত্র ছিল।ঈশ্বর উনাদের হৃদয়ে বেদের জ্ঞান দান করেছিলেন।ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হওয়ার কারনে কাগজ, কলমে লিখার এবং মুখে বলার প্রয়োজন নেই। হৃদয়কে জ্ঞানে পূর্ণ করতে প্রেরনায় যথেষ্ট ছিল।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের জ্ঞান কি পরিবর্তিত হয়?
উত্তর: না,ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বদা এক থাকে।ওনার থেকে জ্ঞান পরিবর্তন এর প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন. বেদ কি কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের মানুষের জন্য?
উত্তর: না, বেদ পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য, কারণ ওনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল জগতের সকল প্রাণী সুখি হউক। ঈশ্বর পুরো সংসারের পিতা, কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের মানুষের নয়।এইজন্য বেদ পড়ার অধিকার সকলের আছে যারা ভালো হতে চাই।
এই কথা ঈশ্বর নিজেই বলেছেন-

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চারণায় চ স্বায় [যজুর্বেদ ২৬।২]
এর অর্থ হল সর্বোত্তম বেদের জ্ঞান আমি সকল মনুষ্যের কল্যানের জন্য দিয়েছি।

এইজন্য ঋষি দয়ানন্দ জীর আদেশ কখনো ভোলা উচিৎ নয় এবং সর্বদা বেদ অধ্যায়ন করুন - বেদ হল সকল সত্য বিদ্যার গ্রন্থ। বেদ পড়া, শিক্ষা দেওয়া এবং শ্রবণ করা শ্রবন করানো প্রত্যেক আর্যের পরম ধর্ম।

আমাদের ব্যবহার বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. কেমন পুরুষ অধ্যাপনা ও শিক্ষা করাবে ?

উত্তর: **অধ্যাপনাকারীর লক্ষণ** -

(১) যার পরমাত্মা ও জীবাত্মার যথার্থ জ্ঞান, যে আলস্য ত্যাগ করে সর্বদা উদ্যোগশীল, সুখদুঃখাদি সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন, ধর্মের নিত্য সেবনকারী হয়, যাকে কোনো পদার্থ ধর্ম থেকে ছাড়িয়ে অধর্মের দিকে আকর্ষিত করতে না পারে তাকে পণ্ডিত বলে ।

(২) যিনি সদা প্রশস্ত ধর্মযুক্ত কর্ম করেন এবং নিন্দিত অধর্মযুক্ত কর্মকে কখনও সেবন করেন না। কদাপি ঈশ্বর, বেদ ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন না এবং পরমাত্মা, সত্য বিদ্যা ও ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী সেই মনুষ্য পন্ডিতের লক্ষনযুক্ত হয়।

(৩) যিনি বেদাদি, শাস্ত্র এবং অন্যের বলার অভিপ্রায় কে শীঘ্র বুঝতে পারেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদাদি শাস্ত্র ও ধার্মিক বিদ্বানের বচনকে ধ্যান দিয়ে শুনে ঠিকমতো বুঝে, নিরভিমানী শান্ত হয়ে তান্যদের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করেন, পরমেশ্বর থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থ জ্ঞাত হয়ে তদ্বারা উপকার নিতে তনু, মন, ধনে প্রবৃত্ত হয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোকাদি দুষ্টগুণ থেকে পৃথক থাকেন, কারো জিজ্ঞাসা করায় বা উভয়ের বার্তালাপে বিনা প্রসঙ্গের অনুপযুক্ত ভাষণাদি ব্যবহার না করা ব্যক্তি, এই পন্ডিতের প্রথম বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ।

(৪) যে মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য পদার্থের কখনও ইচ্ছা করেন না, অদৃষ্ট বা কোনো পদার্থের নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেলে শোক করার অভিলাষ করেন না এবং বিশাল দুঃখযুক্ত ব্যবহারের প্রাপ্তিতেও মূঢ় হয়ে হতাশ হয়না, সেই সব মনুষ্যকে পন্ডিতের বুদ্ধি যুক্ত বলা হয় ।

(৫) যার বানী সব বিদ্যায় পারঙ্গত, অত্যন্ত অদ্ভুত বিদ্যাসকলের ব্যাখ্যাকারী, না জেনে কোনো পদার্থকে তর্কমাধ্যমে শীঘ্র জ্ঞাতা, শ্রুত, বিচার্য বিদ্যাসকলকে সর্বদা উপস্থিত রাখার এবং সব বিদ্যার গ্রন্থকে মান্য মনুষ্যকে প্রদাতা শীঘ্র অধ্যাপনাকারী বক্তা মনুষ্য, তাকেই পণ্ডিত বলা হয়।

(৬) যারশ্রুত ও পঠিত বিদ্যা স্বীয় বুদ্ধির সর্বদা অনুকূল এবং বুদ্ধি ও ক্রিয়া, শ্রুত, পঠিত বিদ্যানুয়ায়ী যিনি ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মর্যাদার রক্ষক এবং দুষ্ট ডাকাতদের রীতিকে বির্দীনকারী মনুষ্য, সেই পণ্ডিত নামের যোগ্য ।

(৭) যেখানে এমন সত্যপুরুষ তাধ্যাপনাকারী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধ্যয়নকারী হন সেখানে বিদ্যাও ধর্মের বৃদ্ধি হয়ে সর্বদা আনন্দই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেখানে নিম্নলিখিত মূঢ় অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপনাকার হয় সেখানে অবিদ্যা ও অধর্মের উন্নতি হয়ে দুঃখই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রশ্ন. কেমন মনুষ্য পড়াবে না এবং উপদেশ করাবেন না ? মূর্খের লক্ষণ।

উত্তর: যে কোন বিদ্যা পাঠ না করে এবং কোনো বিদ্বানের উপদেশ না শুনে বড়ো অহংকারী, দরিদ্র হয়েও ধনসম্পর্কীয় বড় বড় কাজের ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং না করে বড় বড় ফলের আশা করেন যিনি ।

প্রশ্ন. যারা বিদ্যা পড়বেন ও পড়াবেন তারা নিম্নলিখিত দোষমুক্ত হবেন-

উত্তর: আলস্য, তাভিমান, নেশা করা, মূঢ়তা, চপলতা, ব্যর্থ, এদিক ওদিকের আজে-বাজে কথা বলা, জড়তা, কখনও পড়া, কখনও না পড়া, অভিমান ও লোভ এই সাত বিদ্যার্থীদের জন্য বিদ্যা বিরোধী দোষ। কেননা যার সুখ-আরাম করার ইচ্ছা তার বিদ্যা কোথায় এবং যার চিত্ত বিদ্যাগ্রহণ করতে ব্যস্ত তার বিষয়সম্বন্ধীয় সুখ আরাম কোথায় ? এইজন্য বিষয় সুখার্থী বিদ্যাকে ত্যাগ করবে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখ থেকে অবশ্যই পৃথক থাকবে। নতুবা পরমধর্মরূপ বিদ্যার পড়া-পড়ানো কখনও হতে পারবে না।

প্রশ্ন. কেমন মনুষ্য সব বিদ্যার প্রাপ্তি করতে ও করাতে পারেন?

উত্তর: ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন- হে রাজন। তুমি ব্রহ্মচর্যের গুন শ্রবণ কর। যে মনুষ্য এই সংসারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে ।

তার কোনো শুভগুন অপ্রাপ্ত থাকে না এমন তুমি জানো। এই ব্রহ্মচর্যের প্রতাপে বহু ঋষি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সর্বানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় বাস করে এবং এই লোকেও বহু সুখ প্রাপ্ত হয় ।

যে নিরন্তর সত্যে নিরত, জিতেন্দ্রিয়, শান্তাত্মা উৎকৃষ্ট, শুভগুণ স্বভাবযুক্ত এবং রোগরহিত পরাক্রম সহিত শরীর, ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বেদাদিও সত্য শাস্ত্র এবং পরমাত্মার উপাসনার তাভ্যাস কর্মাদি করেন, তিনি তার সব দুষ্কর্ম ও দুঃখ নষ্ট করে সর্বোত্তম ধর্মযুক্ত কর্ম এবং সব সুখের প্রাপ্তি ঘটান। এবং এই সব গুন দ্বারা মনুষ্য উত্তম অধ্যাপক ও উত্তম বিদ্যার্থী হতে পারে ।

প্রশ্ন. শিক্ষা কাকে বলে ?

উত্তর: যার দ্বারা মনুষ্য বিদ্যাদি শুভ গুণের প্রাপ্তি ও অবিদ্যাদি দোষ ত্যাগ করে সর্বদা আনন্দিত হতে পারে তাকেই শিক্ষা বলা হয়।

প্রশ্ন. বিদ্যা ও অবিদ্যা কাকে বলে ?

উত্তর: যার দ্বারা পদার্থের স্বরূপ যথাবৎ জেনে তার থেকে উপকার নিয়ে নিজ ও তান্যের জন্য সব সুখ প্রতিপন্ন কর পারে তা বিদ্যা এবং যদ্বারা পদার্থের স্বরূপ বিপরীত জেনে নিজের ও অপরের অনুপকার করবে তাকে অবিদ্যা বলা হয় ।

প্রশ্ন. মনুষ্যকে বিদ্যার প্রাপ্তি ও অবিদ্যার নাশের জন্য কী কী কর্ম করা উচিত ?

উত্তর: বর্ণোচ্চারণ থেকে নিয়ে বেদার্থজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মচর্যাদি কর্ম করা যোগ্য।

প্রশ্ন. আদর্শ বিদ্যার্থীর কিছু গুণাবলী উল্লেখ করুন?

উত্তর: আদর্শ বিদ্যার্থীর কিছু গুণাবলী হল- রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠা (সূর্যোদয়ের আগে), নিয়মিত আসন-ব্যায়াম, ভ্রমণ (পরিশ্রম)করা, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান করা, পিতা-মাতা,গুরুজন দের সম্মান ও আজ্ঞা পালন করা।কুসঙ্গ থেকে দূরে থেকে স্বাধ্যায়,সৎসঙ্গ, সেবা, কঠোর পরিশ্রম(পুরুষার্থ) ও সদাচরণকে জীবনের অঙ্গ করে তোলা।

প্রশ্ন. শাস্ত্রে বিদ্যার্থীর কয়টি লক্ষণের কথা বলা আছে ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর: শাস্ত্রে বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে- (১) বিদ্যার্থীকে কাকের মতো সব সময় সজাগ ও সাবধান হতে হবে। (২)বিদ্যার্থীর বকের মতো একাগ্র মন থাকতে হবে। (৩) বিদ্যার্থীকে কুকুরের মতো সতর্ক ঘুমাতে হবে। (৪) বিদ্যার্থীকে খাঁটি, সাত্ত্বিক, পরিমিত ভোজন গ্রহণ করতে হবে। (৫) বিদ্যার্থীকে গৃহস্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচারী কাকে বলে ?

উত্তর: যিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রহ্ম তার্থাৎ বেদবিদ্যা হেতু এবং আচার্যকুলে গিয়ে বিদ্যাগ্রহণ হেতু সচেষ্ট হয় তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়।

প্রশ্ন. আচার্য কাকে বলে ?

উত্তর: যিনি বিদ্যার্থীদেরকে তাত্যন্ত প্রেমপূর্বক ধর্মযুক্ত ব্যবহার সহ শিক্ষাপূর্বক বিদ্যা দান দেওয়ার জন্য তনু, মন ও ধনদ্বারা সচেষ্ট হন, তাঁকে আচার্য বলা হয় ।

প্রশ্ন. নিজ সন্তানদের জন্য মাতা, পিতা ও আচার্য কী কী শিক্ষা দিবেন ?

উত্তর: সেই মনুষ্য সৌভাগ্যবান যার জন্ম ধার্মিক, বিদ্বান মাতা-পিতা ও আচার্যের সম্পর্কে হয়। কেননা এই তিনের শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য উত্তম হয় । এরা নিজ সন্তান ও বিদ্যার্থীকে ভালো ভাষা বলা, পান-ভোজন, ওঠা বসা, বস্ত্রধারণ করার, মাতা-পিতা ইত্যাদিকে মান্য করার, তাদের সামনে যথেচ্ছাচারী না হওয়ার, বিরুদ্ধ চেষ্টা না করার জন্য সচেষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিবেন এবং তাদের সামর্থানুযায়ী উত্তম কথা শিখাতে থাকবেন। এই প্রকার পুত্র ও কন্যাকে পাঁচ বা আট বৎসর পর্যন্ত মাতা-পিতা এবং তৎপশ্চাৎ আচার্য শিক্ষা দিবেন ।

প্রশ্ন. বিদ্যা কী প্রকার এবং কোন কর্ম থেকে হয় ?

উত্তর: বিদ্যা চার প্রকারে আসে- **আগমকাল, স্বাধ্যায়, প্রবচন ও ব্যবহারকাল।**

'আগমকাল' তাকে বলে যে যার দ্বারা মনুষ্য তাধ্যাপনকারী থেকে সতর্ক হয়ে, ধ্যানপূর্বক বিদ্যাদি পদার্থ গ্রহণ করতে পারে।

'স্বাধ্যায়' তাকে বলে যে, যা পঠনের সময়ে আচার্যের মুখ থেকে শব্দ, অর্থ ও তাদের যে সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হয়, এবং সেগুলি একান্ত সুস্থচিত্তে পূর্বাপর বিচার করে হৃদয়ে সঠিক দৃঢ় করতে পারে।

'প্রবচন কাল' তাকে বলে যে, যার দ্বারা অন্যকে প্রীতিপূর্বক বিদ্যা পড়াতে পারে।

'ব্যবহারকাল' তাকে বলে সে, যখন যখন নিজ আত্মায় সত্যবিদ্যা প্রতিত হয়, তখন নিশ্চয় করা, এটা করা বা না করা, সেটা ঠিক মতো প্রতিপন্ন হয়ে সেইরকম আচরণ করা সম্ভব হতে পারে।

বিদ্যার চারটি প্রয়োজন এবং অন্যও চার কর্ম বিদ্যাপ্রাপ্তি হেতু প্রয়োজন যথাঃ- শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার।

(১) **'শ্রবণ'** তাকে বলে যে, আত্মা মনের এবং মন শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত করে অধ্যাপকের মুখ থেকে যা যা অর্থও সম্বন্ধের প্রকাশকারী শব্দ বের হয়, তাকে শ্রোত্র থেকে মন ও মন থেকে আত্মায় সংগ্রহ করতে পারা যায়।

(২) **'মনন'** তাকে বলে যা যা শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ আত্মায় সংগৃহীত হয়েছে তার একান্তে সুস্থচিত্ত হয়ে বিচার করা যে, কোন্ শব্দ কী অর্থের সঙ্গে এবং কোন্ অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থাৎ মিল থাকে এবং এই মিলনে কী প্রয়োজন এবং সিদ্ধি ও বিপরীত হওয়ায় কী কী ক্ষতি হয় ?

(৩) **'নিদিধ্যাসন'** তাকে বলে যে, যে শব্দ অর্থও সম্বন্ধ শোনা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে সেগুলি সঠিক কি না ? এই কথার বিশেষ পরীক্ষা করে দৃঢ় নিশ্চয় করা

(৪) **'সাক্ষাৎকার'** তাকে বলে যে, যেসব অর্থের শব্দ ও সম্বন্ধ শোনা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে এবং নিশ্চয় করা হয়েছে তার যথাযথ জ্ঞান ও ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যক্ষ করে ব্যবহারের সিদ্ধির ফলে নিজের ও পরের উপকার করা ইত্যাদি এসব হয় বিদ্যা প্রাপ্তির সাধন।

প্রশ্ন. আচার্যের সঙ্গে বিদ্যার্থী কেমন ব্যবহার করবে এবং কী কী করবে না ?

উত্তর: মিথ্যা ত্যাগ করে সত্য বলবে, সরল থাকবে, অভিমান করবে না, আজ্ঞাপালন করবে, স্তুতি করবে, নিন্দা করবে না, নিম্ন আসনে বসবে, উচ্চাসনে বসবেনা, শান্ত থাকবে, চপলতা প্রকাশ করবে না, আচার্যতাড়না করলে প্রসন্ন থাকবে,

ক্রোধকখনও করবে না, যখন আচার্য কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, তখন হাত জোড় করে নম্র হয়ে উত্তর দেবে, অহংকার করে বলবে না, যখন তিনি শিক্ষা দিবেন তখন একাগ্র চিত্তে শুনবে, হাসাহাসি বা ঠাট্টা করবে না।

প্রশ্ন. আচার্য বিদ্যার্থিদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন ?

উত্তর: যে প্রকার বিদ্যার্থী বিদ্বান, সুশীল, নিরভিমানী, সত্যবাদী, ধর্মাত্মা, আস্তিক, নিরলস, উদ্যোগী, পরোপকারী, বীর, ধীর, গম্ভীর, পবিত্র, আচরণ, শান্তিযুক্ত জিতেন্দ্রিয়, ঋজু, প্রসন্নবদন হয়ে মাতা-পিতা, আচার্য, অতিথি, বন্ধু, মিত্র, রাজা, প্রজাদির প্রিয় হবে, যখন কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবে তখন যা তার মুখ থেকে অক্ষর, পদ, বাক্য বের হবে শান্ত হয়ে শুনে প্রত্যুত্তর দিবে। যখন কেউ কুচেষ্টা, মলিনতা, নোংরা বস্ত্রধারণ, ওঠা-বসায় বিপরীত আচরণ, নিন্দা, ঈর্ষা, দ্রোহ, বিবাদ, কলহ, গোলমাল, কারও উপর মিথ্যা দোষ লাগানো, চুরি, ব্যভিচার, অনভ্যাস, আলস্য, অতিনিদ্রা, অতিভোজন, অতিজাগরণ, ব্যর্থ ক্রীড়া, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা, বিষয়সেবন, কুব্যবহারের কথা বলা বা শোনা, দুষ্টের সঙ্গ করা, ইত্যাদি দুষ্ট ব্যবহার কঠিন শাস্তি করবে তখন তাকে অপরাধ অনুযায়ী কঠিন শাস্তি দিবেন।

প্রশ্ন. সত্য ও অসত্যের নিশ্চয় কী প্রকারে হয় কেননা যা একজন সত্য বলে অন্য জন তাকে মিথ্যা বলে। তা নির্ণয় করার নিশ্চিত সাধন কী কী?

উত্তর: পাঁচটি সাধন। **প্রথম** - ঈশ্বর তার গুণ, কর্ম, স্বভাব ও বেদবিদ্যা। **দ্বিতীয়** - সৃষ্টিক্রম, **তৃতীয়** - প্রত্যক্ষাদি অষ্ট প্রমাণ, **চতুর্থ** - আপ্তপুরুষদের আচার, উপদেশ, গ্রন্থ ও সিদ্ধান্ত এবং **পঞ্চম** – স্বীয় আত্মার সাক্ষ্য, অনুকূলতা, জিজ্ঞাসুতা, পবিত্রতা ও বিজ্ঞান।

ঈশ্বরাদি দ্বারা পরীক্ষা করা অর্থাৎ যা ঈশ্বরের ন্যায়াদি গুণ যা পক্ষপাতরহিত সৃষ্টি রচনা করার কর্ম ও সত্য, ন্যায়, দয়ালুতা, পরোপকারিতাদি স্বভাব ও বেদোপদেশ দ্বারা সত্য ও ধর্ম স্থির হয় তাই সত্য ও ধর্ম এবং যা অসত্য ও অধর্ম স্থির হয়, তাই অসত্য ও অধর্ম। যেমন– কেউ যদি বলে যে, বিনা কারণ ও কর্তা দ্বারা কার্য হয় সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জানবে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যা সৃষ্টি রচনাকারী বস্তু সেটা ঈশ্বর ও তার গুণ, কর্ম, স্বভাব, বেদ ও সৃষ্টিক্রম দ্বারাই নিশ্চিত জানা যায় ।

সৃষ্টিক্রম তাকে বলে যে সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ সৃষ্টির গুণ, কর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধে তা মিথ্যা এবং যা অনুকূল তাকে সত্য বলে । কেউ যদি বলে যে, বিনা মাতা-পিতার সন্তান, কর্ণ দিয়ে দেখা, চক্ষু দিয়ে বলা ইত্যাদি হয়েছে, সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে হওয়ায় তা মিথ্যা এবং মাতা-পিতা থেকে সন্তান, কর্ণ দিয়ে শ্রবণ ও চক্ষু দিয়ে দর্শন ইত্যাদি সৃষ্টিক্রমের অনুকূল হওয়ায় সত্য।

'প্রত্যক্ষাদি অষ্ট প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা' করা তাকে বলে যে, যা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঠিক নির্ধারিত হয় তাই সত্য এবং যা বিরুদ্ধ তাকে মিথ্যা বুঝতে হবে। যেমন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করলো – এটা কী ? দ্বিতীয় জন উত্তর দিল- পৃথিবী। এটা **প্রত্যক্ষ।** একে দেখে এর কারণের নিশ্চয় করা অনুমান। যেমন বিনা নির্মানকারীর গৃহ তৈরী হতে পারে না সেইরূপ সৃষ্টির নির্মাণকর্তা ঈশ্বরও বিরাট কারিগর। এই দৃষ্টান্ত **উপমান** এবং সত্যোপদেষ্টাদের উপদেশ তা **শব্দ।** ভূতকালস্থ পুরুষদের চেষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি পদার্থের বৃত্তান্ত এইগুলি **ঐতিহ্য।** একটা কথা শুনে অন্য কথা না শুনে, প্রসঙ্গমাত্র জেনে অন্য কথা জেনে যাওয়া এ **অর্থাপত্তি।** কারণ থেকে কার্য হওয়া ইত্যাদিকে **সম্ভব**, আর কেউ কাউকে বললো - জল নিয়ে এসো। সে সেখানে জলের অভাব দেখে তর্কের মাধ্যমে জানতে পারে জল কোথায় এবং সেখান থেকে জল নিয়ে এসে দেয়। একেই অভাব প্রমাণ বলে। এই অষ্ট প্রমাণ থেকে যা বিপরীত না হয় তাকে সত্য এবং যা বিরুদ্ধ তাকে মিথ্যা জানবে।

'আপ্তপুরুষদের আচরণ ও সিদ্ধান্ত থেকে পরীক্ষা' করা তাকে বলে যে, যারা সত্যবাদী, সত্যকারী, সত্যমানী, পক্ষপাত শূন্য, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্বান সকলের জন্য চেষ্টা করেন, তাদের ধার্মিক ব্যক্তিরা আপ্ত পুরুষ বলে। তাদের উপদেশ, আচরণ, গ্রন্থ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে যা যুক্ত তাই সত্য এবং যা বিপরীত তাই মিথ্যা।

'আত্মা দিয়ে পরীক্ষা' তাকে ; বলে যে, যা আত্মা নিজের জন্য চায়, তাই সকলের জন্য চাওয়া, আর যা না চায়, তার কারো জন্য না চাওয়া, যেমন আত্মায় তেমন মনে, যেমন মনে সেইরূপ ক্রিয়ায় পরিণত করার ইচ্ছা, শুদ্ধ ভাবও বিদ্যার নেত্র দিয়ে দেখে সত্য ও অসত্যের নিশ্চয় করা দরকার। এই পাঁচ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপন-অধ্যয়নকারী এবং সব মনুষ্য সত্যাসত্যের নির্ণয় করে ধর্মের এবং অধর্মের পরিত্যাগ করবেন ও করাবেন ?

প্রশ্ন. ধর্ম ও অধর্ম কাকে বলে ?

উত্তর: যা পক্ষপাত রহিত ন্যায়, সত্যগ্রহণ, অসত্যের পরিত্যাগ, পাঁচ পরীক্ষার অনুকূল আচরণ, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন, পরোপকার করা ধর্ম, বিপরীত অধর্মযুক্ত।

যার স্বরুপ ঈশ্বর-আজ্ঞার যথাবৎ প্রতিপালন এবং পক্ষপাত শূন্য হয়ে ন্যায়ানুসারে সকলের হিতসাধন করা। যা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সুপরীক্ষিত এবং বেদোক্ত হওয়ায় সর্বমানবের পক্ষে একমাত্র মান্য, তাকে **"ধর্ম"** বলে।

যার স্বরূপ-ঈশ্বর আজ্ঞা বিবর্জিত, এবং পক্ষপাতদুষ্ট, অন্যায়পূর্ণ এবং স্বহিত সাধনে নিযুক্ত। যা অবিদ্যা, হঠকারিতা, অভিমান ক্রুরতা আদি দোষযুক্ত হওয়ায় বেদ বিরুদ্ধ এবং সর্ব মানুষ পরিত্যাজ্য, তাকে **'অধর্ম"** বলে।

প্রশ্ন. কন্যাদের তাধ্যয়ন করাতে বৈদিক প্রমাণ কোথায় ?

উত্তর: ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।। [অথর্ববেদ]

যেমন ছেলেরা ব্রহ্মচর্য পালন করে সেইরূপ মেয়েরা ব্রহ্মচর্য পালন করে বর্ণোচ্চারণ থেকে নিয়ে বেদপর্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করে প্রসন্ন হয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক যুবাবস্থাসম্পন্ন বিদ্বান পতিকে বেদোক্ত রীতিতে গ্রহণ করবে ।

প্রশ্ন. বিদ্যা কী কী ক্রমে প্রাপ্ত হতে পারে ?

উত্তর: বর্ণোচ্চারণ, ব্যবহারের শুদ্ধি, পুরুষার্থ, ধার্মিক, বিদ্বানের সাথে বিষয়কথা প্রসঙ্গের ত্যাগ সুবিচারপূর্বক ব্যাকরণাদি শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধ যথাযথ জেনে, উত্তম ক্রিয়া করে সাক্ষাৎ করতে থাকবে। যে বিদ্যার জন্য যে সাধনরূপ সত্য গ্রন্থ, সেইগুলি পাঠ করে বেদাদি পাঠ যোগ্য গ্রন্থের অর্থ জ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি কর্ম শীঘ্র বিদ্বান্ হওয়ার সাধন।

প্রশ্ন. অধ্যয়ন না করলে মনুষ্যের কী গতি হবে ?

উত্তর: দুইটি, একটা ভালো এবং অন্যটা মন্দ, ভালো তাকে বলে, যে মনুষ্যের বিদ্যা পড়ার সামর্থ্য নেই কিন্তু সে ধর্মাচরণ করতে চায় তাহলে বিদ্বানদের সঙ্গ এবং স্বীয় আত্মার পবিত্রতা ও অবিরুদ্ধতা দ্বারা ধর্মাত্মা আবশ্য হতে পারে। যখন কারো উপর চুরি বা মিথ্যা মামলা আরোপ করা হয় তখন তার কি ভালো লাগে এবং যে কর্ম করতে স্বীয় আত্মায় শঙ্কা, লজ্জা ও ভয় হয় না, সে ধর্ম কি কারো বিদিত হয় না ? কেউ যদি আত্মবিরোধ তার্থাৎ আত্মায় অন্য এবং বানীতে অন্য এবং ক্রিয়ায় বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে সে অধর্মী এবং যার যেমন আত্মায় সেই রূপবানী এবং যেরূপ বানীতে সেরূপ ক্রিয়ায় আচরিত হয়, সে কি ধর্মাত্মা নয় ? প্রমান -

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।

[যজুর্বেদ ৪০।৩]

অর্থাৎ : সে আত্মহত্যাকারী তার্থাৎ আত্মস্থজ্ঞানের বিরুদ্ধে বলে মানে ও করে তারাই লোকতাসূর অর্থাৎ দৈত্য, রাক্ষস নামধারী মনুষ্য এবং তারাই অত্যন্ত অধর্মরূপ অন্ধকার যুক্ত হয়ে জীবিত থাকে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও দুঃখদায়ক দেহাদি পদার্থকে সর্বদা প্রাপ্ত হয় এবং যে আত্মরক্ষক অর্থাৎ আত্মার অনুকূলেই বলে, মানে ও আচরণ করে, সেই সব মনুষ্য

বিদ্যারূপ শুদ্ধ প্রকাশ যুক্ত হয়ে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ নামে প্রখ্যাত হয়। তারাই সর্বদা সুখ প্রাপ্ত হয়ে মরার পরেও আনন্দযুক্ত দেহাদি পদার্থ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. ন্যায় ও অন্যায় কাকে বলে ?
উত্তর: যা পক্ষপাত রহিত সত্যাচরণ করাই ন্যায়, অন্যায় এবং যা পক্ষপাত পূর্বক মিথ্যাচরণ করা, তাকে অন্যায় বলে।

প্রশ্ন. বিদ্যা পড়ার সময় বা পড়ে কোন অন্যকে পড়াবে কি না ?
উত্তর: বরাবর পড়াতে থাকবে কেননা পড়ার চেয়ে পড়ানোয় বিদ্যার বৃদ্ধি বেশী হয়, নিজে পড়ে নিজে একা বিদ্বান হওয়া যায় কিন্তু পড়ালে অন্যও হয়ে যায়, উত্তরোত্তর বিদ্যার বৃদ্ধি হতে থাকে। যারা বিদ্যা লাভ করে সেই মনুষ্য পরোপকারী, ধার্মিক অবশ্যই হয়। কেননা যেমন অন্ধ কুঁয়ায় পড়ে যায় কিন্তু চক্ষুষ্মান কখনো পড়েনা। অবিদ্যার হানি হওয়া ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ালে সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন. যে বিদ্যা পড়া হয়েছে এবং যার মধ্যে ধার্মিকতা না থাকে তাহলে তার বিদ্যার ফল হবে কি না?
উত্তর: কখনও নয় কেননা বিদ্যার ফল এই যে, মনুষ্যকে অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে।

প্রশ্ন. পুরুষার্থ কাকে বলে তার কত ভেদ ?
উত্তর: অধ্যবাসায়ের নাম পুরুষার্থ এবং তার চারটি ভেদ। এক তা প্রাপ্তির ইচ্ছা, দুই – প্রাপ্তির যথাযথ রক্ষা করা, তিন– রক্ষিতের বৃদ্ধি - এবং চতুর্থ – বৃদ্ধি প্রাপ্ত পদার্থের ধর্মে খরচ করা, পুরুষার্থের এইগুলি - ভেদ, যা ন্যায় ধর্ম সহ যুক্ত ক্রিয়া থেকে অপ্রাপ্ত পদার্থের অভিলাষ করে পরিশ্রম করা।

প্রশ্ন. মনুষ্যত্ব কাকে বলে ?
উত্তর: এই মনুষ্য জাতির মধ্যে এমন একটা গুণ যা অন্য কোনো জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন. সব মনুষ্যের পক্ষে বিদ্বান ও ধর্মাত্মা হওয়া সম্ভব কি না ?
উত্তর: বিদ্বান হওয়া তো সম্ভব নয় কিন্তু ধর্মাত্মা হতে চাইলে সকলে হতে পারে। অবিদ্বান ব্যক্তিরা অন্যকে ধর্মে নিশ্চয় করাতে পারে না এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা ধার্মিক হয়ে অনেক মনুষ্যকেও ধার্মিক করতে পারে এবং কোনো পূর্ত মনুষ্য অবিদ্বানকে প্রলোভিত করে অধর্মে প্রবৃত্ত করাতে পারে। কিন্তু বিদ্বান অধর্মে কখনও চলতে পারে না কেননা যেমন দেখে কোন মনুষ্য কূয়ায় কখনও পড়ে না কিন্তু অন্ধের পড়ার সম্ভাবনা বেশী, সেইরূপ বিদ্বান সত্যাসত্য জেনে তাতে নিশ্চিত থাকতে পারে কিন্তু অবিদ্বান্ সঠিক স্থির থাকতে পারে না।

প্রশ্ন. দানাভক্ষ ও দানাধ্যক্ষ কাকে বলে ?
উত্তর: যে দাতার দান ভক্ষণ করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে থাকে তাকে দানাভক্ষ এবং যে দাতার দান কে সুপাত্র বিদ্বানদেরকে দিয়ে তা দ্বারা বিদ্যা ও ধর্মের উন্নতি করে তাকে দানাধ্যক্ষ বলে।

প্রশ্ন. রাজা কাকে বলে ?

উত্তর: যে বিদ্যা, ন্যায়, জিতেন্দ্রিয়তা, শোর্য, ধৈর্যাদি গুনে যুক্ত হয়ে স্বীয় পুত্র সমান প্রজাপালনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দিগের রক্ষা ও দুষ্টদের দন্ড দিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি যুক্ত হয়ে নিজের প্রজাকে করিয়ে আনন্দিত থাকে এবং সবাইকে সুখযুক্ত করায়, তাকে রাজা বলা হয়।

প্রশ্ন. প্রজা কাকে বলে ?

উত্তর: যেমন পুত্রাদি তনু, মন, ধন দিয়ে, নিজের মাতা-পিতাদির সেবা করে তাদেরকে সর্বদা প্রসন্ন রাখে সেইরূপ প্রজা অনেক প্রকারের ধর্মযুক্ত ব্যবহার দ্বারা পদার্থকে সিদ্ধ করে রাজসভাকে কর দিয়ে তাকে সর্বদা প্রসন্ন রাখে তাকে প্রজা বলে।

সফলতা লাভের উপায়

প্রশ্ন. সফলতা অর্জন করার কিছু কারণ লিখুন।

উত্তর: সাফল্য অর্জনের জন্য সতর্কতা ও সাবধানতা, স্বাস্থ্য ও শক্তি, নিয়মিত রুটিন, সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা, সময়মতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, চিন্তাভাবনা ও বিচার করা,পরিণাম ও প্রভাবের অনুমান করা, সহনশীলতা ও ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সেবা- পরোপকার, দয়া, আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা,দয়া ও ক্ষমার অনুভূতি, ভুল-ত্রুটি সংশোধন ইত্যাদি প্রধান কারণ।

প্রশ্ন. কে অসফল বা ব্যর্থ হয়?

উত্তর: অসাবধান, দুর্বল, রোগী,অনিয়মিত,অব্যবস্থিত সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী (দেরিতে কাজ করা), নিরাশ হতাশ, অসংগঠিত,অলস প্রমাদযুক্ত ,নিষ্ঠুর-কঠোর, স্বার্থপর, চঞ্চল-দ্রুত,সংকল্পবদ্ধ,প্রতিজ্ঞা, কৃপণ, লোভী, নাস্তিক ব্যক্তি ব্যর্থ, ও অসফল হয়।

প্রশ্ন. সফলতা অর্জন করার মূল সূত্র বলুন?

উত্তর: সফলতা অর্জনের জন্য (১) মনে কাজ করার তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে (২) কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংগ্রহ থাকতে হবে (৩) সম্পদ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে (৪)) চূড়ান্ত ফলাফল অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকা উচিত (৫) বাধা সহ্য করার জন্য কঠোর তপস্যা করা উচিত (৬) জ্ঞান, শক্তি, সাহস, উদ্যম, বীরত্ব ইত্যাদি অর্জনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা।

যজ্ঞ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. যজ্ঞ কীভাবে করে ? যজ্ঞের পরিভাষা কী?

উত্তর: যজ্ঞের সাধারণ অর্থ হল দান করা, ত্যাগ করা যজ্ঞ এবং বস্তু বা জিনিসের যথাযথ ব্যবহার করা।

প্রশ্ন. যজ্ঞকুণ্ড কেন বিশেষ আকৃতির তৈরি, যেকোনো পাত্রে কেন যজ্ঞ করা হয় না?

উত্তর: বিশেষ ধরনের যজ্ঞকুণ্ডে আগুনের তাপমাত্রা বেশি হলে ঘি ও অন্যান্য উপাদান দ্রুত পুড়ে যায় এবং খুব সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে।

প্রশ্ন. কেন শুধু সমিধা হিসেবে (কাঠ) যেমন পিপল, বটগাছ, আম, ডুমুর ইত্যাদি যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয়? যেকোন গাছের কাঠ দিয়ে যজ্ঞ করলে ক্ষতি হয় কি?
উত্তর: পিপল, আম ইত্যাদি বিশেষ গাছ পোড়ানোর ফলে খুব কম ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস কম উৎপন্ন হয় এবং কয়লা ও ছাইও কম উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন. যজ্ঞে কেন শুধু গরুর ঘি ব্যবহার করা হয়? মহিষ, ছাগল, উট বা উদ্ভিজ্জ ঘি বা তেল ব্যবহার করা হয় না কেন?
উত্তর: কারণ গরুর ঘি পোড়ালে বিশেষ গ্যাস উৎপন্ন হয় যা দ্রুত আকাশে স্থিত প্রচুর পরিমাণে দূষণ শীঘ্রই ধ্বংস করে। অন্য কোন ঘি বা তেলের এই শক্তি নেই।

প্রশ্ন. সূর্যোদয়ের পরে এবং সূর্যাস্তের আগে কেন যজ্ঞ করা হয় না ?
উত্তর: সূর্যের রশ্মি যজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন বিশেষ রোগ-নাশক গ্যাস বহন করে এবং আকাশে ছড়িয়ে দেয়, এই কাজ রাতে করা সম্ভব নয় ।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করার আগে কেন আচমন এবং অঙ্গ স্পর্শ (জল দিয়ে) করে?
উত্তর: জল দ্বারা আচমনের ফলে শরীর পবিত্র হয় এবং পবিত্র চিন্তার উৎপন্ন হয় ।

প্রশ্ন. যদি যজ্ঞ ভৌতিক ক্রিয়া হয় তবে কেন করা হয় ?
উত্তর: মন্ত্রের উচ্চারণ: মন্ত্র পাঠ করলে যজ্ঞের সুফল পাওয়া যায় এবং মন্ত্রগুলি সাধিত হয়। পরিণাম বিবেচনা করলে আত্মায় বিশুদ্ধতা আসে।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করার ফলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তা কি বায়ু দূষণের কারণ হয় না ?
উত্তর: যজ্ঞের ফলে সামান্য দূষণ হতে পারে, কিন্তু যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্ট বিশেষ বায়ু বহু প্রকার রোগের জীবাণু ধ্বংস করে।

প্রশ্ন. যজ্ঞে ঘি-এর সঙ্গে বিভিন্ন ভেষজ উপাদান ও দেওয়া হয় কেন ?
উত্তর: সামগ্রী জ্বালানোর উপাদানের বিভিন্ন উপকারিতা আছে এবং ঘি পোড়ানোর বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন. যজ্ঞের উপাদান কি কি রয়েছে ?
উত্তর: যজ্ঞের উপাদানগুলির মধ্যে প্রধানত সুগন্ধযুক্ত, রোগ নিরাময়কারী, পুষ্টিকারী এবং মিষ্টি পদার্থ রয়েছে।

প্রশ্ন. 'স্বাহা' শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর:স্বাহা শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ রয়েছে:
১. সত্য কথা বলা
২. মিষ্টতার সাথে বলা
৩. নিজের জিনিসকে নিজের বলে বলা
৪. নিজের মনের দ্বারা কথা বলা এবং কর্ম করা।
৫. পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করার ক্ষমতা রাখা ।

৬. আগুনে ঘি সামগ্রী নিক্ষেপ করা।

প্রশ্ন. তিনটি সমিধা কে ঘি তে ডুবিয়ে নিবেদন করার বিশেষ কারণ কী ?
উত্তর: সমিধা কে ঘিতে ডুবিয়ে দিলে তা দ্রুত জ্বলে।

প্রশ্ন. যজ্ঞ থেকে কি আধ্যাত্মিক ও মানসিক উপকারও পাওয়া যায় ?
উত্তর: হ্যাঁ, যজ্ঞ করলে শারীরিক স্বাস্থ্য, ত্যাগের অনুভূতি, প্রসন্নতা , পবিত্রতা ইত্যাদি গুণের প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন. ঘি দেওয়া হয় কেন?
উত্তর: এটা এইজন্য করা হয় যাতে সব সমীধায় সমানভাবে ঘি লাগানো হয় এবং সেগুলো ঠিকমতো পুড়ে যায়।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করা কি সবার জন্য অনিবার্য ?
উত্তর: শাস্ত্রে যজ্ঞ করা প্রত্যেকের জন্য অনিবার্য করা হয়েছে, সে অল্প করুক বা বেশি করুক।

প্রশ্ন. যজ্ঞ, হবন, অগ্নিহোত্র, হোম কী ?
উত্তর: অগ্নিহোত্র মানে হবন কুণ্ডে পবিত্র ঘৃত সামগ্রী জ্বালানো। হবন এবং হোম অগ্নিহোত্রের সমার্থক শব্দ, তবে যজ্ঞ শব্দের অর্থ আরও বিস্তৃত, যার অর্থ পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে প্রতিটি শুভ কাজ করা, নিষ্কাম, পুরুষার্থ , ত্যাগ এবং তপস্যা পূর্বক করা, যাতে পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই কি যজ্ঞ করার অধিকার আছে নাকি যে কেউ যজ্ঞ করতে পারবে?
উত্তর: সকল মানুষেরই যজ্ঞ করার অধিকার রয়েছে। শুধু ব্রাহ্মণদের নয়।

প্রশ্ন. যজ্ঞকে কেন শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়?
উত্তর: অল্প টাকা, অল্প সম্পদ এবং অল্প সময়ে হাজার হাজার ও প্রাণির জীবনদায়ী ও রোগ-নাশক ঔষধি বায়ু প্রাপ্ত হয় । তাই যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন. একটি ছোট যজ্ঞকুণ্ড থেকে সামান্য ঘি ও উপাদান নিয়ে তা গ্রামে-গঞ্জের ভয়ংকর দূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?
উত্তর: যেমন সামান্য পটাশিয়াম সায়ানাইড শত-হাজার মানুষের জীবন ধ্বংস করে, তেমনি সামান্য ঘি, সামগ্রী লাখ লাখ মানুষকে জীবন দেয়।

প্রশ্ন. যদি ধূপকাঠি, সুগন্ধি, ফুল ইত্যাদি দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে পবিত্র করা যায় তাহলে যজ্ঞের প্রয়োজন কী?
উত্তর: ধূপকাঠি শুধুমাত্র সুগন্ধি উৎপন্ন করে কিন্তু রোগের জীবাণু ধ্বংস করে না। বাতাসও বিশুদ্ধ করে না ।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করলে কি যজ্ঞকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয় ?
উত্তরঃ যজ্ঞের সাথে সাথে পুরুষার্থ প্রত্যাশিত, শুধুমাত্র অগ্নিহোত্রে ইচ্ছা পূরণ হয় না।

প্রশ্ন. যজ্ঞকারীর কি যজ্ঞ করার সময় বিশেষ পোশাক পরিধান করা উচিত?

উত্তর: এটার প্রয়োজন নেই, তবে আপনি চাইলে করতে পারেন।

প্রশ্ন. আমি কি আমার ব্যক্তিগত যজ্ঞ অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করে তার দ্বারা করাতে পারি ?
উত্তর: হ্যাঁ, সময় না থাকলে অন্যকে দিয়ে করতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত যজ্ঞ করার সুফল লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন. কেন আমরা যজ্ঞের আগে সংকল্প পাঠ করি ?
উত্তর: সময় গণনার উদ্দেশ্যে সংকল্প পাঠ করা হয়। যজ্ঞকর্তা শুভ কাজ করছেন এমন অনুভূতিও মনের মধ্যে উৎপন্ন হয় ।

প্রশ্ন. বেদীর উত্তর দিকে প্রদীপ আর পূর্ব দিকে জল রাখা হয় কেন ?
উত্তর: এটি সুবিধার জন্য একটি ব্যবস্থা মাত্র।

প্রশ্ন. যজ্ঞের মাধ্যমে কি কাঙ্খিত সময় ও স্থানে বৃষ্টি হতে পারে বা অতিরিক্ত বৃষ্টি বন্ধ বা কম করা যায় ?
উত্তর: হ্যাঁ, এই ধরনের বিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু বর্তমানে এই জ্ঞান সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে।

প্রশ্ন. আগুন জ্বালানোর জন্য কি কাঠের পরিবর্তে গোবরের প্রয়োগ ব্যবহার করা যাবে ?
উত্তর: আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠের পরিবর্তে গোবরের ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রশ্ন. কোন ব্যক্তি কি যজ্ঞ করা ছেড়ে দিতে পারে ?
উত্তর: যে ব্যক্তি আসক্তি রহিত সন্যাসী, তার জন্য যজ্ঞ করা আবশ্যক নয় কারণ তার জীবনই যজ্ঞে পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন. মন্ত্রের অর্থ না জেনে যজ্ঞ করে কি কোন লাভ আছে ?
উত্তরঃ মন্ত্রগুলির অর্থ না জেনে যজ্ঞ করলে অবশ্যই ভৌতিক লাভ হবে, কিন্তু মন্ত্রগুলির অর্থ জানার ফলে যে মানসিক ও বৌদ্ধিক শান্তি পাওয়া যায় তা হবে না।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করলে কি শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময় হয় ?
উত্তর: হ্যাঁ, যজ্ঞ করলে শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময় হয়।

প্রশ্ন. যজ্ঞ কি ঘি ছাড়া বা কোন উপাদান ছাড়া করা যাবে ?
উত্তর: হ্যাঁ, যদি ঘি বা অন্যান্য উপাদান না পাওয়া যায় তবে অন্যান্য পদার্থ যেমন ওষুধ, শস্য, গাছপালা ইত্যাদি দিয়ে যজ্ঞ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন. যজ্ঞকুণ্ডে রেখে যাওয়া ভস্মের কোন ব্যবহার হয় কী?
উত্তর: মাঠ, শস্যাগার, বাগান, ফুল, ফল ও সবজিতে ছাই ছড়িয়ে দেওয়া উত্তম । এটি একটি চমৎকার সার হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্ন. যজ্ঞ যদি ভৌতিক ক্রিয়া হয় তবে কেন এর সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা, প্রার্থনা এবং উপাসনার মন্ত্র জপ করা হয়, বেদ মন্ত্র পাঠ করার প্রয়োজন কি?
উত্তর: এটি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা তৈরি করে এবং কৃতজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণাও পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন. যজ্ঞে পশু বলি, পাখি বলি বা মাংস, মদ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে কি ?
উত্তর: না, যজ্ঞকে হিংসারহিত কাজ বলা হয়েছে। এতে মাংস ও বিভিন্ন হিংসা যুক্ত অপবিত্র পদার্থ প্রদান করা হয় না।

প্রশ্ন. গোমেধ,অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্থ কি?এসব যজ্ঞে কি গাভি বা ঘোড়াকে বলি দেয়া হয়?
উত্তর: গোমেধ যজ্ঞের অর্থ হলো ---শরীরের ইন্দ্রিয় গুলোকে শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করা।এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্থ হলো –রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সুখ সম্পন্ন করার জন্য উত্তম কাজ গুলো করা।এই যজ্ঞে কোন গাভী বা ঘোড়াকে বলি দেয়া হয়না।

প্রশ্ন. নারী ও শূদ্ররাও কি যজ্ঞ করতে পারে ?
উত্তর: হ্যাঁ, নারী ও শূদ্ররাও যজ্ঞ করতে পারে।

প্রশ্ন. যজ্ঞে কোথায়, কখনো , কোন অবস্থায় পাপ ও হিংসা হয় ?
উত্তর: না, শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ করলে কোথাও, কোনো সময়, কোনো পরিস্থিতিতে কোনো পাপ বা হিংসা হয় না।

প্রশ্ন. যজ্ঞকর্ম কি সকাম কর্ম নাকি নিষ্কাম কর্ম ?
উত্তর: যজ্ঞ আচার উভয় প্রকার হয়, সকাম এবং নিষ্কাম ।

প্রশ্ন. যজ্ঞের মাধ্যমে কি হত্যা, মোহন, ঊর্ধ্বতন, বশীকরণ, পরাজিত, জয় ইত্যাদি কাজ করা যায়?
উত্তর: না, যজ্ঞে হত্যা মোহন প্রভৃতি কোন কর্মকাণ্ড নেই, এগুলো দুষ্ট লোকের ধূর্ততা ও চালাকি ।

প্রশ্ন. দিয়াশলাই ছাড়া বা শুধু মন্ত্র পাঠ করে আগুন জ্বালানো যায়?
উত্তর: শুধু মন্ত্র উচ্চারণ করে আগুন জ্বালানো যায় না।

প্রশ্ন. যজ্ঞকারী ব্যক্তির জন্য কি যজ্ঞোপবিত পরা অনিবার্য ? এটা ছাড়া কি যজ্ঞ সম্ভব নয় ?
উত্তর: শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ঋষিরা এই ব্যবস্থা করেছেন যে যজ্ঞোপবিত পরিধান করে যজ্ঞ করতে হবে, কিন্তু যজ্ঞোপবিত না পরে যজ্ঞ করলে পাপ হয় না।

প্রশ্ন. বেদের মন্ত্রের মতো গীতা,রামায়ণ, মহাভারতের শ্লোক পাঠ করে কি যজ্ঞ করা যায়?
উত্তর: না,গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক বলে যজ্ঞ করা উচিত নয় কেননা বেদ মন্ত্রের যে অর্থ পাওয়া যায় সেটা গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোকে পাওয়া যায়না।

প্রশ্ন. যদি ঘৃত পাত্রে ঘী অবশিষ্ট থেকে যায় এবং অন্যান্য সামগ্রী ও পাত্রে অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেগুলো কি করা প্রয়োজন?সেগুলো কি যজ্ঞকুণ্ডে ঢেলে দিতে হবে নাকি না?

উত্তর: যদি অগ্নি ঘী-সামগ্রীকে পোড়াতে পারে তাহলে ঢালা যায়।নাহলে পৃথক পাত্রে ঘৃত সামগ্রী পরের দিনের জন্য রাখা উচিত ।

প্রশ্ন. যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন করা যায়?
উত্তর: হ্যাঁ,করা যেতে পারে কিন্তু নিজে করলে যে উপকার পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন. অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ যজ্ঞকারীর কি পাপ হয় বা কোন লাভ হয় না বা কোন ক্ষতি হয় ?
উত্তর: মন্ত্র অশুদ্ধ বলে যজ্ঞ করলে শারীরিকভাবে লাভ হয় ।কিন্তু অশুদ্ধ মন্ত্র শিখে তিনি একটি ভুল পরম্পরা অনুসরণ করেন।

প্রশ্ন. যে ব্যক্তি কোনো আহুতি ছাড়া, মন্ত্র বলা ছাড়া যজ্ঞশালায় বসে থাকেন, তিনিও কি যজ্ঞের সুফল পান?
উত্তর: হ্যাঁ সুফল পায়। তিনিও ঔষধি বায়ু পায়। মন্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা পায়। মন্ত্রগুলিও স্মরণ রাখতে পারেন।

প্রশ্ন. যজ্ঞ করার সময় কোথায় মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, মন্ত্রের অর্থে, অগ্নিতে, ধ্বনিতে বা অন্য কোন স্থানে ?
উত্তর: মন্ত্রের অর্থের প্রতি মন কেন্দ্রীভূত করাই উত্তম।অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে না হয় অগ্নি শিখায় মন কেন্দ্রীভূত করা উচিত।

প্রশ্ন. কোন পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করে নিজের লাভের জন্য কি যজ্ঞ করানো যায়?
উত্তর: হ্যাঁ, ধন প্রদান করে যজ্ঞ করানো যায়।যে ধনে ঘৃত সামগ্রী ইত্যাদির যজ্ঞ হবে তার পূণ্য তো পাবে কিন্তু কর্তাই(পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ)যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে।

প্রশ্ন. যজ্ঞ কি একবার করতে হয় নাকি দুইবার?
উত্তর: সামর্থ্য, সম্পদ,সময়,শ্রদ্ধা এবং ইচ্ছা থাকলে দুইবার(প্রাতঃ ও সন্ধ্যা) অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা উচিত।

প্রশ্ন. পঞ্চমহাযজ্ঞ কাকে বলে?
উত্তর: প্রত্যেক গৃহস্থকে অনিবার্য রূপে করতে হয় এমন পাঁচটি কাজকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে।
যেমন -১) ব্রহ্মযজ্ঞ, ২)দেবযজ্ঞ ,৩)পিতৃযজ্ঞ ,৪)ভূতযজ্ঞ ,৫)অতিথিযজ্ঞ।

প্রশ্ন. ব্যাখ্যাসহ পঞ্চমহাযজ্ঞ বর্ণনা ।
উত্তরঃ
১.ব্রহ্মযজ্ঞ -প্রতিদিন প্রাতঃ এবং সন্ধ্যায় ঈশ্বরের ধ্যান করা এবং বেদের স্বাধ্যায় করা।
২.দেবযজ্ঞ -অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা(হবন করা)
৩.পিতৃযজ্ঞ - মাতা-পিতা,শ্বশুর- শ্বাশুড়ির সেবা শুশ্রূষা করা।
৪.ভূতযজ্ঞ-পশু-পাখি, অনাথ,প্রতিবন্ধী,অসুস্থ প্রভৃতি জীবকে অন্ন বা খাদ্য প্রদান করা।
৫.অতিথিযজ্ঞ- গৃহে আসা সন্ন্যাসী,জ্ঞানী,উপদেশ প্রদানকারী পণ্ডিত প্রভৃতি ব্যক্তির সেবা-যত্ন করা,তাদের উপদেশ গ্রহণ করা।

কর্ম ও কর্মফল বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. মহর্ষি দয়ানন্দজীর মতে, কর্মের সংজ্ঞা কী?
উত্তর: মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের মাধ্যমে জীব যে বিশেষ ক্রিয়া করে তাকে 'কর্ম' বলে।

প্রশ্ন. কর্ম করার কয়টি মাধ্যম আছে এবং সেগুলো কি কি?
উত্তর: কর্ম করার মাধ্যম প্রধানত তিনটি। (১) মন, (২) বাণী(মৌখিক) , (৩) শরীর।

প্রশ্ন. কর্মের ফল কী রকম? কখন ? কোথায় ? কি রূপে সেটা প্রাপ্ত হয়? আমরা কি এই সম্পর্কে জানতে পারি?
উত্তর: কিভাবে, কখন, কোথায়, কী রূপে কর্মের ফল পাওয়া যায়,এই বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেনা।এই কাজটি ঈশ্বরের দ্বারা সঞ্চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। হ্যাঁ, তবে কিছু কিছু বিষয় মানুষ শাস্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারে।

প্রশ্ন. কর্ম করে সে কর্মের ফল এড়ানোর কোন উপায় আছে কি?
উত্তর: যতই তপস্যা করুক, জপ করুক, ধ্যান করুক, দান করুক, যজ্ঞ করুক না কেন কোনো মানুষই তার কর্মের ফল এড়াতে পারে না। তার কর্মের ফল তো তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন. নিজের কর্মের ফল অন্যকে কি দেওয়া যায়? ভোগ করানো যায়? যদি হ্যাঁ হয়,তাহলে কিভাবে? আর যদি না হয়,তাহলে নয় কেন?
উত্তর: কোন ব্যক্তি তার কর্মের ফল অন্য কাউকে দিতে পারে না।তবে হ্যাঁ, নিজের কর্মের ফলাফল ও প্রভাবের কারণে কেউ অন্যের সুখ-দুঃখের কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন. কে কর্মের ফল প্রদান করে? শুধু কি ঈশ্বর দেন নাকি রাজা, বিচারক, সমাজের মানুষও দেন নাকি নিজেও নিতে পারেন?
উত্তর: কর্মের ফল মূখ্যরূপে ঈশ্বর-ই দেন, তবে পরিবার, সমাজ ও জাতির শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মাতা-পিতা,গুরু-আচার্য,পুলিশ-ন্যায়ধীশ-রাজা ও দন্ড দিয়ে থাকে।কিছু কর্মের ফল ব্যক্তি স্বয়ং নিতে পারে। ঈশ্বর এইরকম ব্যবস্থা এবং নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন. কর্মের কর্তা কে? জীব? নাকি মন নাকি ইন্দ্রিয় নাকি শরীর নাকি ঈশ্বর নাকি অন্য কেউ?
উত্তর: জীবাত্মা কর্মের কর্তা।মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি জড় এবং কর্ম সম্পাদনের উপকরণ(সাধন)।

প্রশ্ন. দান, দক্ষিণা, নৈবেদ্য, পূজা, সেবা, জপ, তপ, তীর্থ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা খারাপ কর্মের ফল নষ্ট বা হ্রাস করা যায়? তা না হলে এ সবের প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: দান, দক্ষিণা ইত্যাদি দ্বারা খারাপ কাজের ফল নষ্ট করা যায় না।কিন্তু এগুলো করে পুণ্য অর্জন করা যায়। সংস্কার এমনভাবে তৈরি করা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতে খারাপ কাজ না হয়।

প্রশ্ন. প্রায়শ্চিত্ত করে কি খারাপ কর্মের ফল এড়ানো যায়? যদি না হয়,তবে প্রায়শ্চিত্তের উপযোগিতা কী?

উত্তর: প্রায়শ্চিত্ত করে খারাপ কর্মের ফল এড়ানো যায় না, তবে প্রায়শ্চিত্ত করলে খারাপ কাজ করার মনোভাব গড়ে ওঠে না, যদি এই মনোভাব তৈরি না হয় তবে ভবিষ্যতে খারাপ কাজ করার ইচ্ছা থাকে না।

প্রশ্ন. একজন জীব/মানুষ যে সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করে সেটা তার নিজের কর্মের ফল লাভ করে নাকি অন্যের দ্বারাও তাকে সুখ-দুঃখ দেওয়া যায়?
উত্তর: একজন মানুষ যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে সেটার অধিকাংশই তার নিজের কর্মের ফল, কিন্তু অন্যের কৃত কর্মের পরিণাম ও প্রভাবের কারণে ও সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. কর্মের পরিণাম,কর্মের প্রভাব এবং করমফল এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তর: কর্ম করার পরে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় তাই হলো কর্মের পরিণাম। কোন কর্মের পরিণাম বা ফল জানার পর নিজের বা অন্যের উপর শারীরিক, মানসিক সুখ, দুঃখ, ভয়, চিন্তা ইত্যাদির যে প্রভাব পরে তাকে কর্মের প্রভাব বলে। ভাল-মন্দ কর্মের অনুসারে কর্তাকে ন্যায়পূর্বক যে সুখ-দুঃখ প্রদান করা বা সুখ-দুঃখের উপায় প্রদান করা হয় তাকে কর্মের ফল বলে।।

প্রশ্ন. যারা খারাপ কাজ করে তাদের সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও সুখ বেশি থাকতে দেখা যায় অথচ এমন ব্যক্তিদের সুখ, সুযোগ-সুবিধা ছাড়া অসুখী থাকা প্রয়োজন , কেন এমন হয়?
উত্তর: যারা খারাপ কাজ করে তারা সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায় কিন্তু সুখী হতে পারে না। তাদের সুখী বিবেচনা করা একটি ভ্রান্ত ধারণা ।

প্রশ্ন. যারা ভালো (শুভ) কাজ করে তারা অধিক মাত্রায় বাধা, বিরোধিতা,কষ্ট ইত্যাদির সম্মুখীন হয়, এটা কি শুভ কাজের ফল?
উত্তর: একজন ধার্মিক ব্যক্তি যে দুঃখ কষ্ট প্রাপ্ত হয় করে তা তার সৎকর্মের ফল নয় বরং পরিবার, সমাজ, নগর প্রভৃতির অজ্ঞ, স্বার্থপর, অন্যায়কারী লোকদের দ্বারা সৃষ্ট ফল তার কাছে পৌঁছায়।

প্রশ্ন. নিজের দ্বারা করা, অন্যের দ্বারা করা এবং অন্যের দ্বারা সমর্থিত খারাপ কাজের ফল কি একই বা কম বা বেশি?
উত্তর: সাধারণত নিজের দ্বারা করা ভাল-মন্দ কাজের ফল অধিক হয়। অন্যের কৃতকর্মের ফল মধ্যম মানের। অন্যের দ্বারা করা ভাল বা খারাপ কাজের সমর্থনের ফল তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে,নিজে না করলেও সমর্থিত কর্মের ফল আরও অধিক হতে পারে।

প্রশ্ন. মানসিক, মৌখিক এবং শারীরিক কর্মের ফলাফল কি সমান বা কম ?
উত্তর: সাধারণত, মানসিক ভাল এবং খারাপ কাজের ফল মৌখিক কাজের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম হয়। এবং মৌখিক কর্মের ফলাফল শারীরিক কর্মের তুলনায় কম, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে, মৌখিক কর্ম শারীরিক কর্মের চেয়ে বেশি উপকারী।

প্রশ্ন. ভালো-মন্দ কাজ সমানভাবে করলে কোন ফল না দিয়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর: ভালো আর মন্দ কাজ যদি সমানভাবে করা হয় তাহলে কি কোনো ফল না দিয়ে বিনষ্ট হয় না।বৈদিক কর্মফল পদ্ধতিতে প্লাস-মাইনাস,জমা-খরচের কোন সিদ্ধান্ত বা নীতি নেই। এক টাকা চুরির শাস্তি/দণ্ড এবং লক্ষ টাকা দান করলেও তা বিনষ্ট হয় না।

প্রশ্ন. পাপ কর্মের দুঃখরূপ ফল ভোগকারী ব্যক্তির দুঃখ দূর করার প্রয়াস করা কি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হবে ?

উত্তর: দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দূর করা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ নয় কারণ বেদ,পরমাত্মা ও শাস্ত্র অনুসারে দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

প্রশ্ন. জীবাত্মা যদি তার কাজ করতে স্বাধীন হয়, তবে সে তার কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নির্ভরশীল কেন?

উত্তর: আত্মা নিজেই তার কর্মের ফল ভোগ করতে পারে না।কারণ তার জ্ঞান ও সামর্থ্য খুবই কম।এ ছাড়া জীবাত্মা নিজের খারাপ কাজের ফল পেতে চায় না, তাই ঈশ্বর ফল দেওয়ার ব্যবস্থা তার কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছেন।

প্রশ্ন. কোন ব্যক্তিকে খারাপ কাজ (পাপ) থেকে বিরত না করা কি অধর্ম (পাপ) বলে বিবেচিত হবে?

উত্তর: সামান্যরূপে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বিরত না করাকে অধর্ম বলে মনে করা হয়, কিন্তু যেখানে অধিকার নেই, দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, প্রভাব নেই,উল্টো বিরূপ পরিণতির সম্ভাবনা আছে, সেখানে ব্যক্তিকে বাধা না দেওয়া অধর্ম হবেনা।

প্রশ্ন. পরিবারের পালক/উপার্জন কর্তা হিংসা, মিথ্যা, চুরি, ঘুষ ইত্যাদির মতো অনৈতিক কাজের মাধ্যমে অর্থ ও সম্পদ উপার্জন করেন এবং পরিবারের সবাই তা ভোগ করে,তাহলে সবাই সেই পাপে ভুগবে?

উত্তর: হিংসা প্রভৃতি অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তি-ই কেবল ফল প্রাপ্ত হয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা তার অধীন এবং তার উপর নির্ভরশীল তারা সেই ফল প্রাপ্ত হন না।

প্রশ্ন. আসলেই কি কর্ম নামক কোন স্বতন্ত্র বস্তু বা পদার্থের অস্তিত্ব আছে? নাকি নেই? নাকি এটা শুধুই মাত্রই কল্পনা?

উত্তর: বাস্তবে কর্ম নামক স্বতন্ত্র বস্তু বা পদার্থের অস্তিত্ব আছে। এটি কোনো কল্পনা নয় কারণ এটি কারোও দ্বারা করা একটি ক্রিয়া বিশেষের নাম, যার ন্যায়ানুসারে ফল লাভ হয়।

প্রশ্ন. মানুষ কখন কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়?

উত্তর: কিছু কর্মফল এই জন্মে তৎক্ষণাৎ, কিছু দেরীতে (সপ্তাহ, মাস, বছর পরে), কিছু পরের জন্মে এবং কিছু মুক্তিতে এবং কিছু কর্ম মুক্তি থেকে ফিরে আসার পরেই প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. ভালো (শুভ)কাজ করে লাভ কি? / কেন ভাল কাজ করা উচিত?

উত্তর: ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। যাতে একজন ব্যক্তির সুখ প্রাপ্ত হয়।ভালো মূল্যবোধ তৈরি হয় যার কারণে ব্যক্তি ধর্মের পথে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভালো কাজ করে ঈশ্বরকেও লাভ করা যায়।

প্রশ্ন. খারাপ (অশুভ) কাজ করলে কি ক্ষতি হয়? / কেন অশুভ কাজ করা উচিত নয়?

উত্তর: খারাপ কাজ ফল খারাপ হয়। যাতে ব্যক্তি দুঃখ প্রাপ্ত হয়। খারাপ মূল্যবোধ তৈরি হয় যার কারণে ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে অধর্মের পথে চলতে থাকে। ফলে ব্যক্তি ভয়ংকর নীচু যোনিতে চলে যায় এবং মহাদুঃখের সাগরে ডুবে যায়।

প্রশ্ন. নিষ্কাম কর্ম এবং অকর্মণ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তর: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল নিঃস্বার্থ কর্মই সর্বোত্তম কর্ম যা করলে ব্যক্তি যোগী,ঋষি-মহর্ষি হয়ে অবশেষে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ,সেখানে অকর্মণ্যতা হল সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। অকর্মণ্যতার কারণে একজন ব্যক্তি অলস ও উদাসীন হয়ে পড়ে, ফলে সে দুঃখ ছাড়া কিছুই পায় না।

প্রশ্ন. মানুষ শরীর দিয়ে কয়টি এবং কোন কোন শুভ (সৎ) কাজ করে?
উত্তর: মূখ্য রুপে মানুষ শরীর দিয়ে তিন প্রকারের শুভ কাজ করে। (১) রক্ষা করা, (২)দান করা (৩) সেবা করা।

প্রশ্ন. বাণীতে(মৌখিক) করা শুভ(সৎ)কাজ কয়টি ও কি কি?
উত্তর: মৌখিকভাবে শাস্ত্রে চার প্রকার কাজের কথা বলা হয়েছে। (১) সত্য কথা বলা, (২) মধুর(মিষ্টি) কথা বলা, (৩) উপকারী কথা বলা, (৪) স্ব-অধ্যয়ন(স্বাধ্যায়) করা।

প্রশ্ন. মন থেকে যে ভালো কাজ করা হয় সেগুলো কয়টি এবং কি কি?
উত্তর: মন থেকে তিন ধরনের ভালো কাজ করা হয়। (১) দয়া, (২) অস্পৃহা, (৩) আস্তিকতা।

প্রশ্ন. মানুষ শরীর দিয়ে খারাপ কাজও করে থাকে। সেগুলো কয়টি এবং কি কি?
উত্তর: মানুষ তার শরীর দিয়ে প্রধানত তিন ধরনের খারাপ কাজ করে। যেমন (১) হিংসা করা, (২) চুরি করা, (৩)ব্যভিচার করা।

প্রশ্ন. ব্যক্তি মৌখিক ভাবে যে অশুভ কর্ম করে ধর্মগ্রন্থে তাদের সংখ্যা কত বলা হয়েছে এবং সেগুলো কি কি?
উত্তর: ব্যক্তি মৌখিক ভাবে যে অশুভ কর্ম করে শাস্ত্রানুসারে সেগুলোর সংখ্যা চারটি- (১) অসত্য (মিথ্যা) কথা বলা, (২) কঠোরভাবে কথা বলা, (৩) ক্ষতিকারক কথা বলা, (৪) অনর্থক কথা বলা (অসংগত = প্রসঙ্গের বাইরে কথা বলা।)

প্রশ্ন. কিরূপে কর্মের চূড়ান্ত ফল পাওয়া যায় ?
উত্তর: কর্মের চূড়ান্ত ফল সুখ-দুঃখের আকারে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন. মানব জন্ম লাভের জন্য ন্যূনতম কতটুকু এবং কিভাবে কর্ম করা আবশ্যক?
উত্তর: ন্যূনতম ৫০% পুণ্য এবং ৫০% পাপ কর্ম করলেই একজন ব্যক্তি সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।পুণ্য কর্মের পরিমাণ যদি পঞ্চাশ শতাংশের একটুও কম হয়, তবে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারবে না। অর্থাৎ মানব জন্মের জন্য পাপ ও পুণ্য সমান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন. জ্ঞানপূর্বক কে একশত শতাংশ (১০০%) নিষ্কাম কর্ম করে?
উত্তর: শুধুমাত্রএকজন পূর্ণ যোগী,পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের পূর্ণ ভক্ত,পূর্ণ বীতরাগ এবং একজন তপস্বী যিনি চরম তপস্যা করেন তিনিই জ্ঞানের সাথে একশত শতাংশ নিষ্কাম কর্ম করেন।

প্রশ্ন. শতভাগ নিষ্কাম কর্মকারী ব্যক্তি কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়?
উত্তর: জীবিত অবস্থায় বিশুদ্ধ রূপে ঈশ্বরের সান্নিধ্য মিলে ।এবং শরীর ত্যাগ করার পর মোক্ষ লাভ করে একত্রিশ নীল,দশ খরব,চল্লিশ অরব(৩১,১০,৪০,০০০০০০০০)বর্ষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সাহায্যে ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করতে থাকে।

প্রশ্ন. মনুষ্য জন্ম পেয়েও কেন জীবাত্মা পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ,সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদির শরীরে প্রবেশ করে কেন?
উত্তর: মনুষ্য জন্ম পেয়েও ৫০% এর বেশি পাপ করলে,সেই কর্মের ফল ভোগ করতে জীবাত্মা পশু,পাখি,কীটপতঙ্গ,সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদির দেহে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন. যখন ব্যক্তি পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) এর বেশি পাপ করে, তখন সে পশু ইত্যাদির মতো নিম্ন শরীরে প্রবেশ করে।পুনরায় কখন সে মনুষ্য শরীর পায়?
উত্তর: যখন অধিক পাপের ফল পশু প্রভৃতির দেহে ভোগ করে, তখন পাপ ও পুণ্য সমান হয়ে গেলে আবার মনুষ্য শরীর লাভ করে।

প্রশ্ন. এক মুহূর্তও কি কোন কর্ম না করে থাকা যেতে পারে?
উত্তর: না, এক মুহূর্তও কোন কর্ম না করে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন. জীবনে কি কর্ম করা কখনো সমাপ্ত হতে পারে?
উত্তর: না, একজন মানুষকে সারাজীবন কর্ম করতে হয়।

প্রশ্ন. সকাম কর্ম কাকে বলে?
উত্তর: সকল শুভ, অশুভ ও মিশ্র কর্মকে বলা হয় সকাম কর্ম।যার মধ্যে সামাজিক ফল লাভের বাসনা থাকে।

প্রশ্ন. ফলের দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফল কত প্রকার? এবং সেগুলো কি কি?
উত্তর: ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফল তিন প্রকার- (১) সঞ্চিত কর্ম
(২)প্রারব্ধ কর্ম ও
(৩)ক্রিয়ামান কর্ম।

প্রশ্ন. কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ম কত প্রকার এবং কি কি?
উত্তর: কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফল তিন প্রকার। (১) কৃত কর্ম, (২) করিত কর্ম সম্পন্ন, (৩)অনুমোদিত কর্ম।

প্রশ্ন. কৃত কর্ম কাকে বলে?
উত্তর: এমন কর্ম যেখানে কর্তা স্বয়ং কাজ সম্পন্ন করে,তাকে কৃত কর্ম বলে।

প্রশ্ন. করিত কর্ম কাকে বলে?
উত্তর: যে কাজ নিজে না করে অন্যকে আদেশ দিয়ে করানো হয় তাকে করিতকর্ম বলে।

প্রশ্ন. অনুমোদিত কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল কর্ম ব্যক্তি নিজে কাউকে করতে অনুপ্রাণিত বা আদেশ দেয় না কিন্তু কারো দ্বারা কৃত কর্মকে অনুমোদন বা সমর্থন করে তাকে 'অনুমোদিত' কর্ম বলে।

প্রশ্ন. কোন ইচ্ছা ছাড়া = কামনা (জাগতিক বা মোক্ষ)কর্ম করা কি সম্ভব?
উত্তর: না। জাগতিক বা মোক্ষ এই দুইটির মধ্যে একটির আকাঙ্খা অবশ্যই থাকবে। কেননা কামনা ছাড়া কর্ম করা অসম্ভব।

প্রশ্ন. জগতে যে সব কর্ম রয়েছে,যে সব কর্ম হয়ে গেছে এবং যে সব কর্ম ভবিষ্যতে হবে, সে সব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসার,ঈশ্বরের লীলা অর্থাৎ ঈশ্বর করছেন,জীব নয়।এই বিশ্বাস কি সঠিক?
উত্তর: না, যত খারাপ কাজ আছে,সে সব ব্যক্তি(জীব) তার নিজের ইচ্ছায় কুসংস্কারের কারণে করে থাকে। যেসব ভালো কাজ আছে সে সবে ঈশ্বর সাহায্য করেন। অর্থাৎ জীব যখন ভালো কাজ করতে চায় ঈশ্বর তখন তাকে প্রেরণা এবং উৎসাহ প্রদান করে।

প্রশ্ন. পিতামাতার সেবা না করা কি সন্তানের জন্য অপরাধ?
উত্তর: যে সন্তানরা গৃহস্থে থেকে পিতামাতার সেবা করে না, এটা তাদের অপরাধ ও পাপ।

প্রশ্ন. যে পিতা-মাতার একটি মাত্র সন্তান থাকে এবং সামনে পিছনে কেউ নেই এবং সেই সন্তান যদি বৈরাগ্যের কারণে গৃহত্যাগ করে, তবে তা কি অপরাধ বলে গণ্য হবে?
উত্তর: না।যদি বৈরাগ্যের কারণে গৃহত্যাগ করেন এবং প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করে নিজের জীবনকে মহান, উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ করে তুলছেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ করছেন তাহলে সেটা অপরাধ হবে না।প্রকৃতপক্ষে সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করছে।

প্রশ্ন. পনের বছর বয়স পর্যন্ত যে শিশু পিতা-মাতা, শিক্ষক ইত্যাদির সঠিক পরামর্শকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের পরামর্শের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার শাস্তি হওয়া উচিত নাকি উচিত নয়?
উত্তর: শাস্তি তো অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটি একটি বৈদিক নিয়ম যে সন্তানের উন্নতির জন্য ঈর্ষান্বিত না হয়ে কথাবার্তা এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োজন অনুসারে শারীরিক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন. কারো ভালো বা মন্দ কাজের তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায় না দেখে ভবিষ্যতেও সেসব কাজের ফল হবে না এমন ভাবনা কি সঠিক?
উত্তর: এমন চিন্তা করা সম্পূর্ণ অনুচিত কারণ কর্মের ফল থেকে কেউ বাঁচতে পারেনা।কর্মফল প্রদানকারী ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়বিচারক । অতএব, যোগ্য সময় অনুযায়ী সবাই কর্মের ফল পায়।

প্রশ্ন. বর্তমানে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুকে জন্মের আগেই গর্ভে হত্যা করা হচ্ছে। তাহলে এটা কি গর্ভে থাকা জীবের কর্মের ফল নাকি পিতামাতার?
উত্তর: পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী ভ্রূণের গর্ভধারণ হয় এবং গর্ভপাতও তাদের নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী হয়, তাই গর্ভপাতের মতো ভয়ংকর পাপের অপরাধী গর্ভপাত যে করে,যে করায় এবং যে এতে সহমত পোষণ করে তারা সবাই।এতে গর্ভে থাকা শিশুর কোনো কর্মফল নেই।গর্ভপাত করানোর কোনো ঐশ্বরিক বিধান নেই।বরং গর্ভপাত নিষিদ্ধ আছে।

প্রশ্ন. জ্ঞান ছাড়া কোনো কর্ম হয়?
উত্তর: সাধারণত জ্ঞান ছাড়া কোন কাজ হয় না কারণ মানুষ যে কাজই করুক না কেন সে তা স্বেচ্ছায় করে। আর সেই আকাঙ্ক্ষা হল সুখ লাভ ও দুঃখমুক্ত হওয়ার স্বরূপ। তাই অধিকাংশ কর্মই কেবল জ্ঞান দিয়েই করা হয়।

প্রশ্ন. ভ্রান্তি,অসহায়ত্ব,বাধ্যবাধকতা বা জ্ঞানের অভাব থেকে কৃত কর্মেরও কি ফল হয়?
উত্তর: হ্যাঁ। ভ্রান্তি,অসহায়ত্ব,বাধ্যবাধকতা বা জ্ঞানের অভাব থেকে কৃত কর্মের ফল ঈশ্বরের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। সেটা ভালো হোক কিংবা মন্দ। কারণ সেসব কাজ অন্যের জন্য সুখ ও দুঃখ নিয়ে আসে।

প্রশ্ন. বয়স কি জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয় নাকি বাড়ানো বা কমানো যায়?
উত্তর: একজন মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে তার বয়স বাড়াতে বা কমাতে পারে, যা সে পূর্বজন্মে তার কর্মের ফলস্বরূপ পায়। বেদ অনুযায়ী আচরন করলে বাড়বে, এর বিপরীত আচরন করলে কমবে।

প্রশ্ন. মানুষের কি পরবর্তী জন্ম হয়? / একজন মানুষ কি মৃত্যুর পর আবার জন্ম নেয়?
উত্তর: হ্যাঁ। মানুষ মৃত্যুর পর আবার জন্ম গ্রহণ করে।

প্রশ্ন. মৃত্যুর পর মানুষ কেন আবার জন্ম গ্রহণ করে ?
উত্তর: একজন মানুষ এই জন্মে তার সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করতে পারে না। কিছু কাজ আছে যার ফল ভোগ করার জন্য মানুষকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন. মানুষের মৃত্যুর পর কি আবার মানুষ হয় নাকি পশু পাখি ইত্যাদি হয়?
উত্তর: মৃত্যুর পর মানুষ যে মানুষই থাকবে তা জরুরী নয়। কর্মের ভিত্তিতে মানুষ পশু, পাখি ইত্যাদি হতে পারে।

প্রশ্ন. মানুষের আত্মা কি পরবর্তী জন্মের জন্য কি স্বয়ং মাতৃগর্ভে চলে আসে নাকি কেউ নিয়ে আসে?
উত্তর: পরের জন্ম লাভের জন্য মানুষের আত্মা মাতৃগর্ভে স্বয়ং আসতে পারেনা। বরং তার পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর মাতৃগর্ভে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন. দুঃখ কাকে বলে?
উত্তর: বাধা, যন্ত্রণা, কষ্ট, পরাধীনতা ইত্যাদি যা থেকে মানুষ বাঁচতে চায় তাকে দুঃখ বলে।

প্রশ্ন. সুখ কাকে বলে?
উত্তর: স্বাধীনতা, নির্ভীকতা, সুখ ইত্যাদি যা অর্জন করার পর মানুষ ত্যাগ করতে চায় না, তাকে সুখ বলে।

প্রশ্ন. কিভাবে মানুষ সুখী হয়?
উত্তর: মানুষ বিদ্যা,বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করে, সৎকর্ম করে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করে সুখী হয়।

প্রশ্ন. যারা মাংস বা ডিম আহার করে তাদের কি পাপ হয়?

উত্তর: হ্যাঁ, মাংস হোক বা ডিম, যে উভয়ই খাবে তারই পাপ হবে। কারণ এটি জীবের প্রতি সহিংসতা সৃষ্টি করে। শাস্ত্রেও এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন. একজন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাজে সফলতা অর্জনের জন্য কি করা উচিত?
উত্তর: যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাজে সফলতা অর্জনের জন্য ছয়টি জিনিসের প্রয়োজন, ব্যক্তি কে সেগুলো সংগ্রহ এবং ব্যবহার করতে হবে। সেই ছয়টি বিষয় হলো - (১) সংস্কার, (২) তীব্র ইচ্ছা, (৩) পর্যাপ্ত সাধনার উপলব্ধি , (৪) সাধনা প্রয়োগ করার সঠিক পদ্ধতি, (৫) পরম পুরুষার্থ, (৬) কঠোর তপস্যা।

প্রশ্ন. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম কর্ম কোনটি এবং এর ফল কী হয়?
উত্তর: কোন পার্থিব পুরস্কার বা সুখ কামনা না করে অন্যের ভালো করা অর্থাৎ নিঃষ্কাম কর্মই শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম কাজ। এবং এর ফল হল জীবিত অবস্থায় বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক সুখ উপভোগ করা এবং মৃত্যুর পর ৩৬ হাজার বার সৃষ্টির শুরু এবং ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত পুনর্জন্ম না হওয়া, কেবল আনন্দই উপভোগ করা, দুঃখের লেশমাত্র স্পর্শ না করা। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ উপাসনাও এই মোক্ষ ফলের কারণ।

যোগ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. মানব জীবনের মূল লক্ষ্য কি?
উত্তর: সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করাই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য ।

প্রশ্ন. কিভাবে মূখ্য লক্ষ্য অর্জন হয়?
উত্তর: যোগের পালন করলে মানব জীবনের মূখ্য লক্ষ্য অর্জিত হয়।

প্রশ্ন. যোগ কাকে বলে?
উত্তর: মন থেকে জাগতিক চিন্তা এবং অনাবশ্যক চিন্তা দূর করে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ, আত্মা অথবা ঈশ্বরের অনুভব করাকে যোগ বলে।

প্রশ্ন. যোগাভ্যাসে সফলতার জন্য কী করা প্রয়োজন?
উত্তর: যোগাভ্যাসে সফলতার জন্য যোগের বিভিন্ন অঙ্গ গুলো নিয়মিত শ্রদ্ধা সহকারে পালন করতে হবে।

প্রশ্ন. যোগের কয়টি অঙ্গ এবং সেগুলো কি কি?
উত্তর: যোগের আটটি অঙ্গ হল- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,ধরন, ধ্যান ও সমাধি।

প্রশ্ন. যম কাকে বলে?
উত্তর: অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ নামক পাঁচটি কর্তব্য পালন করাকে যম বলে।

প্রশ্ন. নিয়ম কাকে বলে?
উত্তর: শৌচ,সন্তোষ,তপস্যা,স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি কর্তব্য পালন করাকে নিয়ম বলা হয়।

প্রশ্ন. অহিংসা কাকে বলে?
উত্তর: শরীর,বাক্য এবং মন থেকে সব সময় সমস্ত প্রাণীর সাথে শত্রুতা(দ্বেষ) ত্যাগ করে প্রেমপূর্বক আচরণ করাকে 'অহিংসা' বলে।

প্রশ্ন. অহিংসা অনুসরণ করলে কি লাভ হয়?
উত্তর: অহিংসা ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির মন থেকে সমস্ত জীবের প্রতি শত্রুতা ভাব(বিদ্বেষ) দূর হয়ে যায় এবং সেই অহিংস ব্যক্তির সৎসঙ্গ ও উপদেশ অনুসারে আচরণ করলে অন্য ব্যক্তির থেকেও আপনা-আপনি যোগ্যতা অনুসার বিদ্বেষ ভাব দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন. সত্য কাকে বলে?
উত্তর: যা কিছু দেখা, শোনা, পড়া বা মনের দ্বারা অনুমান করা যায়, সকলের কল্যাণার্থে সেই কথা বলা এবং শরীরের মাধ্যমে তা আচরণ করাকে 'সত্য' বলে।

প্রশ্ন. সত্য অনুসরণ করে লাভ কি হয়?
উত্তর: সত্যের অনুসরণকারী যে যে উত্তম কার্য গুলো করতে চায়,সে সব কার্য সফল হয়।

প্রশ্ন. সমাজে যে নিয়মটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সেটাকে কি সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত?
উত্তর: সত্যের আধার হলো প্রমাণ, বুদ্ধিমত্তা, বেদ ও যাতে সকলের উন্নতি হয় এবং সুখ বৃদ্ধি পায়। সমাজে মিথ্যাচার ও মাংস ভক্ষণকারীর ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিন্তু মিথ্যাচার করা, মাংস ভক্ষণ করাকে সত্য বলে মানা যাবেনা।

প্রশ্ন. কারো প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে কি মিথ্যা বলা উচিত ?
উত্তর: কারো প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা অনুচিত। সর্বদা সত্যের আশ্রয় নিয়েই কারো প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

প্রশ্ন. আস্তেয় কাকে বলে?
উত্তর: মন, কথা, শরীর দিয়ে চুরি না করা এবং উত্তম কার্যে শরীর, মন ও ধন দিয়ে সহায়তা করাকে আস্তেয় বলে।

প্রশ্ন. আস্তেয় অনুসরণ করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: যে ব্যক্তি মন, কথা ও শরীর দ্বারা চুরি ত্যাগ করে সে অন্য ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এইরকম ব্যক্তি আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক ভাবে উত্তম গুণ এবং উত্তম বস্তু অর্জন করতে পারেন।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচর্য কাকে বলে?
উত্তর: মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর সংযম করে বীর্য প্রভৃতি দৈহিক শক্তিকে রক্ষা করে, বেদাদি সত্য শাস্ত্র পড়া এবং ঈশ্বরের উপাসনা করাকে 'ব্রহ্মচর্য' বলে।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচর্য পালন করলে কি কি উপকার হয়?
উত্তর: ব্রহ্মচর্য পালন করলে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অর্জন করা যায়।

প্রশ্ন. অপরিগ্রহ কাকে বলে?
উত্তর: ক্ষতিকারক ও অনাবশ্যক বস্তু এবং ক্ষতিকর ও অনাবশ্যক চিন্তা সংগ্রহ না করাকে অপরিগ্রহ বলে।

প্রশ্ন. অপরিগ্রহ অনুসরণ করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: অপরিগ্রহ অনুসরণ কারী ব্যক্তির মধ্যে আত্মার স্বরূপ জানার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, আমার কী করা উচিত, আমার সামর্থ্য কী ইত্যাদি প্রশ্ন তার মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন. শৌচ কাকে বলে?
উত্তর: বাহ্যিক ও আন্তরিক শুদ্ধি বজায় রাখাকে শৌচ বলে।শরীর, বস্ত্র,পাত্র,স্থান, খাদ্য এবং ধন উপার্জনকে পবিত্র রাখাই হল বাহ্যিক শুদ্ধি। আর বিদ্যা, সৎসঙ্গ,স্বাধ্যায়, সত্য কথা বলা ও ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করাই হলো আন্তরিক শুদ্ধি।

প্রশ্ন. শৌচ অনুসরণ করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: শৌচ অনুসরণ করলে শরীরের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, মন একাগ্র ও প্রসন্ন থাকে, ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং আত্মা ও পরমাত্মাকে জানার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. সন্তোষ কাকে বলে?
উত্তর: নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান,শক্তি ও সাধনায় পূর্ণ পুরুষার্থ করার পর যত আনন্দ,বিদ্যা,শক্তি, সম্পদ ইত্যাদিকে ফল রূপে প্রাপ্ত করে সেগুলোতে সন্তুষ্ট থাকা এবং এর অধিক পাওয়ার আকাঙ্খা না করাকে সন্তোষ বলে।

প্রশ্ন. সন্তোষ অনুসরণ করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: সন্তোষ অনুসরণ করলে ব্যক্তি মানসিক শান্তিরূপে বিশেষ সুখের অনুভব করেন।

প্রশ্ন. তপস্যা কাকে বলে?
উত্তর: ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-তাপ, ক্ষতি -লাভ,মান-অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্বকে প্রসন্নতা পূর্বক সহ্য করে উত্তম ধর্মীয় আচার-আচরণ ও কর্তব্য কর্ম পালন করাকে তপস্যা বলে।

প্রশ্ন. তপস্যা করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: তপস্যা করলে শরীর সুস্থ,বলবান,উদ্যমী হয় এবং ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন. স্বাধ্যায় কাকে বলে?
উত্তর: মোক্ষলাভের দিকে ধাবিত কারী বেদের মতো প্রকৃত গ্রন্থসহ বেদোক্ত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা, যে মন্ত্রগুলি ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করে সেগুলো অর্থ সহকারে পাঠ এবং 'অউম্' এর জপ করাই হলো স্বাধ্যায়।

প্রশ্ন. স্বাধ্যায় করলে কি লাভ হয়?

উত্তর: স্বাধ্যায় করলে ঈশ্বর, বৈদিক পণ্ডিত,যোগী ও ধার্মিক মহাপুরুষ এইসবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উত্তম কার্যে সহায়তা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর-প্রণিধান কাকে বলে?
উত্তর: লৌকিক উদ্দেশ্যে ধন,মান,যশ ইত্যাদি অর্জন না করে শরীর, বুদ্ধি, শক্তি,বিদ্যা,ধন-সম্পদ এই সমস্ত সম্পদ ঈশ্বর প্রদত্ত মেনে নিয়ে মন,বাণী ও শরীর দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য এইগুলোকে ব্যবহার করাকে 'ঈশ্বর প্রনিধান' বলে। ঈশ্বর আমাকে দেখছেন,শুনছেন,জানছেন এই ভাবনাও মনে রাখাই হল 'ঈশ্বর প্রনিধান'।

প্রশ্ন. ঈশ্বর-প্রণিধান অনুসরণ করে কি লাভ হয়?
উত্তর: ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে দ্রুত সমাধি প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. আসন কাকে বলে?
উত্তর: ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য যে অবস্থানে সুখপূর্বক স্থিরভাবে বসে যায়,সেই অবস্থান কে 'আসন' বলে। যেমন-পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি।

প্রশ্ন. আসনের উপকারিতা কি?
উত্তর: আসনের ভালভাবে অনুশীলন করার পরে,যোগাভ্যাসীর উপাসনা ও অনুশীলনের সময় ঠান্ডা-গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির দ্বন্দ্বে কম বিরক্তবোধ করেন এবং যোগাভ্যাসের পরবর্তী কাজগুলি সহজতর হয়।

প্রশ্ন. চক্রাসন, ধনুরাসন,শীর্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন ইত্যাদি কি যোগাসন? যদি না হয় তাহলে কেন নয়?
উত্তর: না, আসনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমে যে আসনগুলো শরীরকে সুস্থ,সবল বানানোর জন্য ব্যায়াম হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধরন, ধ্যান এবং সমাধির সিদ্ধ করার জন্য যেগুলি প্রয়োগ করা হয়। চক্রাসন, ধনুরাসন ইত্যাদি আসন গুলো এই দুইটির কোনোটিই নয় তাই এই আসন গুলোকে যোগাসন বলা উচিত নয়।

প্রশ্ন. প্রাণায়াম কাকে বলে?
উত্তর: একটি আসনে স্থিরতাপূর্বক বসার পর মনের চঞ্চলতাকে থামানোর জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রশ্ন. প্রাণায়াম কয় প্রকার? কি কি? ।
উত্তর: মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ৪প্রকার প্রাণায়াম এর কথা বলেছেন (১) বাহ্যিক প্রাণায়াম (২) অভ্যন্তরীণ প্রাণায়াম (৩) স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম (৪) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয় আক্ষেপী প্রণায়াম।

প্রশ্ন. প্রাণায়াম করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: প্রাণায়াম করলে ব্যক্তির অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। স্মৃতিশক্তি ও মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়ে সুস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন. প্রত্যাহার কাকে বলে?

উত্তর: মন যখন থেমে যায় চোখের মতো ইন্দ্রিয়গুলোর যখন আর নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত হয়ে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়,তখন সেই অবস্থানের নাম হলো 'প্রত্যাহার'।

প্রশ্ন. প্রত্যাহারে কি উপকার হয়?
উত্তর: প্রত্যহারের সিদ্ধি মাধ্যমে একজন যোগ সাধক তার ইন্দ্রিয়ের উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন অর্থাৎ তিনি যেখানে এবং যে বিষয়ে চান তার মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন এবং যে বিষয়কে মন থেকে সরাতে চান,সরিয়ে নিতে পারেন।

প্রশ্ন. ধারণা কাকে বলে?
উত্তর: ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য চোখ বন্ধ করে মনকে মস্তক,ভ্রুমধ্য, নাসিকা,কণ্ঠ, হৃদয়,নাভি ইত্যাদিতে কোন এক স্থানে স্থির করা বা থামানোকে ‘ধারণা’ বলে।

প্রশ্ন. ধারণা অনুসরণ করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: মনকে এক জায়গায় স্থির করার অভ্যাস থেকে ঈশ্বর বিষয়ক গুণ- কর্ম-স্বভাব নিয়ে চিন্তায় করার ক্ষেত্রে(ধ্যানে)দৃঢ়তা আসে অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক ধ্যান দ্রুত ভেঙ্গে যায় না। যদি ভেঙ্গে যায় তো দ্বিতীয় বার সহজেই করা যায়।

প্রশ্ন. সমাধি কাকে বলে?
উত্তর: ধ্যান করার সময় যখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ সাধক যখন ঈশ্বরের আনন্দে নিমগ্ন হয়,তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

প্রশ্ন. সমাধির ফল কী হয়?
উত্তর: সমাধির ফল হল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। সমাধি অবস্থায় সাধক সমস্ত ভয়, চিন্তা,বন্ধন ইত্যাদি দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আনন্দ অনুভব করে এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে সমাধির সময় জ্ঞান,বল, উৎসাহ,নির্ভয়তা,স্বতন্ত্রতা ইত্যাদি প্রাপ্ত করে।এইভাবে বারবার সমাধি চর্চা করলে নিজের মনের মধ্যে বিদ্যমান রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি অজ্ঞানতা কুসংস্কারের দগ্ধবীজভাব অবস্থায় পৌঁছে(নষ্ট করে) মুক্তি পদ (মোক্ষ)লাভ করে।

প্রশ্ন. যোগাভ্যাস করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: (১) মেধা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (২) তীব্র স্মৃতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। (৩) একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। (৪) মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। (৫) কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ,অহংকার প্রভৃতি কুসংস্কার নষ্ট হয়ে সুসংস্কারের উদয় হয়। (৬)শান্তি,প্রসন্নতা,সন্তুষ্টি এবং নির্ভীকতা অর্জিত হয়। (৭) মোক্ষ লাভ হয়।

প্রশ্ন. যোগাভ্যাস না করলে কি কি ক্ষতি হয়?
উত্তর: (১)নিজের আচরণে অন্যদের কষ্ট দেয়। (২) মন ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়। (৩)বেদ ও ঋষিদের সূক্ষ্ম বাণী (বিষয়) বুঝতে অসমর্থ হয়। (৪) রোগ, বিচ্ছেদ, অপমান, অন্যায়,ক্ষতি,বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট দুঃখকে সহ্য করতে পারে না। (৫) কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত কুসংস্কারকে বিনষ্ট করতে পারেনা এবং সুসংস্কারকে বৃদ্ধি করতে পারেনা(৬) সঠিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

প্রশ্ন. যোগবিদ্যার প্রধান গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: যোগবিদ্যার প্রধান গ্রন্থ মহর্ষি পতঞ্জলির রচিত 'যোগদর্শন'।

প্রশ্ন. দুঃখের মূল কারণ কি?
উত্তর: দুঃখের মূল কারণ শরীরের সাথে জীবাত্মার সংযোগ।

প্রশ্ন. শরীরের সাথে জীবাত্মার এই সংযোগের কারণ কি?
উত্তর: এই সংযোগের কারণ হল অজ্ঞতা।

প্রশ্ন. যোগাভ্যাসী ব্যক্তির অন্যদের প্রসন্ন রাখতে কি রকম ব্যবহার করা উচিত?
উত্তর: সুখসাধন সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ,দুঃখী ব্যক্তিদের প্রতি দয়া, পূণ্যবান অর্থাৎ ধার্মিক, বিদ্বান ও পরোপকারী ব্যক্তিদের প্রতি আনন্দের সাথে এবং পাপীদের প্রতি উপেক্ষার (না রাগ,না দ্বেষ) ব্যবহার করা উচিত।

প্রশ্ন. কোন কোন সমাধি যোগের অন্তর্গত?
উত্তর: দুই প্রকার সমাধি যোগের অন্তর্গত (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং (২)অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

প্রশ্ন. সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কাকে বলে?
উত্তর: যে সমাধিতে (১) স্থূল ভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (২) সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ রূপ,রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ নামক তন্মাত্রা(৩) মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার ও মহত্ত্ব (৪)জীবাত্মা ও তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করাকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

প্রশ্ন. অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কাকে বলে?
উত্তর: যে সমাধিতে ঈশ্বরের উপলব্ধি করা হয় তাকে অসমপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

প্রশ্ন. একজন যোগী কি ঘি, মাখন, বাদাম,হালুয়া, ক্ষীর, রসমালাই ইত্যাদি সেবন করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, যোগী জীবন বাঁচাতে এই খাদ্যগুলি গ্রহণ করেন। শরীরকে বলবান ও পুষ্ট করে তোলা এবং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করার জন্য এগুলো গ্রহণ করে। এইসব খাদ্যের সাথে যোগী আসক্ত থাকেনা।

প্রশ্ন. একজন পূর্ণ যোগী কি পরমাত্মার তুল্য হয়ে যেতে পারেন?
উত্তর: না, কারণ জীবাত্মার স্বভাবগতভাবে একক হওয়া,স্বল্প জ্ঞানী,স্বল্প শক্তিমান ইত্যাদি গুণ রয়েছে। যোগী হওয়ার পরেও এই গুণগুলো তাঁর মধ্যে থেকেই যায় কারণ প্রাকৃতিক গুণাবলী কখনও হারিয়ে যায়না।

প্রশ্ন. যুক্তিতর্ক কি যোগব্যায়ামে বাঁধা?
উত্তর: না,যুক্তিতর্ক যোগব্যায়ামে বাধা নয় বরং উপকারী। কিন্তু যুক্তিহীন তর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন. স্ত্রীরা কি যোগিনী হতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ,যোগী হওয়ার ক্ষমতা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের আছে।

প্রশ্ন. সমস্ত জীব কি সম্পূর্ণ অহিংস যোগীর প্রতি হিংসা-দ্বেষ ভাব ত্যাগ করে?

উত্তর: না,যারা সেই যোগীর উপদেশ ও আচরণ বোঝেন তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে হিংসা-দ্বেষভাব ত্যাগ করে।

প্রশ্ন. একজন সত্যিকারের যোগী কি একজন অজ্ঞানী ও অধার্মিকের মাথায় হাত রেখে বা কোন শক্তি প্রয়োগ করে তার সমাধি লাভ করাতে পারে?
উত্তর: না, সমাধির জন্য যোগের আটটি অঙ্গ পালন করতে হয়। নিজের মনকে রাগ-দ্বেষ মুক্ত করতে হয়।

প্রশ্ন. ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিন পৃথক চিরন্তন উপাদানকে না মেনে কেউ কি যোগী হতে পারে?
উত্তর: না, বেদ পরমপিতা পরমাত্মা কর্তৃক মানুষকে দেওয়া জ্ঞান। বেদাদি সত্য শাস্ত্রে সর্বত্র এটা বর্ণিত আছে যে এই পৃথিবীতে তিনটি জিনিস চিরন্তন,নিত্য এবং পৃথক পৃথক অতএব যে ব্যক্তি এগুলো বিরুদ্ধ মানে, সে কখনই যোগী হতে পারে না।

প্রশ্ন. কোনো যোগী কি কোনো বস্তুগত কারণ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে ফল, ফুল, মিষ্টি, সোনা, রূপা, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি ইচ্ছাকৃত বস্তু তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: না. একজন যোগী বস্তুগত কারণ ছাড়া এই ধরনের বস্তু তৈরি করতে পারেন না।

প্রশ্ন. একজন যোগী কি অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং নিজের শরীরে ফিরে এসে পুনরায় জীবিত হতে পারেন?
উত্তর: না। অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করে পুনরায় ফিরে আসা অসম্ভব।

প্রশ্ন. একজন যোগী কি অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন?
উত্তর: না, যোগী অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারে না।

প্রশ্ন. যোগের নামে প্রচলিত সব সিদ্ধি/কৃতিত্ব কি সত্যি? আর সে সব প্রাপ্ত করা মোক্ষলাভের জন্য কি আবশ্যক?
উত্তর: যোগের নামে প্রচলিত সব সিদ্ধি/কৃতিত্ব সত্য নয়,বরং অনেকগুলি অসম্ভব, কারণ এই এইসব কৃতিত্ব অর্জনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়াও যুক্তিতর্ক দ্বারা এগুলো খণ্ডন করা যায়।যেমন জীবাত্মার ঈশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ হওয়া,না খেয়ে বছরের পর বছর বেঁচে থাকা, নতুন শরীর গঠন করা, হাত-পা কেটে ফেলার পরও ব্যথা না হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন. আজকাল লোকেরা প্রায়শই আসন-ব্যায়ামকে যোগ বলে, যেমন ধনুরাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদি করা বা ভ্রমরী,ভাস্ত্রিকা ইত্যাদি প্রাণায়াম করাকে যোগ বলা হয়, এটি কি উচিত, যদি না হয় তবে কেন?
উত্তর: ধনুরাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতি আসন বা ভ্রমরী, ভাস্ত্রিকা প্রভৃতি প্রাণায়ামকে যোগ বলা উচিত নয় কারণ মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের কোথাও ধনুরাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতিকে যোগ আসন বলেননি। এবং ভ্রমরী, ভাস্ত্রিক প্রাণায়ামও কোথাও উল্লেখ করেননি।

প্রশ্ন. যদি ধনুরাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদিকে যোগাসন বলা হয়,তাহলে ক্ষতি কী?
উত্তর: এতে ভয়ংকর ক্ষতি হতে পারে,যেমন এই ধরণের প্রচারের ফলে সত্যিকারের যোগ বিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।লোকেরা এটিকে যোগ হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করবে। উদাহরণস্বরূপ, ২-৩হাজার বছর থেকে মূর্তি পূজা শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষ ঈশ্বরকে সাকার ভাবতে শুরু করেছে যেখানে ঈশ্বর নিরাকার।

ধ্যান বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন. ধ্যান কাকে বলে?
উত্তর: ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি নিয়ে নিরন্তর চিন্তন করা কিন্তু এর মাঝে অন্য কোনো বস্তু বা বিষয়ের স্বরণ না করাকে ধ্যান বলে।

প্রশ্ন. গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে ধ্যান করলে কি উপকার হয়?
উত্তর: বুদ্ধির মলিনতা দূর হয় এবং ধর্মাচরণে শ্রদ্ধা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. ধ্যানের ফল কি হয়?
উত্তর: নিরন্তর ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে সমাধি প্রাপ্ত করা যায় এবং উপাসক আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্ত কাজ দৃঢ়তাপূর্বক সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন. বৈদিক রীতি ছাড়াও ধ্যানের জন্য শত শত ধারণা তৈরি করা হয়;তাদের মাধ্যমে কি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা যায়?
উত্তর: না। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারের বিশুদ্ধ বৈদিক জ্ঞান লাভ করে এবং সেই অনুসারে নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরের উপাসনা করলেই ঈশ্বর লাভ করা যায়।

প্রশ্ন. কিসের ধ্যান হয় না?
উত্তর: (১) যে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান নেই তার ধ্যান হয়না। (২) যা প্রত্যক্ষ এবং মূর্তিমান তার ধ্যান হয়না কারণ তার সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞান লাভ করা যায়। (৩)কোন বস্তুর বিপরীত লক্ষণে অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানেও ধ্যান হয় না।

প্রশ্ন. ঈশ্বর নিরাকার, কেউ যদি তাঁর হাত, পা, চোখ, কান ও মুখ সাকার রূপ মেনে ধ্যান করে, তাহলে কি ঈশ্বর উপলব্ধি হবে?
উত্তর: এইটা মেনে নিয়ে ধ্যান করলে ঈশ্বরের উপলব্ধি হবেনা কারণ ঈশ্বর কোন স্বরূপ নেই।

প্রশ্ন. ধ্যান করার জন্য মনের/চিত্তের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর: ধ্যান করতে হলে মনকে প্রসন্ন রাখতে হবে এবং দুঃখ,ক্ষোভ,রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

প্রশ্ন. কেমন স্থানে ধ্যান করা উচিত?
উত্তর: শান্ত ও নির্জন স্থানে।পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে ধ্যান করা উচিত।

প্রশ্ন. ধ্যান করার পূর্বে কি কি করতে হয়?/পূর্ব সাজসজ্জা কি করা হয়?
উত্তর: কোন একটি শান্ত, পরিষ্কার জায়গায় চোখ বন্ধ করে সুখপূর্বক,স্থির হয়ে যে আসনে বসতে ইচ্ছুক সে আসনে বসা উচিত।এর পরে, মনের চঞ্চলতাকে স্থির করতে প্রাণায়াম করা উচিত। বন্ধ করার জন্য, একজনকে প্রাণায়াম করতে হবে,রূপ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংযোগ দূর করে, মস্তক,হৃদয় কণ্ঠ ইত্যাদি, এক স্থানে স্থির করে বেদমন্ত্র বা অন্য কোন শব্দের মাধ্যমে ধ্যান শুরু করা উচিত ।

প্রশ্ন. কিভাবে ধ্যানে সফলতা অর্জন করা যায়?

উত্তর: নিম্নলিখিত আচার পালন করে ধ্যানে সফলতা অর্জন করা যায়- (১)ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে। (২) সদ্গুরুর পথ প্রদর্শন করে। (৩)ব্যবহারে যম-নিয়ম অনুসরণ করে। (৪)শরীর সামান্য সুস্থ থাকলে। (৫) প্রতিদিন দুই সময়ে ধ্যান অনুশীলন করে। (৬) সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের মাধ্যমে।

প্রশ্ন. ঈশ্বরের ধ্যান না করলে কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তর: (১)নিজের দোষ ও কুসংস্কার দূর করতে পারেনা।(২) শারীরিক ও মানসিক রোগে ভুগতে থাকেন। (৩) সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া-জীবনের এই মূল লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারে না। (৪) দয়া, প্রেম, ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ, উদ্যম, নির্ভীকতা ইত্যাদি দিব্য গুণাবলী অর্জন পারেনা। (৫) ধর্মীয় আচরণ ও আদর্শ এত পালন করতে পারেনা । (৬) সুখ, শান্তি, একাগ্রতা, মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

প্রশ্ন. দিনের কোন সময়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত?

উত্তর: সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মানুযায়ী দিনে দুইবার ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। উভয় সময়ে এক ঘন্টা ধ্যান করা অধিক লাভজনক এবং দিনভর অন্যান্য কাজ করার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। একেবারেই ধ্যান না করার পরিবর্তে, উভয় সময়ে ১০,২০ বা ৩০ মিনিটের জন্য ধ্যান করা উপকারী।

প্রশ্ন. সন্ধ্যার সময় যে ধ্যান করে না মনুস্মৃতিতে তার জন্য কী লেখা আছে?

উত্তর: যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা সন্ধ্যোপাসনা (ধ্যান) করেনা তাকে শূদ্র (সেবামূলক কাজ করে) সমতুল্য গণ্য করে মহৎ লোকদের
থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিকৃষ্টদের মধ্যে রাখা উচিত।

প্রশ্ন. নিরাকার বস্তুর কি ধ্যান করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, নিরাকার বস্তুর ধ্যান করা যায়।

প্রশ্ন. জাগতিক জিনিস যা দৃশ্যমান নয় সেগুলোর ব্যবহার করে কি ধ্যান করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ। যেমন বাতাস, মোবাইল-টিভি ইত্যাদির তরঙ্গ, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি দৃশ্যমান নয় তবে তাদের গুণগুলির চিন্তন-মনন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন. ধ্যান করলে আত্মা ও মনের যে উপকার হয় সেটা কি কোনো ওষুধ বা বস্তুগত জিনিস যেমন ধন-সম্পদ, মিষ্টি, সুন্দর বস্ত্র, গহনা ইত্যাদি থেকে কি পাওয়া যাবে?

উত্তর: না, ধ্যান করলে যে উপকার পাওয়া যায় তা ভৌতিক বস্তুগত জিনিস থেকে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন. ধ্যান বিষয়ে কয়েকজন বিদেশি পণ্ডিতের মতামত বলুন?

উত্তর: Herbert Benson,(M.D)এর লেখা The Relaxation Response বই অনুসারে, যোগ 'ধ্যান' মানসিক ও শারীরিক দুশ্চিন্তা কমিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। Jon Kabat-Zinn,(Ph.D). প্রমাণ করেছেন যে 'ধ্যান' দ্বারা দুশ্চিন্তা ও কষ্টও কমানো যায়।

প্রশ্ন. ধ্যানের সময় কি মনের চিন্তা দূর হয়ে যায়?

উত্তর: না, ধ্যানের সময় মন সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত হয় না, মনের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা থাকে।

প্রশ্ন. সাকারের ধ্যান সহজ হয়,নিরাকারের ধ্যান করা কঠিন হয়। কিন্তু তাই বলে আমরা কি ঈশ্বরকে সাকার মেনে ধ্যান করতে পারি?

উত্তর: না, কারণ ঈশ্বর সাকার নন।যে কোন বস্তু তার গুণ, কর্ম এবং স্বভাব দ্বারা যেমন হয়,তার সেরূপ ধ্যান করা হয়। যেমন জলকে দুধ মনে করে পান করা যায় না, তেমনি নিরাকার ঈশ্বরকেও সাকার রূপে ধ্যান করা যায়না,সেই সাকার রূপের ধ্যান করে প্রকৃতসুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না যেটা নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করে পাওয়া যায়।পাথরকে মিষ্টি ভেবে খাওয়া যেমন অজ্ঞতা, তেমনি নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার মনে করে ধ্যান করাও অজ্ঞতা।

প্রশ্ন. ধ্যানের পাঁচটি উপকারিতা বলুন?

উত্তর: ধ্যান করলে -(১)ঐশ্বরিক গুণাবলী যেমন -জ্ঞান,শক্তি,উৎসাহ,আনন্দ,দয়া,প্রেম, ধৈর্য, সহনশীলতা, নির্ভীকতা, প্রাণশক্তি, তেজ ইত্যাদি অর্জিত হয়। (২) কুসংস্কার নষ্ট হয়ে ভাল সংস্কার তৈরি হয় এবং উদ্ভূত হয়। (৩) মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। একাগ্রতা, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়। (৪) ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়. (৫) মহাজাগতিক -পার্থিব কাজে সাফল্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন. নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান কিভাবে হতে পারে?

উত্তর: নিরাকার বস্তুকে নিরাকার রূপে তার অন্যান্য গুণের মাধ্যমে ধ্যান করা হয়।ঈশ্বরের রূপ বা বর্ণের গুণ থাকে না, তিনি সর্বব্যাপক, সচেতন,সৃষ্টিকর্তা,আনন্দের স্বরূপ,অসীম জ্ঞান ও শক্তিতে পরিপূর্ণ, নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ ইত্যাদির চিন্তা করে ধ্যান করাকে ঈশ্বরের ধ্যান বলা হয়। .

প্রশ্ন. ধ্যান করলে কি রোগ দূর হয়?

উত্তর: হ্যাঁ। মানসিক রোগের জন্য ধ্যান উপকারী। এটি রক্তচাপ, হৃদরোগ এগুলোর জন্য উপকারী।ধ্যান করলে কিছুটা হলেও শারীরিক অসুস্থতা দূর হয় চলে যায়।

প্রশ্ন. যে ধ্যান করে না তার কি পাপ হয়? এর জন্য ঈশ্বরের নিকট থেকে কোন শাস্তি আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ,যে ধ্যান করে না সে পাপ করে এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে শাস্তিও পায়।

প্রশ্ন. ধ্যানকারী ব্যক্তি কি তার নিজের ও অন্য ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারে?

উত্তর: না।ধ্যানকারী ব্যক্তি তার নিজের ও অন্য ব্যক্তির মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানতে পারে না।

প্রশ্ন. ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না এমন ব্যক্তির ধ্যান করে কী উপকার পান?

উত্তর: না।ধ্যানকারী ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা, আগ্রহ এবং বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন. ধন- সম্পত্তি,বৈভব, সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা বর্জিত বা নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তিই কি ধ্যান করতে পারে?

উত্তর: এইটা ঠিক নয়। ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এমন সব ব্যক্তিই ধ্যান করতে পারে।

প্রশ্ন. শুধু আসন পেতে মাটিতে বসেই কি ধ্যান করা যায়,চেয়ারে বসে বা বিছানায় শুয়ে ধ্যান করা যায়না?
উত্তর: মাটিতে আসন পেতে বসলে ধ্যান অপেক্ষাকৃত অধিক ভালো হয়,কিন্তু কোনো কারণবশত চেয়ারে বসে বা বিছানায় শুয়েও ধ্যান করা যেতে পারে।

প্রশ্ন. ধ্যান কি শুধু ঘরের বাইরে জঙ্গলে, পর্বতে,নদীতে, ক্ষেতে,উদ্যানে করতে হয়,ঘরের মধ্যে করতে পারে না?
উত্তর: এইরকম নয়,ঘরেও ধ্যান করা যায়। কিন্তু একটি শান্ত-নির্জন,স্বচ্ছ স্থানে অধিক একাগ্রতা হয়,ধ্যান শীঘ্রই মনোযোগ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন. ধ্যান করলে কোন রোগ হতে পারে?
উত্তর: ধ্যান করলে কোনো রোগ হয় না।

প্রশ্ন. ধ্যানের সময় কি মস্তকে কোনো বিন্দু, সূর্য, চন্দ্র, প্রদীপের শিখা ইত্যাদি বস্তুকে অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত?
উত্তর: না, এসব কিছু একাগ্রতার ধরে রাখতে প্রারম্ভিক কিছু সময়ের জন্য করা যেতে পারে।

প্রশ্ন. চুপচাপ বসে থাকা এবং মনে কোনো চিন্তা আসতে না দেওয়ার নাম-ই কি ধ্যান?
উত্তর: চুপচাপ বসে থাকা এবং মনে কোনো চিন্তা আসতে না দেওয়ার নাম ধ্যান নয়। ধ্যানে ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা আসতে থাকে।

প্রশ্ন. ধ্যান তো বৃদ্ধ ব্যক্তিদের করা উচিত,যুবক অবস্থায় এর কি প্রয়োজন?
উত্তর: ধ্যান তো বাল্যকাল থেকেই করা উচিত।যুবক অবস্থায় পর্যাপ্ত বল, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি থাকার কারণে ধ্যানের বেশি উপকার পাওয়া যায়।যুবক অবস্থায় ধ্যান কারী ব্যক্তি সহজেই সমাধি অবস্থা লাভ করতে পারে। বৃদ্ধ অবস্থায় ব্যক্তি রোগ,দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে সঠিকভাবে ধ্যান সম্পাদন করতে পারেন না।যুবক অবস্থায় ধ্যানকারী ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি পায়,স্বাস্থ্য ঠিক থাকে এবং আধ্যাত্মিক কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায়।পার্থিব উন্নতি হয় এবং জীবন সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

প্রশ্ন. আজকাল অনেক প্রকারের ধ্যান পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সব পদ্ধতিগুলো কি ঠিক?
উত্তর: না, শুধুমাত্র বেদ অনুকূল পদ্ধতিই সঠিক।
বর্ণ ধর্ম

প্রশ্ন. মানব সমাজ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত এবং এদেরকে কি বলা হয়?
উত্তর: শাস্ত্রে মানবসমাজকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বর্ণ বলা হয়।

প্রশ্ন. বর্ণ শব্দের অর্থ কি?
উত্তর: বর্ণ শব্দের অর্থ যা তার গুণ ও কর্ম দেখে বাছাই করা হয়।

প্রশ্ন. বর্ণ কয়টি এবং সেগুলোর নাম কি?

উত্তর: বর্ণ চারটি। সেগুলোর নাম হল ব্রাক্ষণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য এবং শুদ্র।

প্রশ্ন. মানুষকে এই চারটি ভাগে ভাগ করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এর উদ্দেশ্য এই যে, সকল মানুষ একত্রে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করুক, তবে সবার মধ্যে ভালোবাসার অনুভূতি থাকতে হবে।কেউ যেন নিজেকে বড় না ভাবে এবং অন্যকে যেন ছোট না ভাবে।মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বর্ণের প্রয়োজন।কোন একটি বর্ণ ছাড়া ঠিকে থাকা অসম্ভব। মুখ, বাহু, পাকস্থলী ও পা ইত্যাদি শরীরের সকল অঙ্গ সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলেই নিজ নিজ কাজ করে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ অনুভূতি নেই।একইভাবে, মানব সমাজের মধ্যে, ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে পরস্পরের সাথে প্রেম ও সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি সমাজের উন্নতি ও শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন. বর্ণ কি শুধু চারটি নাকি তার অধিক?আজকাল তো আমাদের দেশে চার পাঁচ হাজার জাতি-উপজাতির দেখা মেলে।তাদের কি বিশ্বাস করা উচিত?

উত্তর: বৈদিক শাস্ত্রে শুধুমাত্র চারটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে।এইজন্য কাউকে পঞ্চম ভাবা, তাকে অচ্ছুত ভাবা এবং ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখা প্রভৃতি সম্পূর্ণ রূপে বেদ বিরুদ্ধ এবং ক্ষতিকর। এমনকি মনুস্মৃতিতে চারটি বর্ণের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে - "নাস্তি নু পঞ্চম ১০/৪" - কোনো পঞ্চম বর্ণ নেই।পাঁচ-ছয় কোটি ভাইকে পঞ্চম মনে করা কত বড় ভুল।এই কথাটা চার পাঁচ হাজার জাতি - উপজাতিদের জন্যও বলায় যায়।

প্রশ্ন. বর্ণ এবং জাতি শব্দের অর্থ কি একই?বেদাদি সত্য শাস্ত্রেও কি চারটি বর্ণ বিবেচনা করা হয়েছে?যদি না হয়, তাহলে বর্ণ এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: বর্ণ এবং জাতি হল,পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি এই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে।জাতিকে মুখ দিয়ে চেনা যায় , তাই গৌতম মুনি আইনশাস্ত্র ২/২/৭০ এ এর লক্ষণটিকে "**আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা**" হিসাবে করেছেন, যার অর্থ উপরে দেওয়া হয়েছে।এইরকম জাতি কে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না।ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়, গরু ইত্যাদি প্রাণীদের পশুজাতি বলা হয়,কারণ এদের চেহারা দেখে এগুলোকে আলাদা করা যায়,তথা এই জাতি সমূহকে এই জন্মে বদলানো যাবে না।ঘোড়া কখনো গাধা হতে পারবে না, না গাধা কখনো ঘোড়া হতে পারবে,কিন্তু ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রের মধ্যে এই ধরনের ভেদাভেদ নেই যার থেকে তাদের চেহারা দেখে আলাদা করা যাবে।প্রত্যেকের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের কার্যাবলী একই, তাই ঘোড়া, গাধা, গরু, ষাঁড় ইত্যাদি চেহারা দ্বারা চেনা সম্পূর্ণ অসম্ভব।পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতিকে আলাদা জাতি বলা যায় কারণ ওনাদেরকে চেহারা দ্বারা চিনে আলাদা করা যায়, এই জন্মে না পুরুষ নারী হতে পারবে, না নারী পুরুষ। চার বর্ণের মধ্যে পার্থক্য তাদের গুণ ও কর্মের কারণে, তাদের জন্মের কারণে নয়।তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা জাতি নয় বর্ণ।

প্রশ্ন. তাহলে শূদ্র বংশের লোক কি ব্রাহ্মণ হতে পারবে?আর ব্রাহ্মণ বংশের লোকও কি শূদ্র হতে পারবে?

উত্তর: হ্যাঁ, শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণকারী কোনো পুরুষের যদি ব্রাহ্মণদের গুণ ও কর্ম থাকে (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে), অর্থাৎ যিনি বিদ্বান, ধার্মিক, সদাচারী, ত্যাগী ও তপস্বী হয়ে শিক্ষক, প্রচারক ইত্যাদি কাজ করেন তবে তিনি সত্যিই এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হবেন।পক্ষান্তরে, যিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একটি কাজ করে পেট ভরে, যার মধ্যে কোন ব্রাহ্মণত্বের গুণ নেই, যার জীবন শুদ্ধ নয়, যিনি কোনো না কোনোভাবে রান্না করেন, ইত্যাদির শান্তি। (মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) ইত্যাদি কোনো গুণ নেয় , তিনি শূদ্র, ব্রাহ্মণ নন।

প্রশ্ন. আজকাল লোকেরা এই শাস্ত্রীয় নীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এটি অনুসরণ করে না, তাই এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য কিছু প্রমাণ দিন।

উত্তর: মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছেন এবং ভরদ্বাজ ভৃগুকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। (ব্রাহ্মণদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যা উপরে লেখা হয়েছে) ধর্মরাজ ও ভৃগু বললেন-

শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্ম, দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো, ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

[বনপর্ব, অ০ ১৮০। শান্তিপর্ব, অ০ ১৮৯]

ন কুলেন ন জাত্যা বা, ক্রিয়াভির্ব্রাহ্মণো ভবেৎ । চাণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণো যক্ষপুঙ্গব ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ ব্যক্তির মধ্যে যদি সত্য, দান, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি গুণাবলী পাওয়া যায়, তবে চন্ডাল বংশে জন্ম নেওয়া ব্যাক্তির মধ্যেও ব্রাহ্মণের গুণাবলী পাওয়া যেতে পারে।আর যদি দেখা যায় একজন শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষের ভিতরে, তাহলে সে ব্রাহ্মণ নয়, আর সেই শূদ্রও শূদ্র নয়।কিন্তু যাদের মধ্যে সেই গুণগুলি পাওয়া যায় তারাই ব্রাহ্মণ এবং যাদের মধ্যে সেই গুণগুলি পাওয়া যায় না তারা শূদ্র।ব্রাহ্মন বংশে জন্মগ্রহন করলে কেউ ব্রাহ্মন হয় না, কিন্তু একজন মানুষ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত গুণাবলী ও কর্মকে আত্মস্থ করেই ব্রাহ্মণ হয়, যদি চন্ডাল বংশে জন্মগ্রহণকারী ব্যাক্তির মধ্যেও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে, তবে সে অবশ্যই ব্রাহ্মণ।এই কথাটাকে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি, ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্ ।
ক্ষত্রিয়াজাতমেবং তু, বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥

[মনু০ ১০।৬৫]

অর্থাৎ, শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষও ব্রাহ্মণ হতে পারে, যদি উনি একজন ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্মকে আত্মস্ত করেন এবং কোনো ব্যাক্তি যদি সেই গুণগুলিকে আত্মস্থ না করে, তাহলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষও শূদ্র হয়ে যায়।একইভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি চরিত্রের পরিবর্তন গুণ ও কর্মের কারণে হতে পারে।

এরকম শত শত উক্তি উদ্ধৃত করা যায়,যেখান থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারটি বর্ণ নয় যা জন্মের উপর নির্ভরশীল এবং পরিবর্তন করা যায় না,বরং এগুলি হল সেই বর্ণ, যার ভিত্তি হচ্ছে পুণ্য ও কর্মের উপর এবং তা এই জন্মেই পরিবর্তন করা যায়।

এরকম শত শত উদাহরন পাওয়া যায়, যার মধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হল।বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহন করেও তপস্যা ও বিদ্যার কারণে ব্রাক্ষণ হয়েছিলেন।বশিষ্ঠ একজন বৈশ্যের পুত্র হয়েও প্রসিদ্ধ ঋষি এবং সূর্যবংশীয় রাজাদের কুলগুরু হন। পরাশর মুনি (বেদব্যাস জীর পিতা) একজন চন্ডালের পুত্র হয়েও একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন।মহাভারত, বেদান্তশাস্ত্র প্রভৃতির স্রষ্টা বেদব্যাস সত্যবতী নামক নাবিকের মেয়ের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পুরো সংসারে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং পূজনীয় ঋষি হিসেবে পরিচিত হন।

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ ।
মৃগিজোঽথর্ম্যশৃঙ্গোঽপি বসিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ ॥
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্বমদ্বিজাঃ ।

ভবিষ্যপুরাণ অধ্যায় ৪৩ প্রভৃতি শ্লোকে এ বিষয় স্পষ্ট।

মাতঙ্গ চন্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করলেও গুণের কারণে ঋষি হয়েছিলেন।ঋষি কণ্ব এবং কাশ্যপের শিক্ষা দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মিশ্র দেশের (বর্তমানে মিশর নামে পরিচিত) ১০০ জন মালেচ্ছ ব্রাহ্মণ হন। এরকম ভবিষ্যপুরাণ প্রতি সর্গ পর্ব ৩।৪।২০ এ লেখা আছে।

মিশ্রদেশোদ্ভবা মলেচ্ছাঃ, কাশ্যপেনৈব শাসিতাঃ
সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন, ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ ।
শিখাসূত্রং সমাদায় পঠিত্বা বেদমুত্তমম্ ।
যজ্ঞৈশ্চ পূজয়ামাসুঃ দেবদেবং শচীপতিম্ ॥
সহস্ত্রং তু স্মৃতা সঙ্খ্যা, পুরুষাণাং দ্বিজন্মনাম্ ॥

এই বিষয়ে অন্যান্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,তবে সম্প্রসারণের ভয়ই যথেষ্ট। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণকারী প্রীষাদ গুরু ও গোহত্যার কারণে শূদ্রে পরিণত হয়েছিল।

পৃষধস্তু গুরুগোবধাচ্ছূদত্বমগমৎ ॥
[মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১১।২।২৫]

ঋষি শৌনক ও অঙ্গিরার পুত্রদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র হয়েছিলেন তাদের কৃতকর্মের জন্য।

পুত্রো গৃৎসমদস্যাসীচ্ছুনকো যস্য শোনকঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব, বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রাঃ কর্মর্ভির্দ্বিজাঃ ॥
[বায়ু পুরাণ উ০ ৩।৫]

যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মতো জাতি থাকলে এমন পরিবর্তন কখনই হতে পারে না।

প্রশ্ন. গুণ ও কর্মের উপর ভিওি করে হওয়া বর্ণ ব্যাবস্থার বদলে জাতিভেদ প্রচলিত হওয়ায় কোনো ক্ষতি সাধিত হয়েছে কি?
উত্তর: এই জাতিভেদের কারণে শত্রুতা, বৈষম্য বেড়ে গেছে,ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভাজন ছড়িয়ে পড়েছে,উচ্চবর্ণে জন্ম নেওয়ায় অহংকার বেড়ে গেছে।ব্রাক্ষণ নিজের কর্মের পালন না করেও ব্রাক্ষণ কুলে জন্ম নেওয়ায় ব্রাক্ষণ থেকে যায়,এবং পূজনীয় হতে পারে এই চিন্তা ধারার কারনে তাদের বুদ্ধি কর্তব্য নষ্ট হয়ে গেছে তথা মানুষকে তাদের স্বেচ্ছাচারী অধিকারের জন্য লড়াই করতে শিখিয়েছে, যার কারণে মানুষ হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং একত্রিত হয়ে প্রেমের সহিত কোনো কাজ করতে পারে না। তাই এই ভ্রান্ত জাতিভেদ প্রথা ভেঙ্গে সকলের যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী প্রকৃত বর্ণ ধর্ম পালন করা উচিত।

আশ্রম ধর্ম

প্রশ্ন. শাস্ত্রে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু কত বছর ধরা হয়েছে?
উত্তর: মানুষের স্বাভাবিক আয়ু একশ বছর ধরা হয়েছে,যার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা করা হয় "জীবেম শরদঃ শতম্"অর্থাৎ আমরা অন্তত একশ বছর বেঁচে থাকি।এইজন্য প্রসিদ্ধ যে " শতায়ুর্বৈপুরুষ " অর্থাৎ পুরুষের আয়ু শত বছর হোক বা হওয়া উচিত।

প্রশ্ন. এই আয়ুকে কয়টি ভাগে করা হয়েছে?
উত্তর: চার ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন. এই চার ভাগকে কি নামে অভিহিত করা হয়?
উত্তর: এই চার ভাগকে আশ্রম নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন. এই চার আশ্রমের নাম কি?
উত্তর: এই চার আশ্রমের নাম যথাক্রমে ব্রক্ষচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

প্রশ্ন. এই চারটি আশ্রমে জীবনকে ভাগ করার উদ্দেশ্য ও সুবিধা কী?
উত্তর: জীবনকে এই চার আশ্রমে ভাগ করার উদ্দেশ্য হল :-যাতে মানুষ নিজেকে উচু করতে পারে এবং সর্ব প্রকার উন্নতি করতে পারে যা কেবল ধীরে ধীরে হতে পারে।দূরের কোনো জায়গায় যেতে হলে পথে এমন কিছু গন্তব্য ও পদক্ষেপ তৈরি করতে হয় যাতে মানুষ সহজেই তার লক্ষ্যে পৌছায়।একইভাবে, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এই চারটি আশ্রমকে জীবনের চারটি স্তর হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন. মনুষ্য জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: সকল দুঃখ, অজ্ঞতা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভ করে পরম সুখময় মুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, যেটাতে সর্বদা সুখ, শান্তি ও আনন্দ থাকে এবং সকল বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচর্য' এর অর্থ কী এবং কত বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থাকতে হবে?
উত্তর: ব্রহ্ম এর অর্থ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা হল ঈশ্বর ও বেদ।চর্য এর অর্থ জ্ঞান লাভ করা এবং তার মধ্যে চলা এবং চিরকাল অবস্থান করা।তাই ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ হল ঈশ্বর ও বেদের জ্ঞান লাভ করা এবং সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করে সমস্ত কাজ করা।সর্বক্ষেত্রে নিজেকে পবিত্র রাখা এবং ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি এর জন্য প্রয়োজন।কমপক্ষে ২৫ বছর বয়সী প্রতিটি যুবক এবং ১৬ বছর বয়সী প্রতিটি মেয়ের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থাকা উচিত।ভুল করেও এই বয়সের আগে বিয়ে করা উচিত নয়।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম কি?
উত্তর: ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল নিজের শরীর, মন, আত্মা এর শক্তি বাড়ানো এবং নিজেকে সবকিছু হতে পবিত্র রাখার প্রচেষ্টা করা।দেহের পবিত্রতার জন্য প্রতিদিন স্নান করা প্রয়োজন, বাক- শুদ্ধির জন্য শুধু সত্য, মিষ্টি ও উপকারী কথা বলা প্রয়োজন এবং মনের পবিত্রতার জন্য মনে সর্বদা বিশুদ্ধ চিন্তাভাবনা রাখা প্রয়োজন।খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিত্যকর্ম - ব্যায়াম, স্নান, সন্ধ্যার প্রার্থনা, হবন ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে করা উচিত।তার সর্বদা সাত্ত্বিক আহার গ্রহন করা উচিত।তিনি কখনই মাংস, মদ বা অতি টক, অতি লাল মরিচ, অধিক নোনতা এবং কষাকষি এবং বাসি জিনিস, ভাং, গাঁজা, আফিম, চরস ইত্যাদি নেশাদ্রব্য গ্রহণ করবেন না।বিনীতভাবে আচার্য গুরুদের ধর্মীয় আদেশ মেনে বেদ ও সমস্ত বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।সকল নারীকে মা বোনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত।নাটক, সিনেমা এবং শহরের খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে।ব্রহ্মচারীর জীবন সরল ও কঠোর হওয়া উচিত, অর্থাৎ ঠান্ডা-তাপ ইত্যাদি সহ্য করা। গুরুকুলে অবস্থানকালে তার উচিত আচার্যকে পিতা এবং বিদ্যাকে মাতা মনে করা।পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসা ও আসক্তি থাকা উচিত নয়।তাকে সর্বদা সত্যবাদী, ত্যাগী, তপস্বী, বিদ্বান, ধার্মিক, ভগবানের প্রতি নিবেদিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দুঃখ, হিংসা, অলসতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাপ পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন. ব্রহ্মচর্যের লাভ কি?

উত্তর: ব্রহ্মচর্য দেহ, মন এবং আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করে, যেমন শ্রী ভীষ্ম, শ্রী স্বামী শঙ্করাচার্য, স্বামী আনন্দ তীর্থ (শ্রীল মধ্ব), ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিত্ব এর জীবন থেকে যা স্পষ্ট প্রণীত হয়।উনারা আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন।ব্রহ্মচর্যের মহিমায় মানুষ মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং মৃত্যুকে জয় করে।বেদে উল্লেখ আছে-

ব্রহ্মচর্যেন তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।

[অথর্ববেদ ১১০।৫।১৬]

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার মহিমায় সত্যনিষ্ট ও বিদ্বান মনুষ্য মৃত্যুকে জয় করে।

প্রশ্ন. গৃহস্থ আশ্রম রত ব্যাক্তিদের প্রধান কর্তব্য কি কি?

উত্তর: গৃহাশ্রমে বসবাসকারী মানুষের প্রধান কর্তব্য পরস্পরের প্রতি প্রেমের সহিত আচরণ করা।সবাইকে একসঙ্গে ভালো কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।স্বামীকে একবিবাহ এবং স্ত্রীকে পতিব্রত ধর্ম পালন করতে হবে।সজ্জা, নিয়ম ও সংযমের মধ্যে থেকে নিজের সমস্ত কর্তব্য পালন করতে হবে।স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে একই দেহের অঙ্গ মনে করে সবসময় প্রেম করা উচিত।সকল ধর্মীয় কাজে একে অপরকে সাহায্য করা।পুত্র-কন্যাদের সর্বদা সর্বোত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গুণী, ধার্মিক ও পরোপকারী করে তোলার চেষ্টা করা।স্বার্থপরতা ত্যাগ করে দানশীল হওয়া।

প্রশ্ন. বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশের সময় কত এবং বানপ্রস্থের কর্তব্য কি?

উত্তর: বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশের সময় সাধারণত পঞ্চাশ বছর পরে,যখন সন্তানের সন্তান হয়।গৃহস্থের অভিজ্ঞতা লাভের পর, প্রত্যেক নর-নারীর উচিত বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং গুরুকুল ইত্যাদিতে অবস্থান করে শিক্ষকতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হওয়া।ঈশ্বর ভক্তি, ধ্যান-যোগ এবং বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষভাবে সময় দিতে হবে।অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শান্তি, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি কে বিশেষভাবে ধারণ করতে হবে। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যতটা সম্ভব অন্যদের উপকার করা উচিত।

প্রশ্ন. বর্তমানে বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রয়োজন কী? এবং এটাতে লাভ কী?

উত্তর: মানুষ যদি পুরানো দিনের মতো পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বানপ্রস্থি হওয়ার নিয়ম করে, তাহলে গুরুকুল এবং অন্যান্য ভাল প্রতিষ্ঠান চালানো খুব সহজ হবে।আজকালের মতো যারা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তারা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, আত্মত্যাগী কর্মীর অভাব অনুভব করবেন না।এভাবে শিক্ষা ও সমাজের কাজ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে চলতে থাকবে।এতে করে বৃদ্ধরা যে শান্তি পাবে তা বিশেষভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন. সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য কি?

উত্তর: সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল সমস্ত মন্দের ত্যাগ।সন্ন্যাসী হল সেই ব্যক্তি যিনি সর্বদা সমস্ত খারাপ কাজ ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যান ও পরোপকারে মগ্ন থাকেন, যিনি সম্পদ, পুত্র ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠেন,যিনি নির্ভয়ে সর্বত্র ধর্ম ও অধর্মের প্রচার করেন,অন্যায় ও অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করে,যিনি সকল প্রাণীকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, যে চক্রবর্তী রাজাকে অধর্ম করতে দেখে তাকেও তিরস্কার করতে পারে।এই ধরনের সত্য সন্ন্যাসীদের সংখ্যা যত বেশি হবে, পৃথিবীর সংস্কার ও মুক্তি তত তাড়াতাড়ি হবে।

ধর্মবীর আর্যসজ্জনদের জীবন পরিচয়

(ত্যাগের গল্প)

প্রশ্ন. বলা হয় যে, সমাজের উন্নতি তখনই হয় যখন সমাজের মানুষ ধর্ম বা দেশ রক্ষার জন্য শহীদ হতে প্রস্তুত হয়। আর্যসমাজেও কি কোনো ধর্মবীর শহীদ আছে?

উত্তর: আর্যসমাজের প্রবর্তক ঋষি দয়ানন্দ ধর্মের জন্য যে বলিদান দিয়েছিলেন তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।১৮৯৭ সালে দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বলিদান পণ্ডিত লেখরাম জী দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন. পণ্ডিত লেখরাম জী আর্যসমাজ ও বৈদিক ধর্মের জন্য কি কার্য করেছিলেন এবং ওনার বলিদান কেন এবং কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: পণ্ডিত লেখরাম জী 'আর্যমুসাফির' আর্যপ্রতিনিধি সভা পাঞ্জাব এর একজন অত্যন্ত উৎসাহী ও নির্ভীক প্রচারক ছিলেন।তিনি উর্দু ভাষায় বৈদিক ধর্ম সম্পর্কিত অনেক বই লিখেছেন এবং পুনর্জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে মুসলমানদের প্রশ্নের খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।উনি ঋষি দয়ানন্দ স্বরস্বতী এর একটি উওম জীবনী লিখেছেন। উনার নির্ভীক বৈদিক ধর্ম প্রচার ও শুদ্ধিকরণ কাজের জন্য কিছু মুসলিম বিরক্ত হয়েছিলেন।মার্চ ১৮৯৭ সালে একজন মুসলিম উনার কাছে আসেন এবং শুদ্ধ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং অসুস্থ হওয়ার অজুহাত দেখিয়েছিলেন।১৮৯৭ সালের ৬ মার্চ পণ্ডিত লেকরাম জী ঋষি দয়ানন্দের জীবনচরিত লেখার সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য স্নান করছিলেন, সেই সময় সেই দুষ্ট ব্যক্তি সুযোগটি নিয়ে তার কালো কম্বলে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে তাকে আক্রমণ করে, যার ফলে তিনি মারা যান।স্বর্গীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী (মহাত্মা মুন্সিরাম জি) কতৃক লিখিত "আর্যপথিক লেখরাম কা জীবন চরিত্র" প্রত্যেক আর্যবালকের অধ্যায়ন করা উচিত।

প্রশ্ন. এই দুইজনের পর কার বলিদান হল?

উত্তর: এর পরে, পাঞ্জাব প্রদেশের ফরিদকোট রাজ্যের বাসিন্দা শ্রীযুত তুলসীরাম জী নামে এক ভদ্রলোকের আত্মত্যাগ স্মরণযোগ্য।এই ভদ্রলোক স্টেশনমাস্টার হয়েও সময় বের করে ধর্ম প্রচার করতেন।তিনি জৈনধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নির্ভয়ে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও নীতির সমালোচনা করতেন।এতে বিরক্ত হয়ে এক রাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু জৈন ওনাকে ঘিরে ধরে এবং মরিচ মিশ্রিত বালি তার উপর ছুড়ে ফেলে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে।

প্রশ্ন. চতুর্থ বলিদান কার, কেন এবং কখন হয়েছিল?

উত্তর: চতুর্থ আত্মত্যাগ ১৯২৩ সালে জাম্মু প্রদেশের বাসিন্দা শ্রীমান রামচন্দ্র নামে এক ভদ্রলোকের, যিনি রাজার রাজ্যে ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করতেন।এই ভদ্রলোক তথাকথিত মেঘ নামক অস্পৃশ্য জাতির মুক্তির জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন। তার প্রচেষ্ঠার কারণে আরো অনেকে এই বিষয়ে কাজ করা শুরু করেছিলেন কিন্তু এই বিষয়টি অনেক রাজপুতের খারাপ লেগেছিল।রাজপুতেরা উনাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল ও হত্যা করেছিল।এভাবে দলিত মুক্তি ও ধর্ম প্রচারের পবিত্র কার্য করতে গিয়ে ২৬ বছর বয়সে বিপথগামী রাজপুত ভাইদের হাতে নিহত হন। উনার আত্মত্যাগের ফল এই যে, দলিতদের উন্নতির কাজ ব্যাপক হারে শুরু হয়।যে রাজপুতেরা শ্রী রামচন্দ্রকে হত্যা করেছিল তারা নিজেরাই আর্য সমাজের মহাপ্রেমিক হয়ে উঠেছিল এবং এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার মেঘ জনগোষ্ঠী আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন. পঞ্চম বলিদান কোন আর্য ব্যাক্তির কেন এবং কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: পঞ্চম আত্মত্যাগ পূজ্যপাদ শ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জি মহারাজের **২৩** ডিসেম্বর, **১৯২৬** তারিখে আবদুল রশিদ নামে একজন ধর্মান্ধ মুসলমানের হাতে দিল্লিতে হয়েছিল।এর প্রধান কারণ ছিল শুদ্ধিকরণ নিয়ে শ্রী স্বামীজির জোরালো আন্দোলন, যার কারণে ধর্মান্ধ মুসলমানরা বিরক্ত হয়ে শ্রী স্বামীজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।শ্রী স্বামীজির নামে এরকম অনেক চিঠি পাওয়া গেছে, যাতে তাকে শুদ্ধিকরণের কাজ বন্ধ করার এবং তা না করলে তাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী একজন নির্ভীক, ধার্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন।উনি এসকল হুমকি পাত্তা না দিয়ে ধর্মের কাজ করতেন। উনার প্রচেষ্টায় এক লক্ষেরও বেশি মালকানে রাজপুত, যারা বহুকাল আগে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, পরে তাদের আর্য ধর্মে (হিন্দু ধর্ম) দীক্ষিত করা হয়।**১৯২৬** সালের **২৫** মার্চ আসগরী বেগমকে তার ইচ্ছানুসারে শুদ্ধ করে শান্তিদেবী নামকরণ করা হয়।এই কারণে, ধর্মান্ধ মুসলমানরা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শুদ্ধি করার জন্য মামলা দায়ের করেন।এই মামলার রায় শ্রী স্বামীজির পক্ষে এসেছিল।এই কারণে মুসলমানদের রাগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।অবশেষে **২২** শে ডিসেম্বর, **১৯২৬** সালে আবদুল রশিদ নামে এক মুসলমান শ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাড়িতে আসেন। সে সময় তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।প্রথমে তিনি তাদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার অজুহাত তৈরি করেন।স্বামীজি বলেছিলেন যে অসুস্থতার কারণে ডাক্তাররা আমাকে বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, আমি যখন ভাল বোধ করব তখন আমি কথা বলব।অতঃপর লোকটি জল চেয়েছিলেন।জল পান করার পর, তিনি শ্রী স্বামীজীকে চারটি গুলি ছুড়ে তাঁর পবিত্র জীবনকে দেহমুক্ত করেন।

প্রশ্ন. শ্রী স্বামী জী আর্য সমাজের জন্য কি বিশেষ কাজ করেছেন?

উত্তর: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী (পূর্ব নাম মুন্সিরাম) যিনি আর্যসমাজের একজন মূখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।উনি সফল উকালতির পেশা ছেড়ে সারাজীবন আর্যসমাজের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।ঋষি দয়ানন্দ জী এর আজ্ঞা পালন করার জন্য গুরুকুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।এজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ত্রিশ হাজার রুপি একত্র না করা পর্যন্ত তিনি ঘরে পা রাখবেন না।উনি উনার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছিল এবং নিজের মন, ধন সবকিছু আর্যসমাজ ও গুরুকুলের সেবাই নিয়োজিত করেছিলেন। **১৯০২** সালে উনি হরিদ্বারে কাংড়ি গুরুকুল স্থাপন করেন।এটি এখন পুরো বিশ্বে একটি আদর্শ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।শ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী মহারাজ আর্যসভ্যতা, বৈদিক ধর্ম ও ব্রহ্মচর্যের উন্নতির জন্য গুরুকুলের মাধ্যমে উনি যতটুকু কাজ করেছেন তা আর অন্য কেউ করতে পারেনি।জন্মসূত্রে জাতিভেদ বা জাত - পাত, অচ্যুত, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথা দূর করা ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী এর নাম প্রথম পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখার যোগ্য। উনার জীবন শুদ্ধ, পবিত্র, নির্ভয়তা ও সাহসীকতায় পূর্ণ ছিল।তিনি স্বরাজ আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছিলেন এবং সকল কষ্ট উনি খুশি মনে গ্রহন করেছিলেন।এরকম ত্যাগী - তেজস্বী , বীর - নির্ভয় ব্যাক্তি হওয়ার চেষ্টা প্রত্যেক বালকের করা উচিত।

প্রশ্ন. ষষ্ঠ বলিদান কোন আর্যসজ্জনের কেন এবং কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: ৬ এপ্রিল **১৯২৯** সালে লাহোরে ইলমদিন নামে এক মুসলমানের হাতে লাহোরের প্রসিদ্ধ আর্যপুস্তকালয় এর পরিচালক শ্রীমান রাজপালের ষষ্ঠ বলিদান সংঘটিত হয়।এর কারণ হল রাজপাল জী কতৃক প্রকাশিত "রঙ্গিলা রসুল " পুস্তক। যার কারনে মুসলমানেরা ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন. এই সকল বলিদানের অতিরিক্ত অন্য সকল বলিদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: এছাড়াও শ্রী নাথুরাম জি নামে একজন সিদ্ধ আর্য ভদ্রলোকের বলিদান করাচি তে হয়েছিল, যখন একজন মুসলিম তাকে হাইকোর্টের একটি কক্ষে বিচারকের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছিল।একইভাবে, ইন্দোর রাজ্যের শ্রী

মেঘরাজ জী, রোহতক জেলার ভক্ত ফুলসিংহ জী এবং আরও অনেক আর্যসজ্জন ধর্মের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বা উনারা দুষ্ট বিরোধীদের ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন।
সকলের জীবন কাহিনী এখানে বিস্তারিত দেওয়া সম্ভব নয়।তাই 'ধর্মবীর আর্যদের এই বলিদান ' গল্পের এখানে সমাপ্তি করা হল।বালক বালিকাদের এইসকল ধর্মবীর আর্যদের জীবনী বার বার পড়া উচিত এবং উনাদের মত হওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত।এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে - এসকল বলিদানের কারণে আর্যসমাজ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক উন্নতি সাধন করেছিল।উদাহরণস্বরূপ, হায়দ্রাবাদ রাজত্বে ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এবং ধর্মযুদ্ধ যা **১৯৩৯** সালে সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে নিম্নলিখিত আর্যবীরেরা নিজের প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন -
শ্রী বেদপ্রকাশ জী, শ্রী রামজী, শ্রী শ্যামলাল জী, শ্রী ধর্মপ্রকাশ জী, শ্রী মহাদেব জী, শ্রী ভীমরাও জী, শ্রী সত্যনারায়ন জী,শ্রী পরমানন্দ জী, স্বামী সত্যানন্দ জী,শ্রী বিষ্ণু ভগবন্ত জী,শ্রী ছোটেলাল জী,শ্রী পান্ডুরং জী, শ্রী মাধবরাজ জী, শ্রী মনুমাল জী, শ্রীযুক্ত সুনহারা, শ্রী ফকিরচাঁদ জী, শ্রী মলখান সিং জী, শ্রী স্বামী কল্যাণানন্দ জী, শ্রী শান্তিপ্রকাশ জী, শ্রী খন্দেরাও জী, শ্রী বদনসিংহ জী, শ্রী রতিরাম জী, ব্রহ্মানন্দ জী প্রমুখ।

আর্যসমাজের দশ নিয়ম

প্রশ্ন. আর্য শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: আর্য শব্দের অর্থ হল ধর্মাত্মা, সজ্জন, সর্বদা ধর্ম এবং ন্যায়ের পথে চালিত, এবং কর্তব্য পালনকারী , চরিত্রবান মনুষ্য।

প্রশ্ন. এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

উত্তর: বশিষ্ঠ্য স্মৃতি এর নিম্নলিখিত শ্লোক

কর্তব্যমাচন্ কার্যম্ অকতব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতিচারে, স তু আর্য ইতি স্মৃতঃ।।

অর্থাৎ, যে সর্বদা উপযুক্ত ও যোগ্য কর্ম করে এবং কখনও খারাপ কাজ করে না,এরকম সদাচারী মনুষ্য কে আর্য বলে।শব্দ কল্পদ্রুম, 'বাচস্পত্য বৃহদভিধান' প্রভৃতি সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ শব্দ কোষে 'আর্য' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে পূজ্য, শ্রেষ্ট, সম্মানিত, উদার, শান্তচিত্ত, ন্যায় পথাবলম্বি,ধার্মিক, সতৎকর্তব্যকর্মানুষ্ঠাতা, ধার্মিকঃ ধর্ম-শীলঃ'।উপরোক্ত শ্লোকটি শব্দকোষ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রশ্ন. সমাজ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: সমাজ শব্দের অর্থ হল, যা সম +আ+অজ, অর্থাৎ যারা একসাথে চারদিক থেকে প্রগতিশীল এবং খারাপগুলি দূর করার চেষ্টা করে।আর্যদের দলকে একসাথে আর্যসমাজ নামে অভিহিত করা হয়, যারা একত্রিত হয়ে সদগুন অর্জন ও দুর্গুন দূর করার সদা প্রচেষ্টা করে।

প্রশ্ন. আর্যসমাজের স্থাপনা কে এবং কখন করেন?

উত্তর: আর্য সমাজের স্থাপনা করেন ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী ৭ই এপ্রিল, **১৮৭৫** সালে বোম্বে শহরে বৈদিক ধর্মের প্রচার এবং জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন. আর্যসমাজের দশ নিয়ম বলুন।

উত্তর: আর্য সমাজের দশ নিয়ম ।

১.সব সত্য বিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায়, সে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

২.ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান্, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক,সর্বান্তযামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারই উপাসনা করা উচিৎ।

৩.বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম ।

৪. সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকা উচিত।

৫.সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচার পূর্বক করা উচিত।

৬.সংসারের উপকার করা অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭. সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।

৮.অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।

৯. প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি মনেকরা উচিত।

১০. সকল মনুষ্যকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে স্বতন্ত্র থাকা উচিত ।

আর্য সমাজের প্রবর্তক ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রশ্ন. আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি দয়ানন্দ স্বরস্বতী কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?

উত্তর: ঋষি দয়ানন্দ স্বরস্বতী ১৮২৪ সালে গুজরাট প্রদেশের ট্যাঙ্করা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন. উনার প্রথম নাম কি ছিল?

উত্তর: উনার প্রথম নাম ছিল মুলশঙ্কর ও দয়ারাম।

প্রশ্ন. মুলশঙ্করের পিতামাতার নাম কি ছিল?

উত্তর: মুলশঙ্করের পিতার নাম কর্ষণজী লাল তিওয়ারী, এবং মাতার নাম যশোদাবাই।

প্রশ্ন. কর্ষণজীর পেশা কি ছিল?

উত্তর: কর্ষণ জী ছিলেন একজন বড় জমিদার ও ব্যাংকার তথা মৌরভি রাজ্যের একজন কর্মকর্তা।

প্রশ্ন. শিশু মুলশঙ্করের অন্তরে কখন জ্ঞানের উদয় হল এবং কখন তিনি মূর্তি পূজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন?

উত্তর: শিশু মুলজীর বয়স যখন প্রায় ১৪ বছর, তখন শিবরাত্রির দিন তার বাবা, যিনি শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তিনি তাকে মন্দিরে নিয়ে যান।শিবরাত্রিতে সারারাত জেগে থাকা এবং উপবাস করার মাহাত্ম্যের কথা মুলজী শুনেছিলেন। তাই সবাই (এমনকি তার বাবাও) ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ও তিনি চোখে পানি ছিটিয়ে জেগে ছিলেন।এদিকে তিনি দেখলেন, একটি ইঁদুর মহাদেবের মূর্তির উপর দেওয়া মিষ্টি খাচ্ছে, তবুও মহাদেব কিছুই করতে পারছেন না।শিশুটির শুদ্ধ সরল হৃদয়ে সন্দেহ জাগে যে এ কি হচ্ছে ?মহাদেব, যাঁর সম্বন্ধে পুরাণে ত্রিশূল দিয়ে ত্রিপুরাদি রাক্ষস বধের এত গল্প বলা হয়েছে, তিনি কি একটি ছোট ইঁদুর থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না?শিশুটি এর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে

পিতাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পিতার সামনে তার সন্দেহের কথা তুলে ধরেন।এমনকি তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে মুলজিকে ধমক দিতে থাকে যে, তোমার এত সন্দেহ কেন?পিতার উত্তরে শিশুটির মন মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না এবং অল্প বয়সেই তিনি মনস্থির করেছিলেন যে তিনি সত্য মহাদেব (ঈশ্বর) না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন না।সেই দিন হতেই সরল হৃদয়ের শিশু মন মূর্তি পূজা হতে উঠে যায়।

প্রশ্ন. এমন আর কোন ঘটনা ছিল কি যা মুলজীর হৃদয়ে বৈরাগ্য এনে দিয়েছে এবং ঘর ত্যাগ করতে বাধ্য করে।
উত্তর: মুলজীর বয়স যখন মাত্র ১৪-১৫ বছর তখন হঠাৎ একদিন তার ছোট বোন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং সর্বোত্তম ঔষধ খাওয়ার পরেও সে সুস্থ হয়নি এবং সে মারা যায়।মৃত্যু দেখে বাকি সবাই কান্না করলেও শিশু মুলজী এক কোণে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এই মৃত্যু থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?দুই বছর পর তার কাকা মারা যান। তিনি মুলজীকে খুব ভালোবাসতেন।এটি তার বৈরাগ্যকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল এবং তিনি মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেতে বা যে কোনও উপায়ে অমর হওয়ার জন্য তার মন কে তৈরি করেছিলেন।

প্রশ্ন. কার কাছ থেকে এবং কখন মুলজী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে তাঁর নাম কী রাখা হয়েছিল?
উত্তর: স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামে একজন বিদ্বান সন্ন্যাসীর কাছ থেকে প্রায় ২৪ বছর বয়সে মূলজি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে তাঁর নাম রাখা হয় দয়ানন্দ সরস্বতী।

প্রশ্ন. স্বামী দয়ানন্দ জীর গুরু কে ছিলেন, যার বিশেষ প্রভাবে তিনি বৈদিক ধর্ম রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন?
উত্তর: স্বামী দয়ানন্দ জীর পূজনীয় গুরু ছিলেন স্বামী বীরজানন্দ জী, যিনি মথুরায় থাকতেন।দয়ানন্দ জী তাঁর কাছ থেকে বিশেষভাবে বেদ-বেদাঙ্গ পড়েন এবং তিনি দয়ানন্দের কাছ থেকে গুরু-দক্ষিণা হিসাবে চেয়েছিলেন যে তুমি সর্বদা বেদের প্রচার কর,মানুষকে ঋষিদের তৈরি সেরা বই পড়তে অনুপ্রাণিত কর এবং বেদবিরোধী সমস্ত জিনিস ও রীতিনীতি থেকে মুক্তি দাও।

প্রশ্ন. ঋষি দয়ানন্দ শিক্ষা শেষ করে বৈদিক ধর্মের প্রচার ও সমাজ সংস্কারের জন্য কী কী কাজ করেছিলেন?
উত্তর: উনি কাশী প্রভৃতি নগরীর বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সাথে মূর্তিপূজার মত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শাস্ত্রার্থ করেন।বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে কুম্ভমেলা ইত্যাদিতে বৈদিকধর্মের উপর জোরালো বক্তৃতা দেন।বৈদিক ধর্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।যেগুলো হতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলো অধিক প্রসিদ্ধ:-
১.যজুর্বেদ এর সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষ্য যেটাকে পন্ডিতেরা হিন্দিতে অনুবাদ করেন।
২.ঋগ্বেদের ৬টি মন্ডল ৬২টি সুক্ত পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষ্য।
৩.আর্যভিবিনয় বৈদিক প্রার্থনা, এর পুস্থক।
৪.সত্যার্থ প্রকাশ।
৫.ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা।
৬.সংস্কারবিধি।
৭.ভ্রমোচ্ছাদন,বেদ বিরুদ্ধ মত খন্ডন ইত্যাদি অনেক ছোট বই।
৮.পশু সুরক্ষা এবং মাংস নিষিদ্ধ প্রচারের জন্য গোকরুনানিধি।এই পুস্তকের মাধ্যমে এবং লক্ষাধিক স্বাক্ষর সহ ঋষি দয়ানন্দ স্বরস্বতী রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করে গরু জবাই বন্ধের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করেছিলেন।
সংস্কৃত ভাষা প্রচারের জন্য ঋষি দয়ানন্দ বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা চালুন করেছিলেন। অনাথদের রক্ষা করার জন্য ফিরোজপুরে অনাথালয় স্থাপন করেন।

মূর্তিপূজা, জন্মগত জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, মৃতের শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা এই উদ্দেশ্য করা যে এর দ্বারা সংঘটিত পাপ মোচন হবে,জোর করে বিধবা বানিয়ে সারাজীবন বৈশ্যা বানিয়ে রাখা ইত্যাদির অপকর্মের বিরুদ্ধে ঋষি দয়ানন্দ প্রতিবাদ করে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রকৃত স্বরুপ সকলের সামনে তুলে ধরেন।ব্রহ্মচর্য প্রচারের জন্য সত্যার্থ প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন. ধর্ম প্রচারের কাজে ঋষি দয়ানন্দ কে কি কি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো?

উত্তর: ধর্ম প্রচারের কাজ করতে গিয়ে ঋষি দয়ানন্দকে নানা ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়েছিল।স্বার্থপর, ধূর্ত লোকেরা ওনাকে বহুবার বিষ দিয়েছিল।তারা ঋষির দিকে পাথর, মাটি, গোবর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্নভাবে ওনাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে।তবুও ঋষি দয়ানন্দ শান্ত চেতনায় সব কষ্ট সহ্য করেছেন এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার চিন্তা কখনও করেন নি।

প্রশ্ন. ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার ছাড়াও ঋষি দয়ানন্দ কি রাজনৈতিক সংস্কারের জন্যও কোনো প্রচেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর: ঋষি দয়ানন্দ বেদ প্রভৃতি সত্য শাস্ত্র দ্বারা রাজধর্ম ও প্রজাধর্ম এর প্রচার করেছিলেন।জনগনের কাছে স্বরাজ্যের গুরুত্ব এই কথাটি দ্বারা তুলে ধরেছিলেন -"কেউ যতই করুক না কেন যেটা স্বদেশী রাজ্য হয় সেটি সর্বোপরী উওম হয়, অথবা মত পার্থক্যের আগ্রহরহিত, নিজের এবং অন্যের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, প্রজার প্রতি পিতা মাতার সমতুল্য কৃপা, ন্যায় ও দয়া সহ বিদেশীদের রাজ্য সুখ দায়ক নয়"।(সত্যার্থ প্রকাশ সামুল্লাস ৮)।

একইভাবে তিনি দেশীয় পোশাক ধারণ করার বিষয়ে সত্যার্থ প্রকাশের **১১** তম সমুল্লাসে জোর দিয়েছেন।দেশী রাজাদের পরিবর্তনের জন্য ওনি ওনার জীবনের শেষ বছরগুলোতে চেষ্ঠা করেছিলেন।তিনি বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার চেতনা জাগ্রত করেছিলেন।উপ-আইনে, তিনি আর্যদেরকে আদালতে না গিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করার পরামর্শ দেন।

প্রশ্ন. ঋষি দয়ানন্দ এর মৃত্যু কখন এবং কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: **১৮৮৩** সালের ৩০ অক্টোবর দিপাবলীর দিনে আজমীরে ঋষি দয়ানন্দ মৃত্যুবরন করেন।মৃত্যুর কারণটি নিম্নরুপ বর্ননা করা হয়েছে যে যোধপুরের রাজা নানিঞ্জন নামে এক বেশ্যার প্রেমে পড়েছিলেন।ঋষি দয়ানন্দ যখন যোধপুরে সেই রাজার অতিথি ছিলেন, তখন তাঁর অসন্তুষ্টির জন্য এই ঘটনা ঘটেছিল।ঋষি সেই রাজাকে তিরস্কার করেন। নানিঞ্জন প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন।উনি ঋষির সেবক (যার নাম জগন্নাথ বলা হয়) কে প্রলোভন দেখিয়ে ঋষির খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন,যার প্রভাবে ঋষির শরীরে ফোঁড়া হয় এবং অবশেষে ঋষির দেহান্তর ঘটে।এমনকি শেষ সময়ে ঋষি দয়ানন্দ পবিত্র বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করার সময় বলেন :"ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছে পূরন হল, তুমি ভালোই লীলা করেছো"ইত্যাদি এসকল শব্দের উচ্চারণ করতে করতে ঋষি দেহত্যাগ করেন। এই দৃশ্য দেখে পণ্ডিত গুরু দত্তের মতো নাস্তিক চিন্তার ভদ্রলোকেরাও কট্টর আস্তিক হয়ে ওঠেন। ঋষি দয়ানন্দ তার ঘাতককে রক্ষা করে এক অদ্ভুত দয়া দেখিয়েছেন।এমন আদর্শ সংস্কারক যোগীবর ঋষি দয়ানন্দের বিশদ জীবনী পাঠ করলে পাওয়া যাবে সকল বালক-বালিকা এবং নারী-পুরুষের উচিত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করা।

আর্য বিদ্বান

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

জন্ম- ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪

তিরোধান- ৩০ অক্টোবর,১৮৮৩

জন্মস্থান- টঙ্কারা, গুজরাট, ভারত।

অবদানঃ

১) বেদ ও আর্ষগ্রন্থের প্রচার প্রসারের জন্য আর্যসমাজের স্থাপনা করেন।

২)গুরু বিরজানন্দ সরস্বতীজির আদেশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পৌরাণিক ও বিধর্মী বিদ্বানদের সাথে বিবিধ বিষয়ে শাস্ত্রার্থ করে বৈদিক সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

৩) নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের জন্য ভূমিকা রাখেন।

৪) বেদ ও বৈদিক শিক্ষার প্রসারের জন্য গুরুকুল স্থাপন করেন।

৫) বেদাঙ্গনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণসম্পন্ন বেদের ভাষ্য রচনা করেন।

৬) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর দেওয়া 'স্বরাজ্য স্বদেশী এবং স্বাধীনতা' স্লোগান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করে।

৭)দলিতোদ্ধার।

৮) পাখণ্ড ও কুসংস্কারের খণ্ডন।

৯) তিনি সবাইকে আহবান করেছেন 'Back to Vedas'

১০) রচিত গ্রন্থ : https://arsa-parampara.blogspot.com/2022/09/blog-post_11.html?m=1

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজির (১৮৫৬-১৯২৬) জন্মগত নাম মুন্সীরাম বিজ্ । জীবনের শুরুর দিকে নাস্তিক হলেও, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তা-চেতনার ঋতোদ্ধার হয়। আর্যসমাজের আদর্শকে মনেপ্রাণে ধারণপূর্বক তিনি নিজের সমগ্র জীবনকে বেদ ও বৈদিক ভাবধারার প্রচার - প্রসারে উৎসর্গ করে দেন। তৎকালীন উগ্র জেহাদিদের দ্বারা কৃত ধর্মান্তর রোধ করতে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শাস্ত্রার্থের দ্বারা বিরোধী ধর্ম ও মান্যতার পণ্ডিতদের ধরাশায়ী করে বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। আব্রাহামিক ধর্মের অসারতা জনমানসে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক বই লিখেন এবং রীতিমতো জেহাদিদের চোখে এক আতঙ্ক বনে যান। দলিত ভাইবোনদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য 'আর্যনগর' নামক বস্তি নির্মাণ করেন। লক্ষাধিক মানুষকে তিনি শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে সত্য সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। বিদেশি শিক্ষার বদলে তিনি প্রাচীন বৈদিক গুরুকুলীয় শিক্ষার উপরেই জোর দেন। আজকের বিখ্যাত 'কাঙ্গরি গুরুকুল' স্বামীজিরই প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৬ সালে আব্দুর রাশিদ নামের এক উগ্র জেহাদি আততায়ীর হামলায় এই সিংহপুরুষ 'ওওম্' উচ্চারণপূর্বক প্রাণত্যাগ করেন।
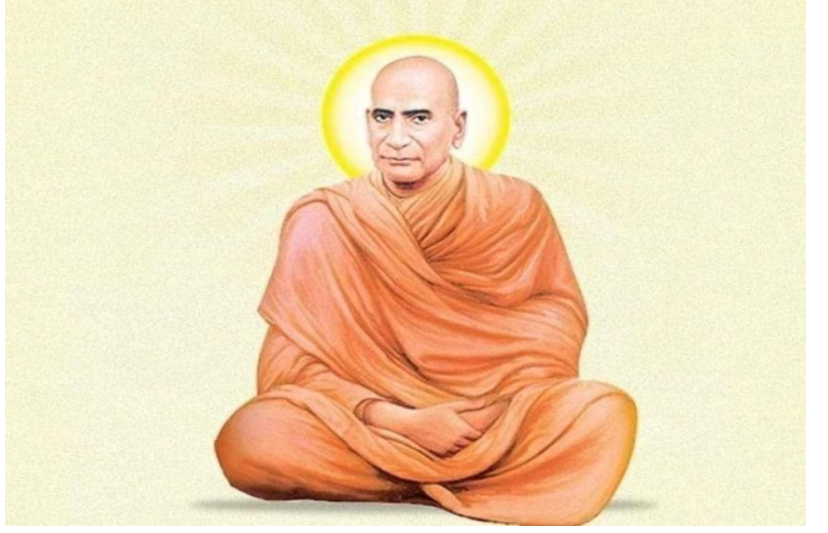
পণ্ডিত লেখরাম

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মহান শিষ্য, মহান চিন্তাবিদ, প্রচারক, লেখক এবং আর্য সমাজের নিবেদিত কর্মী পণ্ডিত লেখরাম 1858 সালে পাকিস্তানের জেলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন আর্য সমাজের প্রচারে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মির্জা গোলাম আহমেদের সাথে শাস্ত্রার্থ এবং তার দুষ্প্রচার খন্ডনের জন্য বিখ্যাত। পণ্ডিত লেখরাম, তাঁর জীবনের পরোয়া না করে, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হতে বাধা দেন এবং শুদ্ধি অভিযানের পথপ্রদর্শক হন। মহর্ষির জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন, তাই তাঁর নামের সঙ্গে বিশেষণ হিসেবে 'আর্য মুসাফির' যুক্ত হয়েছে। পণ্ডিত লেখরাম হিন্দুদের মুসলমান হওয়া থেকে বাঁচাতেন। 1897 সালের ঈদের দিন 'শুদ্ধির' অজুহাতে লাহোরে একজন ধর্মান্ধ মুসলমান তাকে প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করে।
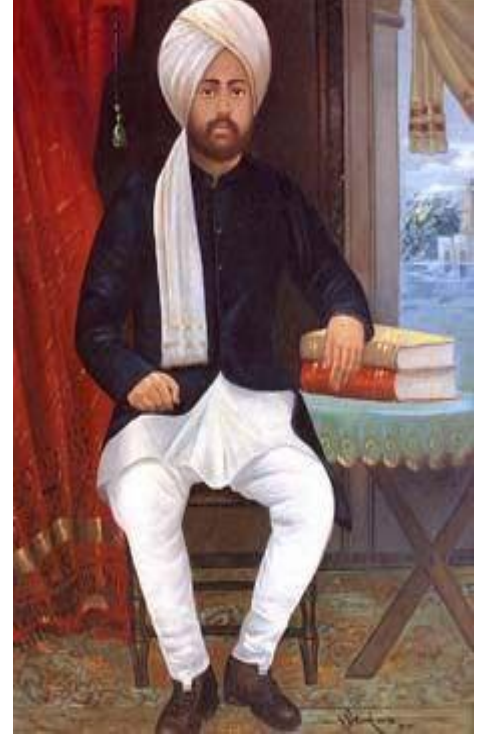
পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী

পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী (২৬ এপ্রিল, ১৮৬৪- ১৮৯০)ছিলেন ভারতবর্ষের Physical Science এর প্রথম প্রফেসর। তাঁর লেখা 'The terminology of Vedas' গ্রন্থটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত কোর্সের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। গুরুদত্তজি কয়েক ঘণ্টা সংস্কৃতে নির্ভুলভাবে অনর্গল কথা বলতে পারতেন বলে তিনি 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮৪ সালে তিনি 'আর্য সমাজ সায়েন্স ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। D.A.V (Dayanand Anglo Vedic) স্কুল প্রতিষ্ঠাতেও গুরুদত্তজির অবদান অনস্বীকার্য।

Pandit Gurudatta

শুরুতে গুরুদত্ত বিদ্যার্থী একজন ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মহর্ষি দয়ানন্দজীর প্রতি ভালোবাসা ছিল অটুট। পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী মহর্ষি দয়ানন্দজীর অন্তিম সময়ে পাশে ছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯। তিনি মহর্ষিজীর মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শারীরিক কষ্টের সহিত যেভাবে মহর্ষি দয়ানন্দজী মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর দৃশ্য দেখে পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী আশ্চর্যিত হয়েছিল। অতঃপর তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করে নাস্তিকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। এখানেই তাঁর জীবনের নতুন যাত্রা শুরু হয় এবং মহর্ষি দয়ানন্দজীর লক্ষ্য পূরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হোন। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক এবং বৈদিক পরম্পরা সংস্কৃতির সমর্থক এবং পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেন।
মহর্ষি দয়ানন্দজীর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যদের নিকট একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন এই পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী। তিনি উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। গুরুদত্তজীর বিজ্ঞান বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন।
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যাচারাল সাইন্স বিষয়ে এম. এস. সী তে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি এই পদ প্রাপ্ত করেন। তিনিই আর্যসমাজ সাইন্স ইন্সটিট্যুশন স্থাপন করেন। তিনি আর্যসমাজ দ্বারা পরিচালিত ডী. এ. বী. কলেজের পরামর্শদাতা ছিলেন। ডী এ বী কলেজ স্থাপনায় মহাত্মা হংসরাজ এবং পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থীর বিশেষ অবদান ছিল। বিস্তর কাজ এবং অধিক পরিশ্রমের কারনে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে ১৮৯০ সালের ১৯ মার্চে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসক

জন্মঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সাল

স্থানঃ অজমের, রাজস্থান, ভারত।

পদবীঃ মহামহোপাধ্যায়, মীমাংসক, শাস্ত্রার্থ মহারথী।

মাতা-পিতাঃ তাঁর মাতার নাম যমুনাবাই এবং পিতার নাম শ্রী গৌরীলাল আচার্য। গৌরীলাল আচার্য ছিলেন আর্য সমাজের সদস্য।

শিক্ষা জীবনঃ যুধিষ্ঠিরজীর গুরুদেবের নাম পরমপূজ্য ব্রহ্মদত্ত জীজ্ঞাসুজী। এরপর তিনি কাশীতে যান এবং সেখানে মীমাংসা শাস্ত্র চর্চা করেন পণ্ডিত চিন্নস্বামীজী ও শ্রী পট্টাভিরামজীর সংস্পর্শে থেকে।

অর্জনঃ পূজ্যপাদ যুধিষ্ঠিরজী ১৯৫০ সালে কাশীতে 'পাণিনী মহাবিদ্যালয়' স্থাপনা করেন। ১৯৭৬ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী বাসস্থা দানপ্পা জত্তী' যুধিষ্টিরজীকে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য তথা শাস্ত্রনিষ্ঠার জন্য সম্মান স্মারক প্রদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করা হয়।

গ্রন্থঃ পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী বহু গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থসমূহেরও বিশাল টীকা সংস্কার প্রণয়ণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো বৈদিক সিদ্ধান্ত মীমাংসা, মীমাংসা দর্শনের শাবরস্বামীর ভাষ্যের ব্যাখ্যা, কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্রম্, শ্রৌতযজ্ঞ মীমাংসা, সংস্কৃত ব্যকরণের ইতিহাস, সংস্কৃত পঠন পাঠনের সরল বিধি, মাধ্যন্দিন শাখা পদপাঠ, বৈদিক ছন্দ মীমাংসা, বৈদিক স্বর মীমাংসা, নিরুক্ত সমুচ্ছয় আরো ইত্যাদি পুস্তক।

শাস্ত্রার্থঃ যুধিষ্ঠিরজী তাঁর জীবনে বেশ কিছু শাস্ত্রার্থ করেছেন, তবে তাঁর ঐতিহাসিক শাস্ত্রার্থটি ছিল ১৯৬৪ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরে হওয়া শাস্ত্রার্থটি। যেখানে সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত করপাত্রীজী এবং মীমাংসকজীর বিপক্ষ ছিলেন তৎকালীন পুরী তথা গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য নিরঞ্জনদের তীর্থ। যদিও শেষ পর্যায়ে এসে যুধিষ্ঠিরজীই শাস্ত্রার্থে জয়লাভ করেছিলেন কিন্তু পৌরানিক মণ্ডলী হতে এটিকে সাধারণ আলোচনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো।

মৃত্যুবরণঃ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী ১৯৯৪ সালে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। এই মহান বিভূতি ও আধুনিক পাণিনীখ্যাত যুধিষ্ঠিরজীর চরণে শত-সহস্র প্রণাম।
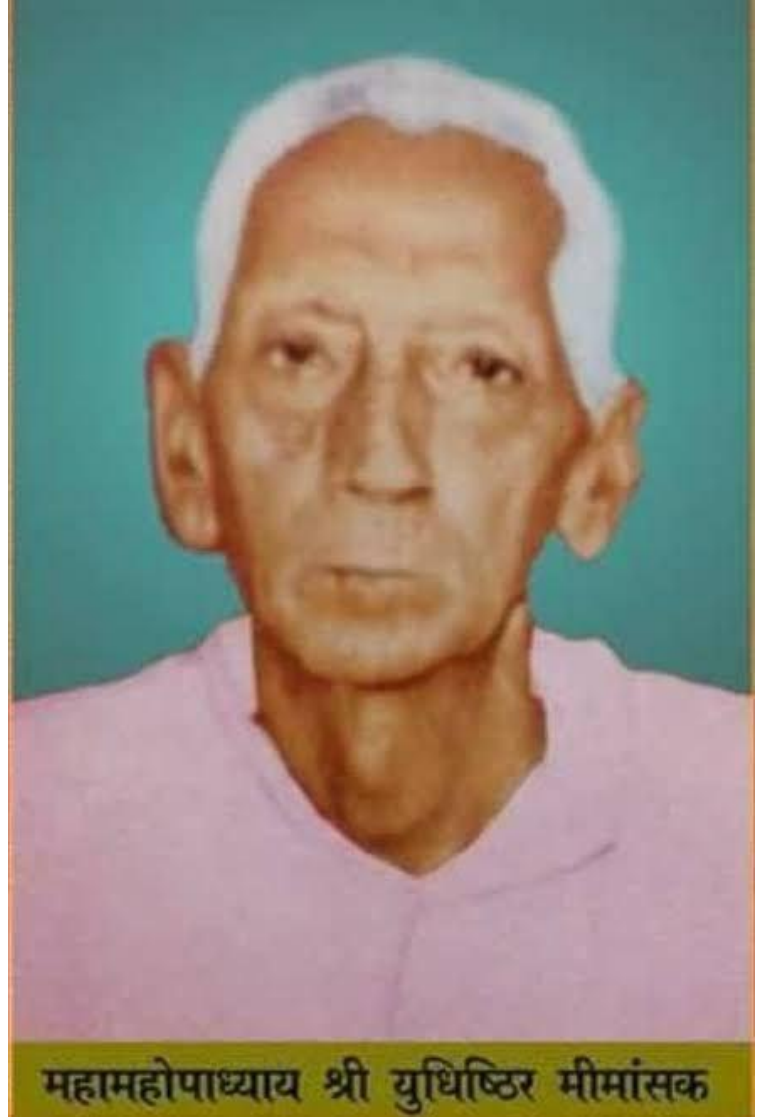
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি জী সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের উচ্চকোটির বিদ্বান্ তথা প্রভাবশালী শাস্ত্রার্থ মহারথী ছিলেন। তাঁর জন্ম পটিয়ালা জেলার রুমাণা গ্রামে ১৮৬২ সনে।

পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিলো মনিরাম, পরন্তু আর্যসমাজে প্রবেশের পর তিনি তাঁর নাম রাখেন আর্যমুনি। তিনি বেদ, দর্শন, মনুস্মৃতি, রামায়ণ তথা মহাভারত আদি গ্রন্থের উপর অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ ভাষ্য এবং টীকা লিখেছেন। আর্যমুনি জী আর্যসমাজের প্রচারক, উপদেশক এবং প্রকাণ্ড শাস্ত্রার্থ মহারথী ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে অনেক শাস্ত্রার্থ করেছেন।

যে কোনো বিষয়ে শাস্ত্রার্থে অবৈদিকদের পরাজিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম ছিলেন । তিনি মল্লযুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন। পণ্ডিত জী কাশীতে অবস্থান করে বিস্তারিত ভাবে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। লাহোরে অবস্থিত ডী.এ.বী. কলেজে সংস্কৃত তথা দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে পণ্ডিত জী লাহোরস্থিত ডী.এ.বী. কলেজের প্রফেসর পদে ছিলেন, সেই সময়কালে একদিন এক যুবক পণ্ডিত জীকে বলেন, " মল্লযুদ্ধে কেবল শারীরিক বলের প্রয়োজন, অপরদিকে শাস্ত্রার্থে কেবল বুদ্ধিবলের প্রয়োজন হয়।" পণ্ডিত জী উত্তর দিলেন, মল্লযুদ্ধে শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিবলের অধিক আবশ্যকতা রয়েছে। যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে পণ্ডিত জীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, " আপনি আমার সহিত মল্লযুদ্ধ করুন, আপনার তো বুদ্ধিবল রয়েছে" পণ্ডিত জী সেই যুবকের সহিত মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। যুবক তাঁকে মল্লযুদ্ধের জন্য নিষেধ করেন, পরন্তু তিনি যুবকের কথায় কর্ণপাত করেন না তিনি। অনেক দর্শকের সমাগম হয়। সমস্ত দর্শক মূহুর্তের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা দেখে ক্ষণিক মূহুর্তের মধ্যে পণ্ডিত জী সেই যুবককে মাটিতে আছাড় মেরে তার বুকের উপর বসে পড়েন । সেই সময়ে যুবকটি পণ্ডিত জীকে তাঁর পা ধরে মাটিতে ফেলানোর চেষ্টা করে। পরন্তু পণ্ডিতজী অত্যন্ত কঠিন কৌশল প্রয়োেগ করে ঐ যুবককে মাটিতে চেপে ধরেন এবং পুনঃ তিনি যুবকের বুকের উপর বসে পড়েন। অন্তে পণ্ডিত জীর নিকট যুবক তার পরাজয় স্বীকার করে এবং দর্শকগণ একটা অন্যরকম বুদ্ধিবল ভিত্তিক মল্লযুদ্ধের সাক্ষী হয়।

পণ্ডিত আর্যমুনি জী মহর্ষি দয়ানন্দ জীর অনন্যভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন,

"যেমনভাবে পদ্মপাদাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, বিদ্যারণ্য স্বামী, বাচস্পতি মিত্রাদি শঙ্করাচার্যের মতের পুষ্টি করেছেন, তদ্রূপ মহর্ষি দয়ানন্দ জীর সিদ্ধান্তের মণ্ডন করা আবশ্যক। প্রায়ঃ সময় তিনি তাঁর স্বরচিত ছন্দে গাইতেন - - 'সো গুরু হৈং হমরে উর মেং জিনকা শুভ নাম দয়ানন্দ দণ্ডী।'

১৯৩৩ সনে আজমেরে অনুষ্ঠিত "দয়ানন্দ নির্বাণ অর্ধশতাব্দী"-তে চতুর্বেদ পরায়ণ মহাযজ্ঞের প্রধান ব্রহ্মা ছিলেন পণ্ডিত আর্যমুনি জী এবং শ্রী ড. ভবানীলাল জী ছিলেন বেদপাঠী।

এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ভবানীলাল জী ৬-৭ দিন পণ্ডিত আর্যমুনি জীর সাথে ছিলেন। এক দিন পণ্ডিত জী ভবানীলাল জীকে বলেন, " ১৯৩৬ বিক্রমাব্দে যখন ঋষি দয়ানন্দ কাশী এসেছিলেন, তখন আমি কশীতে নব্যন্যায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ ছিলাম। স্বামী জীর ব্যাখ্যান শ্রবণ করে আমি বুঝতে পারি স্বামী জী নব্যন্যায় সম্বন্ধে জ্ঞাত নন।
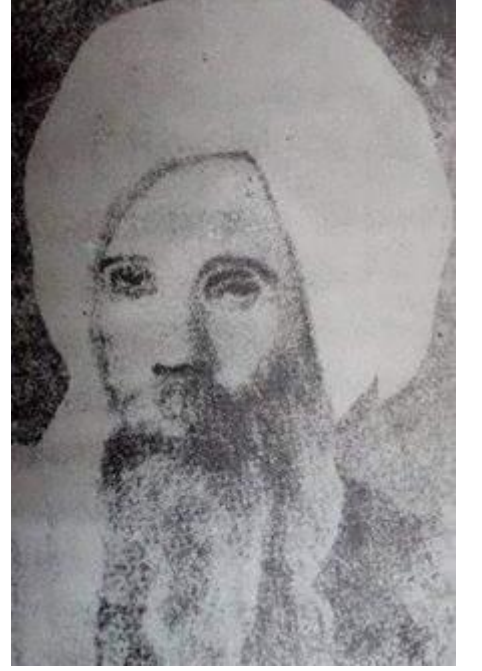
অতঃ একদিন আমি তাঁর সহিত নব্যন্যায়ের শৈলীতে শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ করি, মূহুর্তের মধ্যেই স্বামী জী আমার মানগর্দন করার জন্য নব্যন্যায়ের ভাষাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেন এবং অন্তে বলেন, বৎস! এই নব্যন্যায়ে কিছুই নাই। কেবল বাগাডম্বর মাত্র। সমস্ত নব্য-ন্যায় প্রমাণ-মীমাংসাতেই সমাপ্ত হয়ে যায়। ন্যায়শাস্ত্রকার যেই প্রমেয় এর যথার্থ জ্ঞানের জন্য প্রমাণের উল্লেখ করেছেন, সেই প্রমেয় ভাগকে নব্য-ন্যায় কোনরূপ মহত্ত্বই দেয় নাই। নব্যন্যায়ের ভাষাশৈলীকে কাক-ভাষা বলে।"

পণ্ডিত আর্যমুনি জী প্রায়ঃ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের উপর মহত্ত্বপূর্ণ টীকা, ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছেন। পণ্ডিত জী বেদান্তে শঙ্করাচার্য প্রতিপাদিত অবৈদিক অর্থের প্রবল খণ্ডনপূর্বক ঈশ থেকে তৈত্তিরীয় উপনিষদ পর্যন্ত ভাষ্য করেন। গীতা, রামায়ণ, মহাভারত আদি আর্ষ গ্রন্থের উপর আর্যভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। ইংরেজ সরকার পণ্ডিত আর্য মুনি জীর পাণ্ডিত্য তথা অপার বৈদুষ্যে মুগ্ধ হয়ে " মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে বিভূষিত করে।

পণ্ডিত জী হিন্দি এবং পাঞ্জাব উভয় ভাষার কবিও ছিলেন।

যেমনভাবে পণ্ডিত লেখরাম জী যেকোন স্থলে, যেকোন বিষয়ে ব্যাখ্যান দেওয়ার পর, ইসলাম বিষয়ে কিছু না কিছু খণ্ডনাত্মক ব্যাখ্যান অবশ্যই দিতেন; তদ্রূপ পণ্ডিত আর্যমুনি জী যেকোনো স্থলে, যেকোনো বিষয়ে ব্যাখ্যান দেওয়ার পর, নবীন বেদান্ত বিষয়ে খণ্ডনাত্মক ব্যাখ্যান অবশ্যই দিতেন।

তিনি তাঁর জীবনকালে প্রচুর শাস্ত্রার্থ করেছেন । লাহোরে আর্যসমাজের একটি উৎসবের পরে টানা তিন দিন বিপক্ষ বিদ্বানদের সাথে শাস্ত্রার্থের মাধ্যমে শঙ্কা-সমাধানের কার্যক্রম চলমান ছিলো। সেই সময় পণ্ডিত আর্যমুনি জীই আর্য সমাজের পক্ষ নিয়ে শাস্ত্রার্থ করেছিলেন।

আর্য বিদুষী ড. প্রজ্ঞা দেবী

মহর্ষি পাণিনি এবং মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বংশবদা, বেদের অতলস্পর্শী বিদ্বত্তম বিদ্বান তথা কাশীর মহাবৈয়াকরণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু জীর শিষ্যা, আর্য জগতের বিদ্বত্তম বিদ্বান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির জীর সতীর্থা শ্রদ্ধেয়া আর্য বিদুষী ড.প্রজ্ঞা দেবী জীর জন্ম ১৯৩৭ সনের ৫ মার্চ মধ্যপ্রদেশের সতনা জেলার কোলগবাঁ নামক গ্রামে শ্রী কমলা প্রসাদ আর্য জীর গৃহে ।

তাঁর মাতার নাম শ্রীমতী হরদেবী জী আর্য । ১৯৫৪ সনে তাঁর পিতা শ্রী কমলা প্রসাদ জী ৪৬ বর্ষ আয়ুতে দেহত্যাগ করলে পণ্ডিতা জীর মাতা হরদেবী জী সপরিবারে বেনারসে চলে আসেন।

বেনারসের কাশীতে পণ্ডিতা জী আর্য জগতের দিগ্গজ মহারথী, আর্ষ-পাঠবিধির প্রাণ পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জীর সান্নিধ্যে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন আদি সমগ্র বৈদিক সাহিত্য বিশদভাবে অধ্যয়ন করেন ।

একবার মধ্য প্রদেশের রীবা রাজ্যের নরেশ শ্রী গুলাব সিংহ জীর মহারানি তাঁর রাজসভায় সতী দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এক মুসলিম দরবারী মহারানিকে পণ্ডিতা জীর মাতা হরদেবী জীকে দর্শন করার বিষয়ে বলে । মহারানি মাতা হরদেবী জীকে দর্শন করেন । এমন মাতা-পিতার গৃহে জন্মেছিলেন বিদুষী প্রজ্ঞা দেবী জী ।

১৯৬৯ সনে তিনি বেনারসের বিখ্যাত "সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে "বিদ্যাবারিধি" উপাধি প্রাপ্ত হন ।

১৯৭১ সনের ১২ই জুলাই তিনি কাশীতে জিজ্ঞাসু স্মারক পাণিনি কন্যা মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন । ১৯৭২ সনে বিদ্যালয়ের বিধিবৎ উদ্‌ঘাটন হয় । বিদ্যালয়ে নারীদের জন্য সংস্কৃতের বিশেষ পাঠদান দেওয়া হয় । বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন তথা সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের উচ্চস্তরীয় শিক্ষার এক প্রমুখ কেন্দ্র বিদ্যালয়টি ।

তিনি আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন অর্থাৎ, অখণ্ড ব্রহ্মচারিণী ছিলেন তথা তাঁর অনুজ ভগিনী যজ্ঞময়ী-মাতা আচার্যা মেধাদেবীর সাথে আর্ষ শিক্ষা প্রদানে রত থাকেন । পরিণামস্বরূপ তাঁর স্বীয় প্রতিষ্ঠিত গুরুকূলে অনেক বিদুষী কন্যা তৈরি হয় ।

দুই ভগিনীর মার্মিক কার্য প্রণালী এমন মহত্বপূর্ণ ছিলো, যার আলঙ্কারিক-বর্ণন সামবেদের ১৭৫১ নং মন্ত্রে বিদ্যমান, দুইজনের মধ্যে কোনো বৈমত্য ছিল না, ছিল না দ্বৈধ ভাব, এক প্রাণ দুই শরীর ছিল । উল্লেখ্য, পূজ্য আচার্য সুদ্যুম্ন জী তাঁর ভ্রাতা ছিলেন ।

বারাণসীতে যখন কাশী শাস্ত্রার্থ শতাব্দী উদযাপন করা হচ্ছিল, তখন পুরীর শঙ্করাচার্য নিরঞ্জন দেব তীর্থ আর্য-সমাজকে শাস্ত্রার্থের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন পূজ্যা ড. প্রজ্ঞা দেবী জী গর্জে উঠে বলেছিলেন, “কন্যা তো আমি দয়ানন্দের। কিন্তু শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিতে তো আমি (নারী) পায়ের জুতো। আজ জুতো এবং শঙ্করাচার্যের মধ্যে শাস্ত্রার্থ হবে, তখন বোঝা যাবে যে, পায়ের জুতো লাফিয়ে কোথায় গিয়ে পড়ে”। এমনই নির্ভীক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তিনি।

১৯৯৫ সনের ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় জ্ঞানদীপিকা বিদুষী প্রজ্ঞা দেবী জী দেহত্যাগ করেন । তাঁর দেহান্তের পশ্চাৎ গুরুকূল সঞ্চালনের দায়িত্ব নেন ভগিনী বিদুষী আচার্যা মেধাদেবী জী।

আচার্য ড. রামনাথ বেদালঙ্কার

আর্য জগতের জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণের মধ্যে আচার্য ড. রামনাথ জীর স্থান অন্যতম। পূজ্য আচার্য জীর জন্ম ১৯১৪ সনের ৭ই জুলাই বরেলীতে।
তিনি তাঁর পিতার প্রেরণায় গুরুকুল কাঁগড়ী, হরিদ্বারে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং এ গুরুকুলেই উপাধ্যায় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জীকে আচার্য জী দর্শন করেছিলেন এবং তিনি একবার বাল্যকালে তাঁকে পত্রও লিখেছিলেন। আচার্য জী গুরুকুল কাঁগড়ী থেকে অধ্যয়ন সম্পন্নের পশ্চাৎ মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জীর প্রেরণায় তাঁর অবশিষ্ট জীবন গুরুকুলে সমর্পিত করেন।তিনি বেদ এবং বৈদিক বাঙ্ময়ের উচ্চকোটির বিদ্বান ছিলেন। তিনি ছিলেন সরলতা এবং নির্মলতার মূর্তি । গুরুকুল কাঁগড়ীতে উপাধ্যায় পদ থেকে অবকাশ নিয়ে অধিকাংশ সময় আর্য বানপ্রস্থ আশ্রম, জ্বালাপুরের নিকট গীতা আশ্রম, জ্বালাপুরে নিবাস করেন। পূজ্য আচার্য জী নকারাত্মক কোনও প্রকার কোনো কথোপকথন কখনও করতেন না। বেদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিলো।তাঁর সরল এবং সুবোধ বেদ ব্যাখ্যা অধ্যয়নে পরমাত্মার কাব্য রহস্য হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার অনুভূতির অনুভব প্রদান করে। আচার্য জীর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব'র উপর তাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ আর্য বিদ্বান ডা. বিনোদচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার জীর সম্পাদনায় 'শ্রুতি মন্থন' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
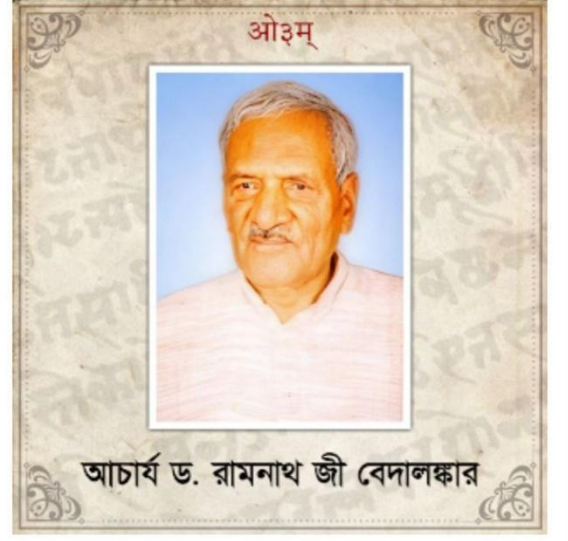
আচার্য রামনাথ জী গুরুকুল কাঁগড়ী থেকে ১৯৭৬ সনে অবকাশ নেওয়ার পর চণ্ডীগঢ়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বর্ষের জন্য 'মহর্ষি দয়ানন্দ বৈদিক অনুসন্ধান পীঠ' এর আচার্য এবং অধ্যক্ষ পদে উপবিষ্ট হন। এখানে তিনি ১৯৭৯ সন পর্যন্ত অবস্থান করে তাঁর অনেক শিষ্যকে শোধ কার্যে সহায়তা করেন, যার মধ্যে একজন ডা. বিক্রম বিবেকী জী।

বৈদিক বাঙ্ময়ে আচার্য জী মহৎ কৃতিত্ব রাখার দরুন তিনি বিবিধ পুরষ্কার এবং সম্মাননায় ভূষিত হন। সংস্কৃত বাঙ্ময়ে তাঁর প্রগাঢ় বৈদুষ্যতার দরুন ভারত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে রাষ্ট্রীয় বিদ্বানরূপে সম্মানিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত অতি সান্দীপনি রাষ্ট্রীয় বেদ-বিদ্যা পুরস্কার এবং আর্যসমাজ সান্তাক্রুজ, বম্বে থেকে "বেদ-বেদাঙ্গ" পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। দিল্লি সংস্কৃত একাডেমি, উত্তর প্রদেশ সংস্কৃত সংস্থান, উত্তরাখণ্ড সংস্কৃত একাডেমি থেকেও পূজ্য আচার্য জীকে সম্মানিত করা হয়।

২০১৩ সনের ৯ই এপ্রিল আচার্য জী দেহত্যাগ করেন।

আচার্যা শ্রীমতি নির্মলা মিশ্রা

য়ল্লালিতাঃ অনুদিনং শিশবশ্চ ভৃত্যাঃ।
সম্ভাষণে ব্যবহরন্তি জনুঃ-প্রভৃত্যা ॥ '
কল্পদ্রুম' স্য শুভ-সৌরভমাকিরন্তী।
দেবী সুসংস্কৃতগিরা খলু 'নির্মলে' য়ম্ ॥

আর্ষ শাস্ত্রের অভূতপূর্ব বিদুষী, আর্য জগতের বিখ্যাত বিদ্বান্ তথা প্রৌঢ় পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ জীর সহধর্মিণী শ্রীমতী নির্মলা জীর জন্ম **১৯৩১** সনের **২১** জুন।

তাঁর পিতার নাম শ্রী ব্রজনারায়ণ শর্মা তথা মাতার নাম শ্রীমতী সুখদেবী। আচার্যা জী সমগ্র সংস্কৃত তথা দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। এছাড়া পুরাণেতিহাস তথা সাহিত্য বিষয়েও আচার্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনেক বর্ষ যাবৎ বদায়ু নগরে স্থিত 'পার্বতী আর্য কন্যা' কলেজে প্রধানাচার্যা পদে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী হরিহরানন্দ সরস্বতীর (করপাত্রী) নির্দেশে লিখিত মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ বেদার্থ-পারিজাত গ্রন্থের খণ্ডনে বৃহৎ এবং বিস্তৃত গ্রন্থ আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মিশ্র জীর প্রণীত 'বেদার্থ-কল্পদ্রম' এর মূল সংস্কৃত গ্রন্থের হিন্দি ভাষান্তর করেন আচার্যা নির্মলা জী।

পণ্ডিত চমূপতি

পণ্ডিত চমূপতি এম. এ উচ্চকোটির বৈদিক বিদ্বান্, প্রগল্ভ লেখক তথা ভাবুক কবি প. চমূপতি ১৮৯৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বহাবলপুরে (পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতজীর পিতার নাম মেহতা বসন্দারাম তথা মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। তিনার বাল্যনাম চম্পতরায়। মেট্রিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বহাবলপুরের ইজর্টন কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে অধ্যয়কালেই তিনি কবিতা লিখা আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম শিখ ধর্মের গ্রন্থ 'জপজী' এর কাব্যানুবাদ করেন। এম. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বহাবলপুরে অধ্যাপক রূপে বিরাজমান হন। মেহতা চম্পতরায় প্রথমে শিখ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন পরন্তু নাস্তিকতার বিচার এই আকৃষ্টতা রুদ্ধ করে দেয়। এর মধ্যেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তারমধ্যে নাস্তিক মনোভাব দূরীভূত হয় কিন্তু শাঙ্কর বেদান্ত মতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধীরে ধীরে বেদান্তের প্রতি আস্থা শিথিল হতে থাকে পরন্তু মূর্তিপূজার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্ততঃ চম্পতরায়জীর ধার্মিক বিচারের চরম পরিণতি আর্যসমাজ দ্বারা প্রতিপাদিত বৈদিক ধর্মের বিচারধারা স্বীকার করার মাধ্যমে হয়। তৎপশ্চাৎ তিনি চম্পতরায় হইতে চমূপতি নাম ধারণ করেন। তারপর তিনি রাজ্যসেবা ত্যাগ করে গুরুকুল মুলতান চলে যান। দুই বর্ষ পর্যন্ত এই গুরুকুলের অধিষ্ঠাতা পদে কার্য করেন। আচার্য রামদেব জীর প্রেরণায় প. চমূপতি লাহৌর চলে যান সেখানে আর্য প্রতিনিধি সভা পাঞ্জাবের কার্য করতে থাকেন। সভার আজীবন সেবা করার ব্রতধারীগণ 'দয়ানন্দ সেবা সদন' এর স্থাপনা করেছিলেন, সেই সদনের সদস্য হয়ে যান পণ্ডিতজী। তিনি বিধিপূর্বক আর্য প্রতিনিধির সেবা করার প্রতিক্ষা করে দীক্ষা নেন। ১৯২৭ সনে তিনি গুরুকুল কাংগড়ীতে আচার্য পদে নিযুক্ত হন, ১৯৩৩ সনে গুরুকুলের মুখ্য অধিষ্ঠাতা হন পরন্তু ২বর্ষ পশ্চাৎ এই পদ ত্যাগ করে পৃথক হয়ে যান। ১৯৩৭ সনের ১৫ই জুন পণ্ডিতজীর দেহান্ত হয়। পণ্ডিত জীর অন্যতম কীর্তি হিসেবে আমরা জানি মুসলমানদের কর্তৃক যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপমানসূচক বই লিখনের প্রতিবাদে একমাত্র সনাতনী হিসেবে সাহসিকতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত চরিত্রের মন্ডন (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ) এবং প্রতিবাদে পালটা জবাব স্বরূপ রঙ্গিলা রাসূলের মতো বিশ্ব কাপানো পুস্তকের রচনা। পণ্ডিত চমূপতি অসাধারণ বিদ্বান্ তথা লেখনীর ধনী ছিলেন। হিন্দী উর্দু তথা ইংরেজিতে সমানরূপে পারদর্শী ছিলেন। লে. কা.- ১. জীবন জ্যোতি (সামবেদের আগ্নেয় পর্বের ভাবপ্রধান ব্যাখ্যা)। ২.সোম সরোবর (সামবেদের পবমান পর্বের ব্যাখ্যা)। ৩.য়াস্ক যুগ কী বেদার্থ শৈলিয়াঁ। ৪.বেদার্ষ কোষ। ৫.সন্ধ্যা রহস্য। ৬.দেবযজ্ঞ রহস্য। ৭. দেবযজ্ঞ পর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। ৮.বৈদিক
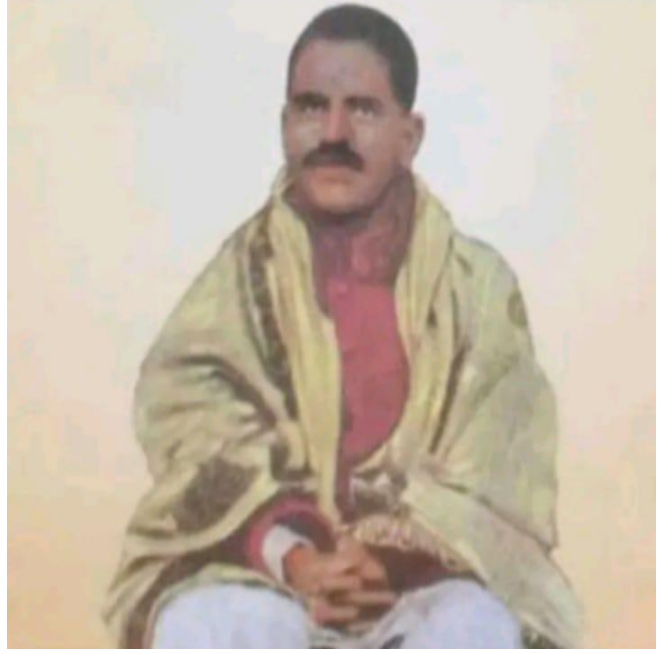
দর্শন। ৯.বৈদিক সিদ্ধান্ত। ১০.বৈদিক জীবন দর্শন। ১১.বৈদিক তত্ত্বদর্শন। ১২. নীহারিকাবাদ ঔর উপনিষদ্। ১৩.যোগেশ্বর কৃষ্ণ। ১৪.হমারে স্বামী। ১৫.আর্ষ দর্শন। ১৬.ঋষি দর্শন। ১৭.ঋষিকা চমৎকার। ১৮.আর্য প্রতিনিধি সভা পাঞ্জাব কা ইতিহাস। ১৯.বৃক্ষোং কা আত্মা। ২০.রঙ্গীলা রসূল। উর্দু সাহিত্য– ১.দয়ানন্দ আনন্দ সাগর (কাব্য)। ২.ভারত কী ভেন্ট (কবিতা)। ৩.হিন্দুস্তান কী কহানী। ৪.মরসিয়া এ গোখলে (কবিতা)। ৫.সমাজ ঔর হাম। ৬.চৌদহবীং কা চাঁদ (হক প্রকাশ লে.মৌ. সনাউল্লার খণ্ডন)। ৭.পরমাত্মা কা স্বরূপ। ৮.বৈরাগ্য শতক কা পদ্যানুবাদ (অপ্রকাশিত)। ৯.সত্যার্থ প্রকাশের উর্দু অনুবাদ। ১০.গঙ্গা তরঙ্গ (কবিতা)।...........। ইংরেজি গ্রন্থ– The Ten Commandments of Dayanand. ২.Glimpses of Dayanand. ৩.Mahatma Gandhi and the Aryasamaj. ৪.যজুর্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ।